শুভা

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম, এ, ডি, এল

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দুই টাকা

উৎসর্গ

মায়ের রূপে, প্রিয়ার রূপে, কন্যার রূপে যিনি জীবন সরস ও

মঙ্গলময় করিয়া রাখিয়াছেন, হৃদয়ের ভিতর বসিয়া

শক্তিস্বরূপে পুরুষকে চালনা করিতেছেন, সেই

আত্মবিস্মৃতা, তমসাবৃতা, অবজ্ঞাতা

নারীকে

অর্পণ করিলাম

উপোদ্‌ঘাত

"শুভা" উপন্যাস, sermon নহে। কোনও বিশেষ উপদেশ বা মতপ্রচার ইহার উদ্দেশ্য নহে। মানব জীবন মাত্রই এক একটা নীতি কথা; প্রত্যেক মানুষের জীবন আলোচনা করিয়া নিজেদের আকাঙ্ক্ষা ও সংস্কার অনুযায়ী শিক্ষা ও উপদেশ বাহির করা যাইতে পারে। শুভা, চাঁপা, চপলা, মৈনী নগেন্দ্র, নিবারণ ও সুরেশ, ইহাদের সকলকেই আমি রক্তমাংসের মানুষ রূপে চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি; যদি আমার সে চেষ্টা সফল হইয়া থাকে, তবে যাঁহারা "Sermons in stones and books in brooks" পাইয়া থাকেন, তাঁহারা ইহাদের জীবনে উপদেশ ও শিক্ষা পাইতে পারেন। কিন্তু ইহাদের কাহারও জীবনের দ্বারা কোনও বিশিষ্ট উপদেশ বা মতবাদ প্রচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে।

পুস্তকের মধ্যে প্রসঙ্গ-ক্রমে নানা মতামতের আলোচনা হইয়াছে। সে মতামত আমার নহে, বক্তাদের। এ বিষয়ে গল্প-লেখক যে কতটা পরতন্ত্র, এ কথা সকলে হৃদয়ঙ্গম করেন না বলিয়া অনেক সময় গ্রন্থকারের উপর অবিচার করেন। বক্তার চরিত্র তাহার আবেষ্টন ও সাময়িক অবস্থায় তাহার মুখে যখন যে কথাটি মানাইবে, তাই লিখিতে গ্রন্থকার বাধ্য হন। কিন্তু তার কোনও একটা মত যে গ্রন্থকারের নিজের এ কথা মনে করা অসঙ্গত হইবে।

আর একটা কথা বলিয়া রাখি। আমি এ গল্পে আদর্শ-রচনা করিতে চেষ্টা করি নাই। আবার নির্ভেজ villain অঙ্কিত করি

নাই। এই saint ও villain আমার অপরিচিত। জগতে এমন লোক থাকিতে পারে, কিন্তু আমি দেখি নাই। জগৎকে আমি যেমন দেখিয়াছি তেমনি চিত্রিত করিতে আমি বাধ্য।

আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় কয়েকটি শক্তি ও আদর্শের ক্রিয়া দেখা যায়, তাহাদের সমন্বয় এখনও হয় নাই। কোন্ পথে সমন্বয় হইবে, তাহা দেখান আমার উদ্দেশ্য নয়। কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রের উপর সেই সব আদর্শের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার একটা ছবি পাঠক-সমাজে উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র।

আমার এ উপন্যাসের সমালোচনা করিবার সময় পাঠকগণ এই কয়েকটি কথা স্মরণ রাখিলে আমি কৃতার্থ হইব। আমার বর্ণনা সকল দেশ-কাল-পাত্র হিসাবে সত্য কি না কেবলমাত্র এই কথাটাই যদি তাঁহারা বিচার করেন তবেই আমি সুবিচারের আশা করিব। উপন্যাস হিসাবে এ সম্বন্ধে অন্য কোনও মানদণ্ড সম্ভব নয়।

ছাপার কতকগুলি গুরুতর ভুল রহিয়া গিয়াছে। সেটা অনেকটা আমার ত্রুটি। যদি দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিবার সৌভাগ্য হয়, তবে তাহা ভ্রমশূন্য করিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত

[১]

দ্বিপ্রহর রাত্রে এক পাঁজা বাসন মাজা শেষ করিয়া শুভা তার ছোট ঘরটির বারান্দায় বসিয়া একমনে আকাশের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল—একেবারে তন্ময় হইয়া ভাবিতেছিল।

হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া একটা প্রচণ্ড পদাঘাতে তাহার চিন্তাস্রোত ভাঙ্গিয়া দিল। শুভা মাটীতে লুটিয়া পড়িল' এক মুহূর্ত্তের জন্য তার দম্ বন্ধ হইয়া গেল।

"নবাব নন্দিনী! ডেকে ডেকে হয়রাণ হ'য়ে গেলাম এক ছিলিম তামাকের জন্যে, উনি আকাশ পানে হাঁ করে চেয়ে হাওয়া খাচ্ছেন।" এই সুমিষ্ট সম্ভাষণের অংশমাত্র শুভা শুনিতে পাইল।

দম্ পাইয়া যখন সে উঠিয়া বসিল তখন তাহার পিঠের বিষম ব্যথা সত্ত্বেও সে উঠিয়া ধীর পদে ঘরের ভিতর গিয়ে তামাক সাজিতে বসিল পতিদেবতা যে তক্তপোষের উপর অতিকায় দেহখানি বিস্তার করিয়া ছিলেন ঠিক তাহারই নীচে তামাকের সরঞ্জাম সকল প্রস্তুত ছিল। কিন্তু প্রভু আহারান্তে প্রথম এক ঝোঁক নিদ্রা সারিয়া উঠিয়াই স্ত্রীকে ডাকিতেছিলেন, কি না, একছিলিম তামাক সাজিতে হইবে।

নীরবে শুষ্ক মুখে শুভা তামাক সাজিয়া গড়গড়ায় চড়াইয়া দিল নিবারণচন্দ্র চিৎ হইয়া শুইয়া টানিতে লাগিলেন। কোনও কথা হইল

না। শুভা আস্তে আস্তে দুয়ারটি বন্ধ করিয়া বাতি নিভাইয়া শুইয়া পড়িল—কিন্তু ঘুমাইল না।

সে আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল।

আজ সাত বৎসর শুভার বিবাহ হইয়াছে। এখন তাহার বয়সএকুশ বৎসর। এই সাত বৎসরের জীবন সে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। যখন তাহার বিবাহ হয় নিবারণ তখন ১৭ বৎসরের যুবক। তখন সে সবে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া কলিকাতায় কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে। তার বাপের কিছু সঙ্গতি ছিল, রোজগার না করিলেও মোটা ভাত মোটা কাপড়, চাই কি দু'চারখান গয়না পর্য্যন্ত জোগাইতে তার কষ্ট হইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না।

বিবাহের পর একবৎসর নিবারণ কলেজে পড়িল। কিন্তু পড়ায় তাহার মন বসিল না। মেসে বসিয়া তাস খেলা ও তামাক ধ্বংস করায় তার যতখানি উৎসাহ ছিল, পড়ায় তার দশভাগের একভাগ থাকিলে সে বৃত্তি পাইয়া পাশ করিতে পারিত। আর একটি জিনিযে তার প্রকৃত আসক্তি ছিল, সে নিদ্রা।

কাজেই পিতার মৃত্যু হইবামাত্র নিবারণ আয়াস সাধ্য পাঠ্যজীবনে ইস্তফা দিয়া শ্বশুর গৃহ হইতে স্ত্রীকে লইয়া দেশে আড্ডা গাড়িল। তামাক, তাস, পাশা ও নিদ্রা বেশ চলিতে লাগিল।

কিছু দিন পরে তাহার মাতা এমন সৎপুত্রের হস্তে পিণ্ড পাইবার লোভে তাড়াতাড়ি স্বর্গারোহণ করিলে নিবারণ গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া বসিল। নিন্দুকেরা বলে যে তাহাকে বাধ্য হইয়া কলিকাতা যাত্রা করিতে হইয়াছিল' কিন্তু আমরা জানি, এ কথার কোনও ভিত্তি নাই। নিধু কৈবর্ত্তর যুবতী ভার্য্যা তাহাকে একদিন খেঙরাপেটা করিয়াছিল, এবং নিধুও তাহার মাথা ফাটাইবার সাধু সংকল্প লোক

সমাজে গোচর করিয়াছিল সত্য। কিন্তু এমন দুই চারিটা ঘটনা তো আরও হইয়াছিল; তাহার জন্য নিবারণ দিন কতক গাঢাকা দিয়া থাকিলেও একেবারে গ্রাম ছাড়িবার সংকল্প করে নাই।

শুভা বড়লোকের মেয়ে নয়। তার বাপ সামান্য কেরাণী। কিন্তু তাদের সহরে একটা ইংরাজী স্কুল ছিল, শুভা তাহার একটী শ্রেষ্ঠ ছাত্রী ছিল। সে যখন সব বিষয় প্রথমপ্রাইজ পাইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়াও বৎসরের শেষাশেষি স্কুল ছাড়িয়া গেল, তখন তাহার টিচারেরা আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের খুব আশা ছিল যে শুভা এণ্ট্রান্সে একটা বেশ ভাল রকম বৃত্তি পাইয়া পাশ করিবে। কিন্তু গরীব মা বাপ অল্প পয়সার সৎপাত্র পাইয়া তাহাকে সম্প্রদান করিয়া ফেলিলেন, যদিও সেই "অল্প পয়সা" জোগাইতে গিয়া তাহাদের বাকী জীবন ঋণভার বহন করিতে হইয়াছিল। এখন তাঁহারা দু'জনেই ঋণ, কন্যাদায় প্রভৃতি সকল দায় হইতে মুক্ত হইয়া খুব সম্ভবতঃ স্বর্গেই বাস করিতেছেন। শুভা বিবাহের পরও প্রায় এক বৎসর স্কুলে পড়িয়াছিল। তার পর তার স্বামীর সঙ্গে সঙ্গেই তার পাঠ সাঙ্গ হইল।

শুভার বাবা তাহাকে বিবাহের সময় আর যাহা দিন না দিন কতকগুলি ইংরাজী ও বাঙ্গালা বই দিয়াছিলেন। শুভা সেগুলি খুব আগ্রহের সহিত পড়িয়াছিল, এবং যখন যেখানে বই পাইত তাই লইয়া সে পড়িত। এ পড়া তার একটা বাতিক বিশেষ ছিল। পাঠবিমুখ নিবারণচন্দ্র এ বাতিকের বড় ভক্ত ছিল না, কিন্তু ইহা হইতে স্ত্রীকে নিবৃত্ত করিবে এতটা উদ্যমও তার ছিল না।

যৌবনের উন্মেষে শুভার প্রেমাকাঙ্ক্ষী হৃদয় নিবারণের স্থূল চেষ্টাহীন জড় দেহ ও তাহার স্থাণুস্বভাব সত্ত্বেও তাহার প্রতি ধাবিত হইয়াছিল। এই রকম 'ধাওয়া করা'টা, তরুণ চিত্তের পক্ষে স্বাভাবিক—ইহা আকর্ষণের

অপেক্ষা রাখে। তাই ধাবনার বিষয়ীভূত ব্যক্তিটির আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা থাকারও বিশেষ প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু নিবারণের চিত্ত সে রকম কোনও উদ্বেগ কখনও পায় নাই। তাহার মানসিক আলস্যটা এত সম্পূর্ণ ও পরিপক্ক ছিল যে প্রেমে পড়িবার জন্য যে রজোগুণের প্রয়োজন তাহাও তাহার ছিল না। শুভার রূপ যৌবনে যে সে তৃপ্ত হয় নাই তাহা নহে; তাহাকে তাহার দরকারও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এই যে আকর্ষণ ছিল সেটা সম্পূর্ণ দৈহিক, ইহা তাহার মনের ভিতর একটুকুও সাড়া দেয় নাই।

শুভার প্রেম স্বামীর মনের কাছে কোনও সাড়া না পাইলেও প্রথমে কোনও ধাক্কা খাইয়া ফেরে নাই। কিন্তু সে যতই পুরাতন হইতে লাগিল ততই সে ধাক্কা পাইতে লাগিল। এই ধাক্কা ক্রমে বেশ স্থূল ভাবে—লাথিটা কিলটা রূপে—দেখা দিল। যে প্রেমের আকাঙ্ক্ষা লইয়া সে কৈশোরে স্বামীর নিকট আসিয়াছিল তাহা উপিয়া গিয়া, যতই দিন যাইতে লাগিল ততই তীব্রতর বিরাগে পর্য্যবসিত হইতে লাগিল।

একটু একটু করিয়া নিবারণের অধঃপতন হইতে লাগিল। সাধারণতঃ লোকে যেমন বহিয়া যায় নিবারণ তেমন বহিয়া যায় নাই। তাহ[illegible] চরিত্রদোষে দোষ ছিল না এমন নয়, তবে কোন দিন রাত্রে তাহাে[illegible] বাড়ীতে পাওয়া যাইবে না এমন ভাবে সে বহিয়া যায় নাই! মদ সে খাইত না এ কথা বলা যায় না, কিন্তু ঠিক মাতাল সে বড় হইত না। আর যাই সে করুক না কেন, সে হিসাবে ঠিক ছিল। সে অত্যন্ত কৃপ[illegible] স্বভাব, পয়সার অপব্যয় করিয়া সে মদও খাইত না কাজে কাজে গৃহস্থালীর ব্যাপারে যে সে অত্যন্ত ব্যয়সঙ্কোচ করিবে তাহা আর বিচি[illegible] কি? একটি ছোট্ট বাড়ীর মধ্যে সে দুইটি ঘর লইয়া বাস করিত। বাকী ঘরে আরও তিন চারিটি ভাড়াটীয়া ছিল। দাসী বা রাঁধুনীর উপদ্রব

ছিল না। সমস্ত কাজই শুভাকে করিতে হইত। সে কাজের মধ্যে সব চেয়ে ভারি কাজ স্বামীর শরীরের সেবা। শরীরের আয়েস বিষয়ে নিবারণ খাঞ্জে খাঁ নবাবের চেয়ে কোনও অংশে হীন ছিল না; আর সে আয়েসের জোগাড় দিতে হইত একা শুভার। রাত্রি এবং মধ্যাহ্নের নিদ্রা এবং অপরাহ্নের ভ্রমণ ছাড়া অবশিষ্ট সময় সমস্তটাই শুভাকে সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিতে হইত। কিন্তু প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াও সে কোনও দিনই বকুনি না খাইয়া কাটাইতে পারিত না। প্রহারটা রোজ হইত না, সাধারণতঃ গোলাপী নেশাটা যেদিন একটু টক্‌টকে হইয়া উঠিত সেই দিনই প্রহারটা হইত। তা তেমন সপ্তাহে দুই তিন দিন হইত। তবে নিবারণের পক্ষে একথা বলিতেই হইবে যে সে একবারে নির্দ্দয় ভাবে স্ত্রীকে কখনো মারে নাই। এক ঘা দু'ঘা বড় জোর তিন ঘার বেশী সে কখনো মারে নাই, যদিও মাঝে মাঝে ঘা গুলি একটু শক্ত রকমের হইত।

ইহাই শুভার সাত বছরের দৈনিক জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ইহাই উল্টাইয়া পাল্টাইয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া আজ রাত্রে শুভা আলোচনা করিতে লাগিল। এই সাত বৎসরের দীর্ঘ অত্যাচারে তাহার মনের অনেকগুলি জায়গায় কড়া পড়িয়া গিয়াছিল, সবগুলি কোমল প্রবৃত্তি একেবারে ঝরঝরে হইয়া শুকাইয়া গিয়াছিল। ঠাকুর দেবতায় তার আর শ্রদ্ধা ছিল না, তুকতাকের ক্ষমতা সম্বন্ধে তাহার মত ডাক্তার প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের মত অগ্রসর। ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য সম্বন্ধেও সে অনেকটা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিত। যে দুই একজন লোক তাহার সঙ্গে কথা কহিত তারা প্রায়ই তার মুখে যা বলিবার নয় এমন সব সৃষ্টিছাড়া অধর্ম্মের কথা শুনিয়া কাণে হাত দিয়া পলাইত।

কিন্তু একটি দুর্ব্বলতা তার ছিল। তার প্রাণের ভিতর যে প্রাণ সে আপন সার্থকতার জন্য মাঝে মাঝে ব্যাকুল হইয়া উঠিত। সে যখন স্কুলে

ছিল তখন তাহার শিক্ষয়িত্রীরা তাহার চক্ষের সমক্ষে নানা স্বপ্ন জাগাইয়া তুলিতেন, নানা অভূতপূর্ব্ব ভাবে তাহার ভবিষ্যৎ জীবন সে স্বপ্নে মহিমাময় হইয়া উঠিত। সে শিখিয়াছিল, মানুষের দেহ লইয়া সকলেই জন্মে আর সে দেহের ক্রিয়া সবগুলি করিয়া সকলেই দশ দশা অতিক্রম করিয়া চিতায় আরোহণ করে। কিন্তু যে তার মধ্যে প্রকৃত মানুষ হইতে পারে তাহার জীবনই সার্থক আর যারা কেবল দেহপুষ্ট করিয়া আর দেহকে তৃপ্ত করিয়া জীবন কাটাইয়া গেল তাদের জীবন একবারেই বৃথা। কি করিলে জীবন সার্থক হয়, কি করিলে মানুষ হওয়া যায়, সে সম্বন্ধে সে অনেক উপদেশ শুনিয়াছিল, অনেক মহাপুরুষ ও গরীয়সী নারীর চরিতাখ্যায়িকা পড়িয়াছিল, নিজের জীবনকে সেই সকল জীবনের ছাঁচে ঢালিবার কত অসম্ভব কল্পনাও সে করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে তার অনেকগুলি তাহাকে বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তরুণ-হৃদয়ের আশা উৎসাহে সে তাহাতে বেদনা বোধ করে নাই। এবং একটা নূতন ধারায় তাহার জীবনকে সার্থকতার পথে প্রবাহিত করিবার আশায় সে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল।

বিবাহের সময় সে যে সকল নূতন বই উপহার পাইয়াছিল তার মধ্যে সে আর একটা মহৎ আদর্শের সন্ধান পাইয়াছিল—গৃহিণী জীবনে সে জীবনের সার্থকতার সন্ধান করিতে লাগিল। সে আদর্শ যত্নের সহিত আয়ত্ত করিয়া তাহাতেই সার্থকতা লাভ করিবার জন্য সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। একখানা খাতা করিয়া শুভা তাহার উপরে এবং চারিদিকে লিখিল "পতি পরম গুরু" তার পর সে সমস্ত বইগুলি হইতে নারী জীবনের আদর্শ ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নানা সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উপদেশ সংগ্রহ করিয়া লিখিল। তার পর লিখিল তার জীবনের প্রধান প্রধান সংকল্পের কথা, আর লিখিল দৈনিক জীবনে সে কখন কোন কাজ অবশ্য

করিবে। নারীজীবন সম্বন্ধে মনু ও মহাভারতের যত উপদেশ সব সে বইয়ে ছিল। তাহার সংকল্পিত আদর্শ আয়ত্ত করিতে পারিলে সে মনু যাজ্ঞবল্ক্যাদির উপদিষ্ট আদর্শ নারীজীবন আয়ত্ত করিতে পারিত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

শ্বশুরবাড়ী আসিয়া, বিশেষতঃ শাশুড়ীর মৃত্যুর পর হইতে, তাহার সংকল্পিত আদর্শগুলি একে একে ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া গেল। সে প্রাণপণে সে সকলকে আঁকড়িয়া রহিল, কিন্তু অবস্থার পীড়নে সব ছাড়িতে হইল। কেন না, যে দেবতাকে আশ্রয় করিয়া এই আদর্শ গঠিত, সে দেবতা তার একটা মাটীর ডেলার চেয়ে অধম, কাঠ খড় দিয়া ঠাকুর গড়িয়া বরঞ্চ তাতে ভক্তি বাঁধিয়া রাখা যায় কিন্তু একটা জড় মাংসপিণ্ড, যে কেবল মাত্র স্থূলদেহসার, তাকে লইয়া সে সব বেশীদিন চলে না। অনেকদিন শুভা এই পিণ্ডময় দেবতাকে কবিতা দিয়া সজীব করিয়া দেবতার আসনে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে দেবতা জোর করিয়াই আঁস্তাকুড়ের ময়লার ভিতর গড়াইয়া পড়িয়াছিল।

এখনো শুভা মনের কাছে এ কথা সম্পূর্ণ স্বীকার করিত না। তার আদর্শ তার কাছে বড় প্রিয় ছিল, কেননা—তার ভিতরই সে নিজের জীবনের সার্থকতা পাইবে আশা করিয়াছিল। তাই এতেও সে একেবারে সে আদর্শ ছাড়িতে পারিতেছিল না। বিদ্রোহী হৃদয়কে দমন করিয়া সীতা বা গ্রীসেল্‌ডার আদর্শে নিজেকে চালিত করিবার জন্য সে কঠোর সাধনা করিত। কিন্তু হায়, যে রাজা তার সীতা বা গ্রীসেল্‌ডার জীবন ধন্য করিবে সে রাজা কৈ?

আজ স্বামীর কাছে সহস্রতম বার পদাঘাত খাইয়া তাহার সে বালির প্রাসাদ একেবারে চুরমার হইয়া গেল। সে হাড়ে হাড়ে বুঝিল যে তার আদর্শ ভূয়া, আশা কেবল ফাঁকি। বড় আশা করিয়া সে জীবন আরম্ভ

করিয়াছিল—জীবন সার্থক করিবে। আজ একুশ বছর বয়সে সে বুঝিল যে তার সমস্ত জীবনটা একটা প্রকাণ্ড ব্যর্থতা—একটা মরীচিকা ভ্রান্ত পথিকের মরুভূমি পথে শ্মশানযাত্রা। সমস্ত জীবনটা তার কাছে আহারাদি ক্রিয়ার একটা দুর্বিষহ ক্লান্তিকর পৌনঃপুনিক আবৃত্তি মাত্র মনে হইল। সে ভাবিল কেন এ জীবন? কেবল মরিয়া ছাই হইবার জন্য এ নিরর্থক দীর্ঘ প্রয়াস কেন?

সে শুইয়া ভাবিতে লাগিল—কখন ঘুমাইয়া পড়িল তাহা সে জানিতে পারিল না।

শেষ রাত্রে নিদ্রাভঙ্গে সে দেখিল সে স্বামীর আলিঙ্গনবদ্ধ। মুহূর্ত্তের জন্য একটা তৃপ্তির অবসাদে তাহার শরীর এলাইয়া পড়িল সেও স্বামীকে আলিঙ্গন করিবার জন্য হাত বাড়াইল। সহসা তাহার হৃদয় দারুণ ঘৃণায় পূর্ণ হইল, সে যেন চাবুক খাইয়া উঠিয়া পড়িল। যেখানে স্নেহ নাই শুধু কামনা আছে সেখানে আলিঙ্গন যে পদাঘাতের চেয়ে গুরুতর আঘাত, ভীষণতর অপমান আজ সে প্রথম তাহা অনুভব করিল। সে তড়াক করিয়া বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিল। দুয়ার খুলিয়া বাহিরে গিয়া দেখিল পূর্ব্বদিক পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে, ভোর হইতে আর দেরী নাই। সে তাড়াতাড়ি এটা ওটা গৃহকার্য্যে মনোযোগ করিল, শেষে কয়লার ঝুড়ি লইয়া উনান ধরাইতে গেল।

সকাল আর হইতে চায় না। রান্নাঘরে কয়লা ধরাইতে ধরাইতে তাহার কেবলি ভয় হইতে লাগিল পাছে স্বামী উঠিয়া আসিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়। কিন্তু নিবারণ তাহা করিল না। সে আজ স্ত্রীর ব্যবহারে কিছু অবাক হইল, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল, অভিমান হইয়াছে, তা' সাধিবার প্রয়োজন নাই—বরং ততক্ষণ ঘুমাইলে কাজ দিবে। সে কাজেই পাশ ফিরিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

বেলা নয়টার সময় উঠিয়া চা খাইয়া নিবারণ হুঁকা হাতে গলির মুখে গিয়া ফুটপাথে রোজ খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিত ও প্রায়ই দুই চারিজন ইয়ার বন্ধু লইয়া গল্প করিত। এক ঘণ্টা বাদে ফিরিত। তাহার পর একটা গামছা কাঁধে ফেলিয়া বাজারে বাহির হইত। তার পর আর এক দফা আলস্য ও তামাক খাওয়া। তার পর স্নান আহার। আহারের পর দীর্ঘ শয়ন। আজও এই নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম হইল না।

দ্বিপ্রহরে স্বামী শয়ন করিলে শুভা গৃহকার্য্য সারিয়া বারান্দার উপর একখানি মাদুর বিছাইয়া বই পড়িতে বসিল। কতকগুলি বই লইয়া বসিল—তার মধ্যে বেশীর ভাগ নারীর কর্ত্তব্য বিষয়ক। একটা ফেলিয়া আর একটা লইয়া সে পড়িতে লাগিল, কোনটাই আজ তাহার মনে ধরিল না। এই সব বই সে বার বার করিয়া পড়িয়াছে। অনেক জায়গায় বেশ চওড়া করিয়া লাল কালির দাগ দিয়াছে—সেই সব জায়গা পড়িয়া তাহার আজ হাসি পাইল। যে সব বই অমূল্য উপদেশপূর্ণ বলিয়া সে মনে করিত আজ সেগুলি নিরর্থক জ্যাঠামীর নিদর্শন বলিয়া জ্ঞান হইল। সব বই ফেলিয়া শেষে সে "দেবী চৌধুরাণী" খুলিয়া বসিল। শেষ পরিচ্ছেদে যেখানে দেবী সাগরকে গৃহস্থধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেছেন এবং গৃহের ভিতর নিষ্কাম ধর্ম্মের সাধনার গূঢ় মর্ম্ম বুঝাইতেছেন সেইখানটা তিনবার পড়িল। যে উপদেশ সে দিনের পর দিন সে গায়ত্রীর মত জপ করিয়াছে—সেই উপদেশ স্মরণ করিল - মানুষের জীবন ভোগের জন্য নহে কর্ত্তব্য সাধনের জন্য—জীবনের প্রকৃত আদর্শ নিরন্তর সকলের জন্য আত্মবিসর্জ্জনে"—কথাগুলি আওড়াইয়া গেল, মনে লাগিল না।

একটা কথা তাহার মনে কেবলি ঘা দিতেছিল, সে কথার একটা সঙ্গত জবাব সে কোথাও পাইল না। "ধর্ম্ম, কর্ম্ম, নিষ্কাম সাধনা যতই যা বল সে কিসের জন্য, মানুষের জীবন কিসের জন্য?" কর্ত্তব্যেই কর্ত্তব্যের

পরিসমাপ্তি এ কথাটা লেখা সোজা কিন্তু প্রাণে তাহা মানে কই। যখন কেহ আকুল হৃদয়ে জীবনের পথ সন্ধান করিতে বাহির হয় তখন এ সব ফাঁকা কথায় মন ভিজে না। আজ শুভার ব্যথিত-হৃদয় কেবলি বলিতে-ছিল "কিসের জন্য"—"কেন?" তাহার তৃপ্তিপ্রদ উত্তর সে খুঁজিয়া পাইল না।

"দূর কর ছাই" বলিয়া সে বই গুলি দূরে ফেলিয়া দিল। "এরা সব কথা বেচে খায়, জীবনের খবর রাখে না। এ সব উপদেশ যাদের পোষাকী জীবন—যারা সংসারে তাকে তোলা আছে তা'দের সাজে। ঐ যে চারু বালা, যার স্বামী তাকে নিয়ে আদর ক'রে শেষ পায় না তা'র সাজে, যে বড় লোকের ঘরণী গৃহিণী, যার হুকুমে দশটা চাকর চাকরাণী ছুটাছুটী ক'রছে, চাঁদের মত ছেলে পিলেয় ঘর ভরে র'য়েছে তা'দের সাজে। আমি সৃষ্টিছাড়া—বাপের ঘরে ঠাঁই নাই, শ্বশুর ঘরে বাঁদীর অধম—স্বামীর কাছে আদর নাই যা'র, তার কাছে সে সব উপদেশ নিষ্ঠুর পরিহাস। যা'র কেউ নেই—স্বামী নাই, দেওর নাই ভাসুর নাই, শ্বশুর নাই, শাশুড়ী নাই, এক ফোঁটা একটা ছেলে নাই—তার কি সার্থকতা জীবনে? সে কথা এরা কি জানে—এরা জীবনে সুখের ঢেউয়ের উপর বাসা ক'রে আছে এরা তা'র খবর রাখে কি?"

ছেলের কথা মনে হইয়া শুভার মনে পড়িল যে একবার নয় দুইবার সে অন্তঃসত্বা হইয়াছিল। কেবল নিষ্ঠুর পিশাচ স্বামীর অত্যাচারে সে গর্ভ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মনে পড়িল একবার স্বামী তাহাকে ধাক্কা দিয়া সিঁড়ি দিয়া গড়াইয়া দিয়াছিল। সেখান হইতে তাহাকে সবাই ধরাধরি করিয়া ঘরে আনিয়া শোয়াইয়া দিয়াছিল—সেই রক্তাক্ত শয্যায় সে একমাস পড়িয়াছিল, স্বামী তাহার প্রায় কোনই খোঁজ নেয় নাই। আর একবার স্বামীর পদাঘাতে গর্ভের ভ্রূণ মরিয়া গিয়াছিল। মনে

হইল যে যদি তার একটা ছোট্ট শিশু থাকিত তবে তার বাঁচিয়া থাকিবার একটা হেতু থাকিত, জীবনের একটা লক্ষ্য থাকিত। আর এখন—এখন তাহার কিছুই নাই। কেবল বাঁচিয়া থাকাতেই তাহার জীবনের অশ্লাঘ্য পরিনিষ্ঠা।

মনে পড়িল তাহার শৈশবের কথা—তখনকার সেই কল্পনা, তখনকার জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ—এতদিনকার অনাদৃত পরিভূত সেই অতীত জীবনের স্বপ্নের কথা। সে পড়িয়াছিল ভগিনী ডোরার জীবনী, ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেলের কাহিনী—কতবার সে তাহাদেরই মত অক্ষয়কীর্ত্তি অর্জ্জনের স্বপ্ন দেখিয়াছে! আবার কোনও দিন হয় তো জর্জ্জ এলিয়টের কথা পড়িয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে অমরখ্যাতি অর্জ্জনের কল্পনা করিয়াছে। কখনো বা শ্রীমতী বেসাণ্টের জীবনের অপূর্ব্ব কাহিনী ধ্যান করিয়া আপনার অঙ্গুলী চালনায় শত শত নরনারীকে ন্যায় ও সত্যপথে পরিচালিত করিয়া স্বদেশের অশেষ কল্যাণ সাধনের সংকল্প করিয়াছে। আজ সে সব অতল জলে গিয়াছে।

গিয়াছে কি? আর কি সে সাধনা ফিরিয়া পাওয়া অসম্ভব? এখনো কি সে এই ক্ষুদ্র সংসারের গণ্ডী ছাড়িয়া বাহির হইয়া নিজের জীবনে তেমনি কোনও মহৎ আদর্শ আয়ত্ত করিতে পারে না? শ্রীমতী বেসাণ্টের কথা মনে হইল। তাঁহারও তো বিবাহ হইয়াছিল, বিবাহিত জীবনের ক্ষুদ্র পরিসর ত্যাগ করিয়া তবেই না তিনি জীবনে সার্থকতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন! শুভা কি তাহা পারে না?

এ কথা মনে করিতে তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু রক্ত নাচিয়া উঠিল। এই সাত বৎসর তাহার সমস্ত পৃথিবী এই ঘর-বাড়ীর চতুঃসীমার ভিতর আবদ্ধ রহিয়াছে—তাহার বাহিরে পথ—ঘোর বিপদ সঙ্কুল পথ, যেখানে পা ফেলিতে সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। সেই পথে দাঁড়াইবার

তাহার সাহস কোথায় ? নিরাশ্রয়, অসহায় সে, সেখানে কাহাকে ভরসা করিয়া দাঁড়াইবে ? কোথায় দাঁড়াইবে ? কি খাইবে ? আর খাইতে পাইলেই বা কেমন করিয়া সে আদর্শের অনুশীলন করিবে ?

পথের দিকে চাহিয়া দেখিল। হাজার হাজার নরনারী সে পথে চলিতেছে—তাহাদের মুখে তো উদ্বেগের চিহ্ন মাত্র নাই। সেও কি অমনি হাজার হাজার লোকের মত পথে দাঁড়াইতে পারে না—কিসের ভয় ? পুরুষ যাহা পারে, হাজার হাজার নারীও যাহা পারে, সে কি তাহা পারিবে না ?

শুভা খানিকক্ষণ ভাবিল। যাহা ভাবিল সে কথা মনে হইতে তাহার লজ্জায় মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল। তখন তাহার মনে এমটা ভীষণ ভাব উপস্থিত হইল, ক্রোধে তাহার চক্ষু লাল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "যে অপমানের ভয় সে অপমান তো ঘরে থেকে রোজ হ'বে। আজ আমার বড় ঘৃণা হ'য়েছিল, কিন্তু এ রাগ তো থাকবে না।" যতই সে ভাবিতে লাগিল ততই পথে বাহির হওয়ার চিন্তাটা তার পক্ষে কম ভীষণ বোধ হইতে লাগিল। সে দাঁড়াইবে কোথায় ? খাইবে কি ? অনেক ভাবিল। তাহার রূপ আছে, যৌবন আছে, ভয় আছে, তাই কোনও পথই তাহার মনে ধরিল না।

তাহাদের বাড়ী সম্মুখে গলির অপর পারে একখানা খুব প্রকাণ্ড বাড়ী। সে বাড়ীর সম্মুখটা বড় রাস্তার উপর, পিছনের জানালা গুলি সব শুভার বাড়ীর দিকে খোলা। শুভার জানা ছিল যে, সে বাড়ীর মালিক এক জন খুব বড় ব্যবসাদার। দিনরাত সে বাড়ী লোক জন গাড়ী ঘোড়া মোটরে গম গম করিত।

এই বাড়ীর তেতলার একটা জানালায় একটি যুবক এক দৃষ্টে অনেকক্ষণ ধরিয়া শুভাকে দেখিতেছিল। শুভা একবার চোখ তুলিতেই দেখিতে পাইল, যুবকটী একাগ্র ভাবে তাহাকে দেখিতেছে। চোখে

চোখে দেখা হইতেই যুবক অন্যদিকে চাহিল। শুভাও লজ্জায় মুখ নত করিল।

এ যুবক তার অপরিচিত নহে। অনেক দিনই সে ইহাকে দেখিয়াছে। অনেক দিন সে এই জানালায় দাঁড়াইয়া তৃষিত নয়নে তার দিকে চাহিয়া থাকিয়াছে অনেক দিনই চখো-চখি হইয়াছে।

হঠাৎ একটা দুর্দ্দম ইচ্ছা তাহার বুক ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল—তাহার সমস্ত শরীর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল—তাহার বড় ভয় হইল, কিন্তু সে ইচ্ছাকে সে দমন করিতে পারিল না! তাহার মনে হইল তাহার রূপ আছে, যৌবন আছে, তাহার খাইবার ভয় কি? ঘরে থাকিলেও শরীর বেচিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে বাহিরেও না হয় তাহাই হইবে। কিন্তু স্বাধীনতা চাই, মুক্তি চাই, জীবনটাকে সার্থক করিবার একটা অবসর চাই! শুভার মনে হইল এ যুবক ধনী—এই তা'র মুক্তি লাভের সোপান। সে মন শক্ত করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল, বুকের ভিতর দড়াস্ দড়াস্ করিতে লাগিল, কিন্তু সে মুখ ফিরাইল না, চাহিয়া রহিল। যুবক এবারও একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল, আবার মুখ ফিরাইল, কিন্তু শুভা চাহিয়া রহিল। আবার যুবক চাহিতে শুভা ফিক্ করিয়া একটু হাসিল। যুবকও হাসিল। শুভা তার পর তাহাকে হাত ছানি দিয়া ডাকিল। যুবক জানালা হইতে সরিয়া গেল।

দুর্দ্দমনীয় লজ্জায় শুভার হৃদয় ভরিয়া গেল। কি অপমান! পরে তাহার মনে হইল যে যুবক হয় তো তাহার কাছেই আসিতেছে। সে উঠিয়া পথের দিকে তাকাইল, দেখিল তাহার অনুমান মিথ্যা নহে। যুবক আসিয়া তাহারই ঘরের নীচে রাস্তায় দাঁড়াইয়াছে। একখানা কাগজে শুভা তাড়াতাড়ি পেন্‌সিল দিয়া লিখিল, "যদি আমাকে চাও তবে রাত্রি ১২ টার সময় সদর রাস্তায় মোটর লইয়া আমার প্রতীক্ষা করিও।"

শুভা কাগজ খানা ফেলিয়া দিল। যুবক তাহা তুলিয়া পড়িল। শুভার দিকে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা।"

সে দিন সন্ধ্যা বেলায় শুভা কম্পিত হস্তে যত্নের সহিত তাহার স্বামীর জন্য সিদ্ধির সরবৎ প্রস্তুত করিল এবং নিজ হাতে স্বামীকে তাহা খাওয়াইল। নিবারণ হাসিয়া বলিল, "বাঃ এ যে মেঘ না চাইতে জল।" শুভা কিছু বলিতে পারিল না। তার মুখ অত্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি স্থানান্তরে গেল। সিদ্ধি তৈয়ার করিতে করিতে শুভার হাত পাকিয়া গিয়াছিল, তাহাতে কি দিলে কি হয় তাহা তাহার জানা ছিল। তাই আজ নিবারণ সকাল সকাল খাইয়া শুইয়া পড়িল, আর কুম্ভকর্ণের মত ঘুমাইতে লাগিল। রাত্রি বারটার সময় শুভা স্বামীর ঘরে বাহির হইতে শিকল টানিয়া দিয়া আস্তে আস্তে পা টিপিয়া বাহির হইয়া সদর রাস্তায় গেল।

হরি! হরি! মোটর তো কোথাও নাই! শুভার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, সে জগৎ অন্ধকার দেখিল।

এই তো পথ, সে তো তা'র ছোট ঘরটি ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়াছে। আর ফিরিবার উপায় নেই, সাহস নাই—এখন সে দাঁড়াইবে কোথায়? সে কি বোকা! একটা অচেনা বখা ছোকড়ার কথায় নির্ভর করিয়া সে কি সর্ব্বনাশ করিয়া বসিল। সে ফুটপাথের উপর ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল। চলিবার পথ সে দেখিতে পাইল না, ফিরিতে পা সরিল না।

রাস্তায় তখন একটিও লোক নাই। কলিকাতার চঞ্চল জীবন এখন সম্পূর্ণ শান্ত শুব্ধ, স্নধু দূরে একটা ভাঙ্গা পাখোয়াজের বাজনা ও সঙ্গে সঙ্গে একটা কর্কশ গলায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দুস্থানী গান শুনা যাইতেছে। এই নীরব স্তব্ধতার ভিতর দিয়া যেন সমস্ত গ্রহনক্ষত্রস্তব্ধ বিশ্বটা চাপা দিয়া শুভার হৃদয়টাকে পিষিয়া ফেলিতে লাগিল।

শুভা বুঝিল যে খালবিলের চেনা পথ ছাড়িয়া তার জীবন তরী এক সীমাশূন্য রেখাশূন্য বারদরিয়ায় আসিয়া পড়িয়াছে। এখানে আগে পিছে কোনও দিকেই যাইবার পথ নাই—চারিদিকে কেবল ছল ছল করিতেছে চোখের জলের সাগর—তার ভিতরে হাবুডুবু খাওয়া ছাড়া যেন আর কোনই উপায় নাই। শুভার সমস্ত হাত পা যখন অসাড় নিস্পন্দ হইয়া আসিয়াছে তখন একখানা খালি গাড়ী গলির মোড় হইতে বাহির হইল। গাড়ীর শব্দ তাহার সমস্ত শরীর এক চোট ঝাঁকাইয়া দিল। কিন্তু যখন সে দেখিল গাড়ীটা খালি তখন তাহার স্পন্দহীন দেহে প্রাণ আসিল। সমস্ত সাহস সংগ্রহ করিয়া সে যথাসম্ভব সহজ সুরে বলিল "গাড়োয়ান ভাড়া যাবি ?"

গাড়োয়ান বুড়া, সে একটু সন্দিগ্ধচিত্তে বলিল "সওয়ারী কুতা ?"

শুভা বলিল, "আমিই সওয়ারী।"

খানিক ইতস্ততের পর গাড়োয়ান সওয়ারী লইতে রাজী হইল, জিজ্ঞাসা করিল কোথায় যাইতে হইবে। সে কথা শুভা এতক্ষণ ভাবে নাই। মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বলিল, "শ্যামবাজার।" গাড়োয়ান চলিল।

* * * * *

তাহার মিনিট দশেক পরে একখানা ট্যাক্সি করিয়া একটি যুবক সেই খানে নামিয়া ব্যস্ত ভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করিয়া ট্যাক্সি বিদায় দিয়া সে সম্মুখের বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল।

[২]

গাড়ীতে উঠিয়া শুভা অনেকটা স্বস্তি বোধ করিল। সেখান হইতে পলাইতে হইবে কেবল ইহাই স্থির করিয়া সে গাড়ী ডাকিয়াছিল, এখন সে কোথায় যাইবে কি করিবে তাহা ভাবিবার সময় পাইল।

গত রাত্রি হইতে সে যত কথা ভাবিতেছে সব আবার ফিরিয়া ম
করিল। সে স্থির করিল তাহাকে স্বাধীন হইতে হইবে, জীবনা
সার্থক করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। জীবন সার্থক করিবার জ
সে কোনও মূল্যই অদেয় বিবেচনা করিল না। অপমান বা অত্যাচ
সে মনে মনে বরণ করিয়া লইল।

কমলা থিয়েটারের সামনে সে গাড়ী দাঁড় করাইল। সেখানে এ
নূতন পালা অভিনয় হইতেছে, লোক গিস্ গিস্ করিতেছে। অতগু
লোকের সামনে উজ্জ্বল আলোতে নামিতে তাহার কেমন একটু বা
বাধ ঠেকিল। বুক ভয়ানক কাঁপিতে লাগিল। খুব চেষ্টা করি
নিজকে সংযত করিয়া সে নামিয়া পড়িল। সে একেবারে শূন্য হাতে
পথে বাহির হইয়াছিল, এখন গাড়ী ভাড়া দেওয়ার কি উপায় করিবে
তাহাই ভাবিতে লাগিল। তাহার হাতে একটা সস্তা সোণার আং
ছিল. সেটী খুলিয়া সে গাড়োয়ানকে বলিল "আমি ভুলে টাকা নিয়ে
আসি নি, তুমি এইটে নিয়ে যাও।"

গাড়োয়ান সম্মত হইল না, কিন্তু চেঁচামেচি না করিয়া সে নিকটবর্ত্তী
একটা দোকান দেখাইয়া দিল। শুভা সেই দোকানে গিয়
আংটী ও একগাছা চুড়ী বেচিয়া দশটা টাকা পাইল। গাড়োয়ানকে
এক টাকা দিয়া বাকী টাকা আঁচলে বাঁধিল।

থিয়েটারে গিয়া সে ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহিল।
ম্যানেজার পৃথ্বীরাজের বেশে তাহার সহিত তাঁর সাজঘরে সাক্ষাৎ করিলেন।

ম্যানেজারের নাম অতুলবাবু। বয়স চল্লিশের উপর হইবে না, দিব্য
সুপুরুষ। তিনি এ থিয়েটারের মালিকও বটে ম্যানেজারও বটে এবং
সব প্রধান অংশের অভিনেতাও বটে। বড়লোকের ছেলে, কিন্তু
থিয়েটারের বাতিকে অনেকটা বড়লোকী তাঁহার খর্ব্ব হইয়াছে।

ম্যানেজার খুব আস্তে আস্তে কথা বলেন, ঠিক যেন স্বপ্নাবেশে। হাত পায়ের ভঙ্গী সব সময়ে যেন অভিনয়ের মত। তিনি ঠিক অভিনয়ের ভঙ্গীতেই শুভাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ অসময়ে আপনি আমাকে ডেকেছেন কেন? কিছু প্রয়োজন আছে কি?"

শুভা বলিল, "আমি অনাথা, একেবারে নিরাশ্রয় হ'য়ে আপনার কাছে এসেছি। একজনকে আশ্রয় ক'রে আমি স্বামীর ঘর ত্যাগ ক'রে এসেছি সে আজ আমায় পথে ফেলে গেছে। তাই আপনার কাছে এসেছি, আপনি আমায় যা কিছু একটা কাজ দিয়ে আমায় রক্ষা করুন।" শুভা কাঁদিয়া ফেলিল।

স্ত্রীজাতির প্রতি, বিশেষতঃ সুন্দরী এবং যুবতী স্ত্রীলোকের প্রতি ম্যানেজারের বিশেষ পক্ষপাত ছিল। এই সুন্দরীর অশ্রুজলে তাঁহার দয়া এবং লালসা সমান উত্তিক্ত হইল। তিনি বলিলেন, "তুমি কখনো এক্ট ক'রেছ?"

"না।"

"হুঁ! আচ্ছা কাল রিহার্সালের সময় এসো, একবার দেখবো কি ক'রতে পারি।" ম্যানেজার ভাবিতেছিল যে এমন সত্য সত্য সুন্দরী স্ত্রীলোক রঙ্গমঞ্চে দেখা যায় না; ইহাকে গড়িয়া পিটিয়া লইতে পারিলে কাজ হইবে।

তখন চতুর্থ অঙ্ক শেষ হইয়া ড্রপসিন পড়িয়া গেল। দলে দলে নানা অপূর্ব্ব সজ্জায় সজ্জিত নরনারী সেদিকে আসিতে লাগিল। সবাই শুভাকে কৌতুকের সহিত দেখিতে লাগিল। তাহাদের হাবভাব ও চাহনীর ভঙ্গীতে শুভার বেশ একটু অপমান বোধ হইতে লাগিল।

ঘরের বাহিরে একটা গোলমাল শুনা গেল। নৃত্যশিক্ষক নরেন্দ্রবাবু ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ! এখন উপায়?"

"কি হ'য়েছে ?" বলিয়া অতুলবাবু মুখ ফিরাইলেন। নরেন্দ্রবাবু যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এই যে প্রধানা নর্ত্তকী পাঁচী হঠাৎ ফিট হইয়া পড়িয়াছে। সে কিছুতেই অভিনয় করিতে পারিবে না। তাহার স্থলবর্ত্তী চাঁপা নাম্নী যে অভিনেত্রী কাজ চালাইতে পারে তাহাকে আজ সংযুক্তার ভূমিকা দেওয়া হইয়াছে, কারণ মূল সংযুক্তা আজ গরহাজির। এখন উপায় কি ?

ম্যানেজার বলিলেন, "গোলাপীকে সাজিয়ে দেও।" গোলাপী কিছুক্ষণ আগেই তাহার অভিনয় সমাধা করিয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছে।

"মোটর পাঠাও।"

মোটর গোলাপী ও মূল সংযুক্তার সন্ধানে ছুটিল। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বন্ধ রহিল।

তখন শুভা বলিল, "আমি ঠিক কখনো এক্ট করি নি এমন নয়, আমাদের স্কুলে প্রাইজের সময় যে সব action song হ'ত তা'তে আমি প্রধান part নিতাম।"

ম্যানেজার কথাটা শুনিল কি না বোঝা গেল না। হঠাৎ সে নরেন্দ্রকে বলিল, "বই খানা নিয়ে এস তো।"

বই খানা লইয়া সে পঞ্চম অঙ্ক খুলিয়া খুব তাড়াতাড়ি পাতা উল্টাইতে লাগিল এবং একটা পেনসিল দিয়া ঘ্যাস ঘ্যাস করিয়া লেখা কাটিতে লাগিল। এই কার্য্য শেষ করিয়া সে বইখানা শুভাকে দিয়া বলিল, "তুমি এই জায়গাটা এক্ট করবার মত ক'রে প'ড়ে যাও তো ?"

শুভা পড়িল। তাহার গলাটা একটু কাঁপিয়া গেল ; কিন্তু মোটের উপর উৎরাইল ভাল।

তখন অতুল নৃপেন্দ্রকে বলিল, "যাও চাঁপাকে নর্ত্তকী সাজাওগে আমি সংযুক্তার ব্যবস্থা ক'রছি।"

ম্যানেজার বলিল, "এই দেখ সংযুক্তার পার্ট! এটাকে কেটে ছেঁটে সব কথা প্রায় উঠিয়ে দিয়েছি। এটা তৈয়ার কর।" বলিয়া ম্যানেজার শুভাকে শিখাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে ম্যানেজার সন্তুষ্ট হইয়া শুভাকে ড্রেসারের হাতে সমর্পণ করিয়া দিল।

এখানে শুভার নূতন পরীক্ষা! সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি পুরুষ তাহার শরীরে হস্তার্পণ বিষয়ে যে স্বাধীনতা অবলম্বন করিল তাহাতে সে চমকিয়া উঠিল। কিন্তু দৃঢ়তার সহিত সে সকল সঙ্কোচ দূর করিয়া তাহার সাজসজ্জা সম্পূর্ণ করিল। যখন সে ম্যানেজারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন ম্যানেজার বলিল, "বাহবা বাহবা! যদি কোনও মতে পার্টটা হাসিল ক'রতে পার তবে ত কেল্লা মার দিয়া।" বলিয়া কতকটা লোলুপ-দৃষ্টিতে এই নূতন সংযুক্তার দিকে চাহিল। এ সম্ভাষণেও শুভা চমকিত হইল, কিন্তু সে হটিল না। বরং আরসীর ভিতর তাহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের প্রতিরূপ দেখিয়া একটু মৃদু হাস্য করিল।

ড্রপসিন উঠিল। প্রথম গর্ভাঙ্কে সংযুক্তার কোনও কাজ ছিল না। শুভা উদ্‌গ্রীব হইয়া সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রীর কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিল। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে সে কম্পিত পদে ফুটলাইটের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। তখন যেন বিশ্বজোড়া লজ্জা তাহার সমস্ত শরীর ছাইয়া পড়িল। সে মাথা নীচু করিয়া কম্পিত বক্ষে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। উইঙ্গের আড়াল হইতে ম্যানেজারের বুক কাঁপিয়া উঠিল। তখন তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া জয়চন্দ্রের দূত তাহাকে অনুনয় করিতেছিল! ধীরে ধীরে শুভার বলিষ্ঠ-হৃদয় তাহার সঙ্কোচ জয় করিল; সে আস্তে আস্তে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইল। ততক্ষণ জয়চন্দ্রের দূত তিরস্কার আরম্ভ করিয়াছে। শুভা যখন তাহার সরল দেহ সোজা করিয়া ও তাহার হৃদয়ের সম্পূর্ণ তেজ সংহত করিয়া সেই অভিনেতার দিকে চাহিল তখন

তাহাকে সত্যই এক দৃপ্ত মহীয়সী রাণীর মত দেখাইল। এখন শুভার কথা কহিবার পালা। কিন্তু কে যেন তাহার গলা একেবারে চাপিয়া ধরিল। বহু কষ্টে সে ধীরে ধীরে তাহার সামান্য কয়েকটা কথা বলিয়া শেষ করিল। ম্যানেজার উইংসের আড়াল হইতে বলিতে লাগিল, "চেঁচাও চেঁচাও।" সেই কথা শুনিয়া শুভার হুঁস হইল। শেষ কথা সে খুব চীৎকার করিয়াই বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল।

শুভা ভিতরে প্রবেশ করিতেই ম্যানেজার বলিল, "যাও শীগগির পোষাক ছেড়ে ফেল গে।" শুভা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু গ্রীণ রুমে গিয়া বুঝিল। আসল সংযুক্তা ততক্ষণ আসিয়া পৌছিয়াছিল, শুভার পরিত্যক্ত বেশ পরিয়া পরের দৃশ্যে সেই সংযুক্তা হইয়া উপাস্থিত হইল।

অভিনয়ান্তে ম্যানেজার বলিল, "ভাগ্যে চারু এসে পৌঁছেছিল, নৈলে ত ইনি আমাদের ডুবিয়েছিলেন।"

চারু হাসিয়া বলিল, "আপনার যেমন বিদ্যে, একটা আনকোরা নতুন লোককে দিয়েছেন সংযুক্তার পার্ট!"

শুভা লজ্জায় মরিয়া গেল। ভয়ে তার তালু পর্য্যন্ত শুকাইয়া গেল সে বলিল, "কাল তবে কোন সময় আসবো?"

ম্যানেজার বলিলেন, "আসবে? এসো একবার, দেখা যাবে। কিন্তু তোমাকে দিয়ে হ'বে মনে হচ্ছে না।"

শুভা তখন জগৎ অন্ধকার দেখিল। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া চাঁপা বলিল, "হাঁ ম্যানেজার ও বেচারা আচমকা এসে তোমায় এমন বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রলে! আর ওর সঙ্গে এমন কথা! আমি হ'লে ওকে এখনি একশো টাকা বখশিস্ দিয়ে দিতাম।"

ম্যানেজার পকেট হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া

বলিল, "তা সত্যি! তুমি আমাদের বড় বিপদে রক্ষা করেছ। তাই তোমার আজকের মজুরী এই দশ টাকা নেও।"

টাকাটা নিতে শুভার হাত কাঁপিয়া উঠিল। চাঁপা আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "হাঁ ভাই তুমি কোথায় থাক?"

শুষ্ক কণ্ঠে শুভা উত্তর করিল, "আমার থাকবার কোনও জায়গা নেই।"

"সে কি গো! তবে এখন কোথায় যাবে?"

"জানি না।"

চাঁপা দরদের সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল শুভার চোখে জল! সে বলিল, "আচ্ছা' তবে তুমি আজ আমার সঙ্গে চল। তোমার সব কথা ভাই আমার জানতে ইচ্ছে ক'রছে।"

ততক্ষণ তাহারা ষ্টেজের ভিতর একটা সিনের আড়ালে আসিয়া পড়িয়াছিল। শুভা চাঁপার স্নিগ্ধ-বাক্যে একেবারে গলিয়া চাঁপার বুকে মুখ লুকাইয়া ফেলিল।

[৩]

চাঁপা বেশ্যার মেয়ে। তাহার মায়ের অনেক টাকাকড়ি ছিল; সে চেষ্টা করিয়া মেয়ের একটা বিবাহ দিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা ছিল না যে চাঁপা বেশ্যাবৃত্তি করে। কিন্তু জামাইটি কিছুদিন পর ভয়ানক মাতাল ও ঘোরতর পাপিষ্ঠ হইয়া উঠিল। কাজেই চাঁপার মা তাহাকে তাড়াইয়া দিল।

চাঁপা কিন্তু তাহার স্বামীটিকে ভালবাসিত। সে ভালবাসিবার মত এমন কিছু ছিল না, তবু চাঁপা তাহাকে ভালবাসিত। মা যখন তাহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিলেন তখন চাঁপা কয়েকদিন খুব কাঁদিল।

শেষে মাকে বাধ্য হইয়া জামায়ের খোঁজ করিতে হইল। কিন্তু জামাইকে পাওয়া গেল না। ক্রমে সংবাদ পাওয়া গেল যে জামাই ভুবনচন্দ্র একটী ভদ্রঘরের ধনীর বিধবাকে লইয়া একেবারে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে।

মাতা চাঁপার মন ভুলাইবার জন্য তাহার সঙ্গে এক মস্ত বড় জমীদারের ছেলের আলাপ করাইয়া দিল। কিন্তু তাহাতে চাঁপা বড় গোলোযোগ উপস্থিত করিল। এমন কি একদিন তাহার আঁচলে খানিকটা আফিম শুদ্ধ তাহার মা তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। শেষে নিরুপায় হইয়া মা তামা তুলসী গঙ্গাজল লইয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে সে আর চাঁপাকে কোনও রকমে বিরক্ত করিবে না।

চাঁপা সুগায়িকা, সহজেই তাহার থিয়েটারে একটা চাকরী জুটিয়া গেল, অভিনেত্রী বলিয়া তাহার খ্যাতি রটিতে বিলম্ব হইল না। তাহাকে লইয়া নানা থিয়েটারে কাড়াকাড়ি লাগিয়া গেল। শেষে সে কমলা থিয়েটারে বেশ মোটা মাহিনায় পাকা হইয়া বসিল।

থিয়েটারে অভিনয় করিতে করিতে চাঁপা একটি অভিনেতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। চাঁপা সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, সুগায়িকা, কাজেই সে যে পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল তাহাকে আপনার করিতে তাহার বিশেষ কষ্ট হইল না। কয়েকদিন চাঁপার একটা প্রেমের স্বপ্নের ঘোরের ভিতর দিয়া কাটিয়া গেল। কিন্তু একদিন তার সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। চাঁপা দেখিতে পাইল যে তাহার প্রেমাস্পদ তাহাকে ভাল বাসেনা। কেবল রূপের মোহে মুগ্ধ হইয়া সে তাহার পশুচরিত্র দিয়া চাঁপাকে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে ভালবাসিতে পারে নাই। তাহার ভালবাসা ছিল অন্যের উপর। সে একটা তুচ্ছ নারী কিন্তু বালিকা, ঢলঢল লাবণ্যে ভরা। দারুণ অপমানে চাঁপার সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল, এই

পুরুষটার চিন্তামাত্র তাহাকে শত বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা দিল। সে দ্বার রুদ্ধ করিয়া অপমানে, জ্বালায়, ক্ষোভে কাঁদিল। যখন সে ব্যক্তি আবার ফিরিয়া আসিল তখন সে মনে করিল চাঁপার অভিমান হইয়াছে। সে মামুলী সোহাগের কথায় চাঁপাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিল। সিংহীর মত গর্জ্জন করিয়া চাঁপা বলিল, "থাক, আর বক্তৃতা ক'রে দরকার নেই, খেয়ে দেয়ে বিদায় হও, আর আমাকে তোমার মুখ দেখিও না।"

যখন সে নিতান্তই চলিয়া গেল তখন চাঁপা আবার নূতন যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। এই অপদার্থ লোকটা যে তাহার সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিয়াছে—তাহাকে না দেখিয়া সে কেমন করিয়া থাকিবে? কেমন করিয়া দুঃসহ জীবন বহন করিবে? অনেকক্ষণ ধরিয়া চাঁপা একা একা কাঁদিল। কাঁদিয়া মনটা শান্ত হইল।

শেষে সে জোগাড় করিয়া সেই মেয়েটার সঙ্গে সেই ব্যক্তির বিবাহ দিয়া দিল। বেশ মোটা হাতে কিছু টাকা দিয়া চাঁপা তাহাদিগকে কাশী পাঠাইয়া দিল। বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল যে আর কখনও যেন তাহারা চাঁপার চক্ষের সম্মুখে না আসে।

সেই অবধি চাঁপা পুরুষদ্বেষিণী। থিয়েটারে সে মুখরা, চপলা ও লঘুভাষিণী। রঙ্গরসে ও মেশামেশীতে সে কাহারও চেয়ে কম নয়। কিন্তু কোনও প্রেমিকের সাধ্য ছিল না যে তাহার ত্রিসীমানায় অগ্রসর হয়। তাহার চোখা চোখা কথার ঝাঁজে খুব আগ্রহশীল নাগরকে পিছপা হইতে হইত।

শুভা শীঘ্রই দেখিতে পাইল যে চাঁপা ঠিক তাহার মনের মত মানুষটী। যা ভগবান যেন তাহাকে তার যমজ ভগিনীটির হাতে আনিয়া দিয়াছেন। তোমার সে প্রথম কয়েকদিন বেশ আরামেই কাটাইল। কিন্তু এক স

যাইতেই তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে স্বাধীন হইবে বলিয়া বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছে। এখানে আসিয়া চাঁপার গলগ্রহ হইয়া সে স্বাধীনতা বা সার্থকতা কিছুই পাইবে না। তাই সে একটা জীবিকার উপায় করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কমলা থিয়েটারে চাঁপা তাহাকে কিছুতেই যাইতে দিল না। সে বলিল, "অতুলটা অপদার্থ! ও তোমার কদর বুঝিবে না।" অগত্যা শুভা বিরত হইল।

একদিন শুভা বলিল "দিদি"—

চাঁপা হাসিয়া বলিল, "মর আবাগী, তুই আমাকে বুড়ী বানাবি! আমি কেন তোর দিদি হ'তে গেলুম? আমার কি নাম নেই?"

শুভা হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা তাই ভাল, দিদি নাই হ'লে, যাই হ'ক ভাই, আমার একটা গতি কর।"

"গতি কি অমনি হয়? গতি তো গাছের পাকা ফলটী নয় যে পাড়লুম আর খেলুম; তার জন্য সাধনা চাই। মেয়ে মানুষের এক গতি আছে বটে তার জন্য চেষ্টা ক'রতে হয় না, সেটা হ'চ্ছে বিয়ে। বাপ মায়ের যাই না কাল হ'ক মেয়ের তা'র জন্য কিছু ক'রতে হয় না। চুপচাপ ব'সে থেকেই গতি হ'য়ে যায়। তা' সে গতি তো তোমার মনে ধরে নি কো! অন্য গতি কর্ত্তে হ'লে সাধনা চাই।"

"তামাসা নয় ভাই, বলে দেও আমার কি ক'রতে হবে, আমায় শিখিয়ে পড়িয়ে ত'য়ের ক'রে নেও আমি তো আর তোমার গলায় বোঝা হ'য়ে থাকতে পারি না।"

তখন চাঁপা একটু গম্ভীর হইয়াই বলিল, "সত্যি বলছি; একটু ত'য়ের না হ'য়ে কোনও দিকে চেষ্টা ক'রতে গেলে সেদিন যেমন হ'য়েছে অমনতি অপমান হ'তে হ'বে। থিয়েটারে যাওয়াই যদি তোমার মত হয় ভয়। তামাকে কিছুদিন গান বাজনা আর এক্টিং শিখতে হ'বে।

নাচটাও শিখতে পারলে ভাল হ'ত কিন্তু এ বয়সে আর নাচ উৎরাবে না। আমার কিন্তু ভাই তোমাকে থিয়েটারে পাঠাতে মোটেই মন সরে না।"

"কেন?"

"কেন? তুমি জান না, সেটা একটা নরক।"

"তবে তুমি যাও কেন?"

"আমি যাব না? আমি যে নরকের ডবল টীকে দিয়েছি। আমায় নরকে ডোবায় কার সাধ্য।"

শুভা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তা হ'ক এ ছাড়া আর উপায় কি? বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে হ'য়ে জন্মেছি যেখানেই যাই অপমান না হ'য়ে উপায় নাই। না হয় যাবে যাবে মান ইজ্জত। এমনি কি তাতে লোকসান। সোয়মীর ঘরে তার চেয়ে কম হ'য়েছে কি?"

চাঁপা গভীর দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল' বলিল, "শুভা বড় দুঃখে তুমি কথাগুলি বল্লে ভাই! কিন্তু আমি থাকতে কেন তুমি এ কষ্ট সইতে যাবে। আমি কি তোমার মত একটি বন্ধুকে খেতে পরতে দিতে ম'রে যাব?"

শুভা বলিল, "না সে হ'বে না। যদি আর একজনের গলগ্রহই হ'য়ে থাকবো তবে আর স্বামীর ঘর ছেড়ে আসবো কেন? তুমি আমার গুরু হ'য়ে আমায় শিখিয়ে পড়িয়ে নেও আমি থিয়েটারেই যাব।"

চাঁপা একটু ভাবিল। শেষে বলিল, "আচ্ছা তাই হ'বে। আজ দুপুরে তোমার শিক্ষা আরম্ভ হ'বে। কিন্তু দু' তিন মাসের আগে তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'বে না। এর মধ্যে তুমি আমার খেলে পরলে তো তোমার অপমান হ'বে না?"

"রাগ করো না ভাই! তোমার কাছে আমার দেনার শেষ নাই। তোমার খেলে পরলে আমার কোনও অপমান নেই। কিন্তু আমি মানুষ হ'তে চাই, আপনার পায় দাঁড়াতে চাই। তুমি কি আমায় তা হ'তে দিতে চাও না? তবে লক্ষীটি, রাগ করো না। এ দু তিন মাস আমি তোমারই খাব। তবে মাঝে মাঝে এক আধটা ছুটকো ছাট্‌কা পার্টে প্লে করে দু'চার টাকা তোমায় দিতে পারবো না কি?"

চাঁপা বলিল, "না সে হ'বে না। তুমি মিনার্ভার কথা নিশ্চয় শুনেছ। মিনার্ভা একেবারে বর্ম্ম চর্ম্ম অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে জন্মেছিলেন। আমি তোমাকে যেদিন ষ্টেজে নিয়ে খাড়া ক'রবো সেদিন তুমি একদম সবার সেরা একট্রেস হ'য়ে, একেবারে মিনার্ভার মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'য়ে দাঁড়াবে। তার আগে আমি তোমায় যেতে দিচ্ছি নে। বরং এক কাজ কর। আমি তোমাকে কাগড় এনে দি, তুমি জামা সেলাই কর তাই বিক্রী ক'রে দু' পয়সা পাবে।"

"তুমি আমাকে যা' হুকুম ক'রবে আমি তাই করবো। আমি সেলাই চলনসই রকম জানি, কিন্তু ভাল কাজ ক'রতে হ'লে তাতেও তোমায় শিখিয়ে নিতে হ'বে।"

"সে হ'বে এখন।" তার পর খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া চাঁপা, একটু আমতা আমতা করিয়া বলিল, "একটা কথা বলবো, কিছু মনে ক'রবে না।"

"সে কি কথা ভাই? তোমার কথায় মনে করবো কি?"

"তুমি তো স্বাধীন হ'তে চাও, কিন্তু তোমার স্বামী যদি কোনও মতে তোমার সন্ধান পান তবে তোমাকে আদালতের পেয়াদা দিয়ে ধরিয়ে নিয়ে যাবেন। তখন তুমি কি উপায় ক'রবে?"

শুভা একটু শঙ্কিত হইল, পরে বলিল, "তা সম্ভব নয়। যে স্ত্রী

বেরিয়ে গেছে তার জন্য মাথা ঘামানর চেয়ে আর একটা বিয়ে করাই তার পক্ষে বেশী স্বাভাবিক হ'বে। তবে যদি শাস্তি দেবার জন্য ফিরিয়ে নিতে চায়। কি ক'রে বারণ করা যায় বল ?"

"আমি ঠিক জানি না, তবে সবাই যা করে শুনেছি। পুলিস কোর্টে গিয়ে না কি কি একটা দরখাস্ত ক'রলে আর সোয়ামী কিছু ক'রতে পারে না। তুমি যদি বল তবে আমার এক ঠাকুরপো উকীল আছে তা'কে ডাকিয়ে এর ব্যবস্থা করি।"

"ঠাকুরপো ?"

"হাঁ সত্যি সত্যি ঠাকুরপো, আমার এক নম্বর গুণধরের কেমন একটা ভাই হয়। তার সঙ্গে আমার বেশ ভাব আছে।"

"আচ্ছা তা' ডাকাও।"

উকীল আসিয়া বলিলেন, "যে স্বামীর নামে একটা শান্তিরক্ষার দরখাস্ত দিতে হইবে, তাহাতে লেখা হইবে যে দরখাস্তকারিণী স্বইচ্ছায় বেশ্যাবৃত্তি করিবার উদ্দেশ্যে স্বামীর গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, ইত্যাদি।"

শুনিয়া শুভা চমকিয়া গেল, সহসা সে কোনও উত্তর দিল না। তাহার মনে হঠাৎ একটা সন্দেহ হইল। চাঁপা তাহাকে দিয়া এ দরখাস্ত দেওয়াইতেছে কেন ? সে কি শুভাকে দিয়া বেশ্যাবৃত্তি করাইয়া লাভ করিতে চায় ? না হইলে সে শুভাকে থিয়েটারে যাইতে বাধা দিতেছে কিসের জন্য ? যতই ভাবিতে লাগিল ততই তাহার মনে হইল যে চাঁপার উদ্দেশ্য ভাল নহে। এখন সে চাঁপার সমস্ত কথাবার্ত্তা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল ; যতই ভাবিল ততই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল, যে চাঁপা তাহাকে হস্তগত করিয়া একটা লাভবান ব্যবসায় করিতে চাহিতেছে। তাহার প্রাণ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল।

পর মুহূর্ত্তে সে ভাবিল বেশ্যাবৃত্তিতে এত ভয় কি ? অন্ত

উপায়ে যদি জীবিকা অর্জ্জন না হয় তবে শরীর বেচিয়া খাইলে এমন কি অপরাধ? তবু তো স্বাধীন হইবে, ধনবতী হইতে পারিবে এবং শেষে হয় তো সহজেই জীবনের সার্থকতার কোনও পথ বাহির করিয়া লইতে পারিবে। এ কথা তো সে হিসাব করিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়াছে, তবে আর ইহাতে ভয় কিসের? ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্যকে শুভা অনেক দিন হইল কুসংস্কার বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছিল।

শুভা স্থির করিল, করিতে হয় বেশ্যাবৃত্তি করিবে। সেটা যে দারুণ অপমান তাহা সত্য, কিন্তু যদি অন্য উপায় না থাকে তবে সে অপমানও সহিতে হইবে। কিন্তু এই যখন স্বাধীনতা লাভের একমাত্র উপায় তখন এ দরখাস্ত সে করিবে।

পরের দিন সে পুলিস কোর্টে গিয়া শান্তিরক্ষার এক মামলী দরখাস্ত দিয়া আসিল।

[৪]

চাঁপা শুভাকে শিখাইতে লাগিল। শুভা খুব যত্নের সহিত শিখিল। খুব শীঘ্রই সে গান ও বক্তৃতায় বেশ দক্ষতা লাভ করিল। তাহার খুব আশা হইল যে শীঘ্রই সে চাঁপার অধীনা হইতে উদ্ধার পাইবে। একবার একটা থিয়েটারে পাকা রকম চাকরী গুছাইয়া লইতে পারিলে সে নূতন করিয়া স্বাধীন জীবন আরম্ভ করিতে পারিবে।

সেই দরখাস্তের পর হইতে শুভার আর চাঁপার সঙ্গে তেমন হৃদ্যতা ছিল না। সেই হইতে সে চাঁপাকে বেশ একটু সন্দেহের চক্ষেই দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বাহ্যিক কথাবার্ত্তায় বা আচরণে সে কথা প্রকাশ না হইলেও চাঁপা তার মনের ভাবের বেশ একটু আঁচ পাইয়াছিল। শুভার মনের ভাব কতকটা বুঝিয়া সে একদিন বলিল, "তুমি তো বলতে

কইতে গাইতে বেশ শিখেছ, এখন আর একটা জিনিষ শিখতে হ'বে। শুচিবাইটা একবারে না ছাড়তে পারলে আর ষোল আনা বেহায়া না হ'তে পারলে থিয়েটারে চলবে না।"

"কি রকম ?"

"বেহায়াপনা চাই কেন ? এই ধর না সে দিন তুমি যে প্লে টুকু ক'রলে সে টুকু ম্যানেজার যাই বলুক না কেন, একেবারে নিখুঁত হ'য়েছিল। কিন্তু তুমি বিশ্বজোড়া লজ্জায় চাপা পড়ে গিয়েছিলে। তোমার আওয়াজটা খুলতে দেরী হ'য়েছিল, তোমার মুখ তুলতে দেরী লেগেছিল। আর শেষ পর্য্যন্ত তুমি বেশ রীতিমত কাঁপছিলে। আর আমি বেশ অক্লেশে সমস্ত লোকগুলোর মুখের দিকে চেয়ে হেসে খেলে নেচে গেয়ে ভাঁড়ামি ক'রে এলুম। কিসের জোরে ? কেবল লজ্জার ছিঁটে ফোঁটাও আমার শরীরে নেই ব'লে। ঘরে বসে এক্ট করা আর ষ্টেজে দাঁড়িয়ে একঘর লোকের সামনে এক্ট করায় আকাশ পাতাল তফাৎ। তোমার গৃহস্থালীর লজ্জাটাকে একেবারে চুরমার ক'রে না ভাঙ্গতে পারলে তোমার এক্ট করা হ'বে না।"

"সত্যি ! সেদিন আমার যেন লজ্জায় সেইখানে মরে যেতে ইচ্ছে করছিল।"

"আর তা ছাড়া আরও বেহায়াপনার দরকার সিনের আড়ালে। সেখানে কতকগুলা ইয়ার মাগী মিনসের সঙ্গে হরদম খুব ঘনিষ্টভাবে মাখামাখি ক'রতে হ'বে। তাতে যদি তুমি পেছ পা' হও তবে কাজ চলবে না, একদণ্ডও তুমি সেখানে তিষ্টুতে পারবে না। তুমি গেরস্ত ঘরের বউ, ঘর ছেড়ে বেরিয়েছ বটে, কিন্তু শুচিবাইটা তোমার যায় নি। পুরুষ মানুষের ছায়া দেখলে চমকে ওঠ, একটা বেয়াড়া রকমের ইয়ার্কি শুনলে শরীর অসাড় হ'য়ে আসে। এ হ'লে তো থিয়েটারে চলবে না

বেহায়া হ'য়ে সব রকম লোকের সঙ্গে মাখামাখি করবে, সব রকম কথা সব রকম আচার-ব্যাভার গা সওয়া ক'রে নেবে তবেই থিয়েটারে চালাতে পারবে! আর জান? থিয়েটারেই হ'ক বাহিরেই হ'ক বেহায়াপনারই সর্ব্বত্র জিত। অবিশ্যি যারা ঘরের বউ হ'য়ে থাকেন, আর সোয়ামীকে দরোয়ান ক'রে সঙ্গে নিয়ে ছাড়া রাস্তায় বেরোন না, ফল কথা, যাঁরা টবের ভিতর কাচের ঘরে তা' খেয়ে বেড়ে উঠেন, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু আমরা যারা স্বাধীন, অর্থাৎ কি না যাদের কেউ আপনার বলবার নেই, সংসারের লোকের চক্ষে আমরা যেন একটা মণ্ডা মেঠাই, তুলে নিয়ে মুখে ফেলে দিলেই হ'ল। রাস্তায় বেরুলেই আমাদের চারদিকে শত্রু। আমাদের যদি লোকের চাহনীতে গায় ফোস্কা পড়ে, কিংবা গায় গা লাগলে মূর্চ্ছা যেতে হয় তবে তো চলে না। যদি পথে বেরিয়ে সংসারের লোকের ভিড় ঠেলে চলতে হয়, তবে জিতবে সেই, যা'র লাজ-লজ্জা নেই। এই ধর আমি আছি আর তুমি আছ। তুমি পথে বেরোও, তোমার পেছনে ছশো' ফিঙ্গে লাগবে, আর হয় তো দু-দণ্ডের মধ্যে তোমাকে জ্বালাতন, অপমান, আর যা' নয় তা' করবে। আর আমি যদি একলা শ্যামবাজার থেকে কালীঘাট ভিড় ঠেলে চলে যাই, আসুক দিকিনি সে মর্দ্দের বাচ্চা যে আমার কাছে এগুবে। তারা আসবেই না। যদি কেউ এগোয় তবে সে মুখনাড়ার চোটে পালাতে পথ পাবে না। কেন না, আমার লজ্জা নেই, আমার তো কিছুতে ভয় নেই। আমার শুচিবাই নেই।"

শুভার কথাগুলি ভাল লাগিল না, কিন্তু কথা যে কতকটা যথার্থ সে কথা সে অস্বীকার করিতে পারিল না! সে একটু হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা মানলাম, কিন্তু বেহায়াপনা শেখাবে কি করে বল।"

"তাই বলছিলাম, তোমাকে এখন কিছুদিন হরেক রকম বেটাছেলের সঙ্গে মেশামেশা করতে হবে, একা একা পথে আনাগোনা ক'রতে হ'বে

গঙ্গা নাইতে যেতে হ'বে, বাজার ক'রতে হ'বে, এই সব ক'রলে তবে শরীর মনের সুড়সুড়ি ভেঙ্গে যাবে।"

শুভা মাথা নীচু করিয়া কিছুক্ষণ ভাবিল, তাহার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ সে কথা বলিল না। তাহার বুক ঠেলিয়া কান্না উঠিতেছিল। এই জন্য কি সে ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছে? চাঁপার কথার স্পষ্ট অর্থ সে ইহাই বুঝিল যে এখন কিছুদিন সোজাসুজী বেশ্যাবৃত্তি করিয়া তাহাকে 'শরীর মনের সুড়সুড়ি' ভাঙ্গিতে হইবে। তার মানে এই যে চাঁপা তাহাকে হাতে পাইয়া তাহার রূপলাবণ্যের ব্যবহার দ্বারা কিছু পয়সা রোজগার করিবে। হায়! এই কি তাহার উচ্চ আদর্শের পরিণাম।

এতদিন সে মনে মনে বার বার বলিয়াছে, বেশ্যাবৃত্তি করিতে হয় করিবে—কিন্তু আজ বুঝিল সেটা কেবল কথার কথা! তার পক্ষে মান বিলাইয়া দিয়া শরীরপণ্যে জীবন ধারণ মৃত্যুর বাড়া অপমান, তাহা সে আজ বুঝিতে পারিল, তাই তাহার কান্না পাইল। স্বাধীনতার জন্যও, জীবনে শেষে সার্থকতা লাভ করিবার জন্যও এ মূল্য দিতে তাহার মন স্বীকৃত হইল না; সে কোনও কথা না বলিয়া উঠিয়া গেল, নিজের ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

চাঁপা ইহাতে একটু অপমানিত বোধ করিল। সে একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। পরক্ষণেই সে হাসিল, সেদিন আর কোনও কথা বা শিক্ষাদান হইল না।

পরের দিন বৈকাল বেলায় চাঁপা শুভার ঘরে গিয়া দেখিল শুভা মুখ ভার করিয়া এলো থেলো বেশে তাহার বিছানার উপর বসিয়া ভাবিতেছে। চাঁপা বলিল, "ওগো সতীরাণী, তোমার কাজ নেই লজ্জা ছেড়ে। তোমারি নাকি থিয়েটারের সখ তাই তোমাকে আমি ও'দের

ক'রতে চাচ্ছিলুন। আমি তো ব'লেইছি ও তোমার কর্ম্ম নয়। তার চেয়ে ঘরে থাক খাও দাও ছু'টো সেলাই আসটা কর বেশ দিন কেটে যাবে। এখন নেও, রাখো সব, এসো তোমার চুল বেঁধে দি।"

চাঁপা অনেকক্ষণ ধরিয়া টিপিয়া টিপিয়া নানা রকম বাহার করিয়া একটা খোঁপা বাধিয়া দিল। তার পর তাহাকে তুলিয়া লইয়া গা ধুইতে গেল। তার পর তাহাকে বেশ সুন্দর কাপড় চোপড় গয়নাপত্র দিয়া সাজাইল। শুভা এসবের কোনও হেতু খুঁজিয়া পাইল না। চাঁপা সুধু বলিল, "এত রূপ, এতো আর পুরুষের ভোগে লাগবে না, আমি তাই একবার সাজিয়ে গুজিয়ে দেখে চোখ সার্থক করি, তোমার রূপকেও সার্থক করি!"

শুভার হৃদয় কাঁপিতেছিল, সে একথার জবাব দিতে পারিল না।

দু'জনার বেশভূষা শেষ হইতে না হইতে দাসী আসিয়া খবর দিল, "এলবাট ছিয়েচারের মেনেজার তুমায় ডাকতেচেন গো।"

চাঁপা ছুটিয়া বসিবার ঘরে গেল, মুহূর্ত্ত পরে সে ঘর হইতে হাসি তামাসার কলধ্বনি শুভার কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিল। সে হাসি মস্করার শব্দ শুনিয়া শুভার মনে একটা দারুণ ঘৃণা ও অশুচিতার ভাব আসিল।

"এলবাট ছিয়েচারের মেনেজার" সুরেশবাবু পাতলা ছিপ ছিপে লোকটি। মাথায় চুলের বেশ বাহার আছে, মুখেও ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি প্রভৃতি নরসুন্দরকৃত সৌষ্ঠবের অভাব নাই, কিন্তু চেহারাখানা তাঁর মোটেই সুন্দর নয়। তাঁর বয়স পঞ্চাশের এধারে হইবে না, কিন্তু কলপ প্রভৃতি তোড়জোড়ের জোরে ঠিক বয়স অনুমান করা শক্ত। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় ত্রিশের ভিতর হইবে, দ্বিতীয় দৃষ্টিতে সন্দেহের আরম্ভ হয়, কিন্তু যতই চাহিয়া থাক না কেন ঠিক বয়স বাহির করা অসম্ভব।

সুরেশবাবু রসিক লোক। কলিকাতায় এমন নামজাদা লোক যা

সমাজ নাই যেখানে তাহার গতিবিধি না আছে, আর সব জায়গায়ই তিনি পণ্ডিত, রসিক ও রসজ্ঞ, বিশেষতঃ হাসির একটা অবিরাম ফোয়ারা বলিয়া পরিচিত।

চাঁপা ঘরে ঢুকিতেই সুরেশবাবু বলিলেন, "এস গো, তোমার সঙ্গে এঁদের আলাপ করিয়ে দি, এঁরা চাঁপার গন্ধে অন্ধ হ'য়ে অনেক দূর থেকে এসেছেন।"

চাঁপা তাহার দুই বন্ধুর নাম ও পরিচয় শুনিয়া নমস্কার করিয়া বলিল, "চাঁপার গন্ধটা দূর থেকেই লাগে ভাল।"

সুরেশ। "তার একমাত্র কারণ তার ঝাঁঝটা বড় কড়া!"

সকলে হাসিয়া উঠিল। চাঁপা বলিল, "নতুন লোকের সঙ্গে বুঝি এমনি করে পরিচয় করা'তে হয়। আপনি তো ভারি বেরসিক সুরেশ-বাবু!"

সুরেশ। "এ অপবাদ তুমি ছাড়া আর কে দেবে? আমি শাস্ত্র মেনে অরসিকেষু রহস্য নিবেদনং করিনে কি না"—এইরূপ রহস্য চলিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে বন্ধুরা যোগ দিলেন কিন্তু কথা কাটাকাটি চলিতে লাগিল বিশেষ ভাবে সুরেশবাবু ও চাঁপার। শেষে কাজের কথা আসিল। সুরেশবাবু বলিলেন, "আচ্ছা আমায় যে ডেকে পাঠিয়েছ, তুমি আমাদের থিয়েটারে আসছো নিশ্চয়। কিন্তু কবে?"

"যেদিন নিয়ে যাবেন, আর যেদিন আমার কাজ না থাকবে।"

"মাইরি, ইয়ার্কি রাখ; আসতে তোমায় হবেই, আসছো কবে তাই শুনি।"

"আমি কি আসতে নারাজ। আপনি আমায় আদর করে নিয়ে থিয়েটার দেখাবেন আর আমি দেখবো না?"

"দেখবেই বটে, তবে তোমার মত মস্ত বড় লোককে তো আর দেখান

সেখান থেকে দেখান যায় না, তাই তোমাকে ষ্টেজের উপরে নিয়ে দেখান হবে, আর তোমার মুখ তো কেউ বন্ধ ক'রতে পারবে না, কাজেই তুমি সেখানে দাঁড়িয়ে বা বসে' যা খুসী কিছু ব'লবে। এই আর কি ? না, ইয়ার্কি নয়, আমি তোমাকে আস্‌চে শনিবারে নিয়ে যাচ্ছি। একটা নতুন—একেবারে নতুন ধরণের—প্লের রিহার্সাল আরম্ভ হবে—তুমি heroine."

"আমি heroine ছাড়া কবে। কবে দেখেছেন আমায় কাপুরুষ। এই দেখুন না আমি আপনার মুখের উপরই স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, আমি যাব না। শনিবারেও না, রবিবারেও না, কোনও দিনই না। কমলা থিয়েটার থাকতে আমি আর কোথাও যাচ্ছি না।"

"আচ্ছা চাঁপা, আমিই তোমায় মানুষ ক'রে দিয়েছি। আমার থিয়েটারে প্লে ক'রেই তো তুমি নাম কিনেছ; তবেই না অতুল এসে তোমায় লুফে নিয়েছে!"

"মানুষ কি কেউ কাউকে ক'রতে পারে সুরেশবাবু? তা যদি পারতেন তবে বাঙ্গালা দেশে এত মেয়েমানুষ থাকতে আপনি আজ আমার কাছে ছুটে আসতেন না, যে কোনও একটাকে মানুষ ক'রে নিতেন।"

"কি বলবো চাঁপা, তোমার কথা শুনে ইচ্ছে হয় রাগ ক'রে তাই করি; কর্ত্তামও, যদি একটা মেয়ের সন্ধান পেতাম। সে যে কোত্থেকে এসে কোথায় মিলিয়ে গেল তা' কেউ জানতেই পারলে না। তাকে যদি পেতাম তবে জাঁক ক'রে বলতে পারি, তোমার দর্প চূর্ণ ক'রতে পারতাম। যা'ক তোমাকে 'কমলা' ছাড়তে হ'বে না, সুধু এই একটি প্লেতে এক মাস act করবে, সপ্তাহে দু'দিন—পাঁচশো টাকা এক্ষুণি নগদ গুণে দেব। তুমি ছাড়া সে পার্ট হবে না চাঁপা।"

"শুনে সুখী হ'লাম কিন্তু এ একমাসও আমি অতুল বাবুকে ছাড়তে পারবো না—"

"আচ্ছা, সেখানে তো ওই হাঁড়িমুখী পাঁচী আর পেঁচামুখী চারু নেয় বড় পার্ট আর তুমি তো আছ তার তালিজোড়া দিতে—সেখানে এতই কি মধু পেয়েছ বাপু ?"

"মধু এই যে সেখানে আমি আপন খুসীতে আছি ; বাস্। সে থাকগে, ওই যে আপনি কোন সুন্দরীর কথা ব'লেছিলেন যাকে পেলে আর আমার দিকে ফিরে চাইতেন না, সে ভাগ্যবতীটি কে সুরেশ বাবু ?"

"কে তা কি ছাই জানি ? তুমি জানতে পার। ওই যে একদিন পৃথ্বীরাজ প্লে হ'ল তোমাদের ওখানে, তা'তে তুমি প্রথমে হ'লে সংযুক্তা তার পর হ'লে নর্ত্তকী, তোমার জায়গায় আর একটা মেয়ে কেবল এক সীনে সংযুক্তা সেজে গেল, শেষে চারু এল। সেই মেয়েটার কথা বলছি। সে actress হ'য়ে জন্মেছে। তাকে যদি পেতাম তবে আমি সারা ক'লকাতা মাতিয়ে দিতে পারতাম।"

"তাই নাকি ? সে এত ভাল ?"

"ভাল ! এক নম্বর—তার রূপেই ত অর্দ্ধেক মাৎ। তার পর তার মিঠে আওয়াজ ! তা ছাড়া সে যা' acting ক'রেছিল ওই সীনটায় তেমন ঠিক artistic acting চারুও পারে না তুমিও পার না। তোমরা সে সীনে এস যেন একটা সিংহিনী, সে ঠিক একটি লজ্জিতা বউ হ'য়ে এসেছিল। তোমরা গোড়াগুড়ি থেকেই গর্জ্জন সুরু কর, সে আস্তে আস্তে তার তেজস্বিনী রাণীর মূর্ত্তি ফুটিয়ে তুলেছিল, আস্তে আস্তে মৃদুস্বরে তিরস্কার আরম্ভ ক'রে ঠিক সেখানটায় climax সেই খানটায় গলাটা চড়িয়েছিল। সমস্ত সীনটা সে এমন নিখুঁত act ক'রেছিল যে তেমন acting আমি কখনও দেখিনি। অতুল বোকা, তাই তাকে সরিয়ে

দিলে, আর এমন সরালে যে তার সন্ধান পর্য্যন্ত জানে না। সেইদিন থেকে আমি তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কেউ তার খবর জানে না।"

চাঁপা হাসিয়া বলিল, "খবর জানবে কি গো, সে তো বাজারের মেয়ে নয়, সে যে ভদ্রঘরের বউ!"

সুরেশ বাবু চমকিয়া উঠিলেন, শেষে বলিলেন "দূর! যা'ক। তুমি চেন তাকে? কে সে?"

"জেনে লাভ কি বল, ভদ্রঘরের বউ এসে কমলা থিয়েটারে এক্ট করতে পারে, তোমাদের ও বেলেল্লা থিয়েটারে সে কেমন করে যাবে বল?"

"ওসব বাজে কথা, বউ-ফউ সব মিছে। যাহ'ক তুমি যদি নিতান্ত নাই যাও তবে সেই মেয়েটির খবর আমায় দাও। লক্ষ্মীটি, আমার এই কথাটা রাখ।"

"আমি যদি তা'কে এনে দি তবে আমায় কি দেবেন বলুন?"

"সে বন্দোবস্ত তুমি তার সঙ্গে করগে, আমি তাকে পাঁচশো টাকাই একমাসে দেবো। তার ভেতর তুমি যা' রাখতে পার।"

পাঁচশো টাকায় সেই নামতে রাজী হ'লে বাঁচি, তা' আবার আমায় কিছু দেবে। যা' হ'ক একবার চেষ্টা দেখি। এখন আসুন, আপনাকে যা' দেখাব ব'লে ডেকেছি তাই দেখুনসে।"

বলিয়া চাঁপা উঠিয়া সুরেশ বাবু ও বন্ধুদ্বয়কে ভিতরে লইয়া একেবারে শুভার ঘরে গিয়া হাজির হইল। শুভা তখন বেতসপত্রের মত কাঁপিতেছিল, কিন্তু প্রচণ্ড চেষ্টায় সে আত্মদমন করিয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার করিল। তখন চাঁপা শুভার হাতখানা ধরিয়া হাসিয়া সুরেশ বাবুকে বলিল—

"ফিরেছ সন্ধানে যার রাত্রিদিন ধ'রে
নগরে কান্তারে শৈলে অলিতে গলিতে।

মূল্য দিয়ে চেয়েছিলে কিনিবারে যারে
লহ প্রভু ধরণীর শ্রেষ্ঠ সেই নারী।”

বলিয়া শুভার হাত সুরেশ বাবুর হাতে দিল! শুভার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

সুরেশ বাবু কৃতার্থতার হাসি হাসিয়া শুভার হাত ধরিয়া তাহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নামটি কি ভাই?”

শুভার তালু পর্য্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছিল, ভাল করিয়া কথা বাহির হইল না। যতক্ষণ এই সব ঘটিতেছিল ততক্ষণ সে খুব তীব্রভাবে বিদ্যুদ্বেগে চিন্তা করিতেছিল। এক ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তের মধ্যে সে আকাশ পাতাল ভাবিয়া ফেলিল। চাঁপা যে তাহার সর্ব্বনাশ করিবার আয়োজন করিয়াছে এবং তাহাই যে তাহার এতদিনকার আদর যত্নের একমাত্র উদ্দেশ্য তাহাতে তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। কি ভীষণ চক্র এই বেশ্যার মেয়েটার! এখন শুভা কি করিবে? সে এখন সম্পূর্ণ ইহাদের বশে আসিয়াছে, এখান হইতে রক্ষা পাইবার কোনও উপায় সে ভাবিয়া পাইল না। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে দেখিল যে এখনকার মত আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। এই বেশ্যাপল্লীর মধ্যে যদি সে এখন চেঁচামেচী করে তবে সাহায্য ত কিছুই পাইবে না, বরং তাহার চাঁপার কাছে নির্য্যাতন লাভ হইবে।

বিমূঢ় চিত্তে ভাবিতে ভাবিতে সে অন্যমনস্ক হইয়া উত্তর করিল, “শুভা।”

চাঁপা বলিল, “কিসের শুভা! ওর নাম সুরবালা। নেকী! নাম ভাঁড়াচ্ছেন! এসব আপনা আপনির মধ্যে নাম ভাঁড়াতে নেই। জানেন সুরেশ বাবু, ইনি স্বামীর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন, তাই নাম ব’লতে লজ্জা ক’রছেন।”

"তা হ'ক, আমি তোমার একটা পছন্দ মত নাম তৈরী করে নেব। সেজন্য চিন্তা নেই। এখন—"

চাঁপা বলিল, "হাঁ সুরো, তুই কি? ক'জন ভদ্রলোক এসেছেন দু'টো পান দে। ও লক্ষ্মী, বাবুদের তামাক দিয়ে যা। আচ্ছা সুরেশ বাবু, আপনারা এখন গল্প-সল্প করুন, আমি আসি।"

চাঁপার কথাবার্ত্তা শুনিয়া শুভা একেবারে হতজ্ঞান হইয়া গেল। এই এক নূতন জগতে সে আসিয়া পড়িয়াছে, যাহার হাল চাল তার কিছুই জানা নাই—সেটা সে আজ প্রথম অনুভব করিল, কিন্তু তা'র অবস্থার স্বরূপটা সে সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। তাহার মনের একটা আশ্চর্য্য জড়তা আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে সে পরিষ্কার করিয়া কোনও কথা ভাবিতেও পারিল না।

যন্ত্রচালিতের মত সে পান সাজিতে লাগিল। সুরেশ বাবু চাঁপাকে বলিলেন, "বাঃ, তুমি গেলে চ'লবে কেন? আমি আজই কথাবার্ত্তা পাকাপাকি ক'রে যেতে চাই।"

চাঁপা বলিল, "আর পাকাপাকি কি? কথা তো আমার সঙ্গে ঠিক হ'য়েই গেছে।"

"তাই তা হ'লে ঠিক। আমি শনিবার দিন দুপুরবেলায় একে নিয়ে যাব।"

"হাঁ" বলিয়া চাঁপা চলিয়া গেল।

শুভা কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইল।

পান খাইতে খাইতে সুরেশ বাবু বলিলেন "হাঁ ভাই সুরবালা, তুমি কি গাইতে জান?"

শুভা বলিল, "হাঁ।"

একটা গাও না শুনি।

শুভা এখন প্রতিমুহূর্ত্তে আশঙ্কা করিতেছিল যে এই পুরুষগুলি এখনি তাহাকে টানিয়া লইবে। সেই আশঙ্কায় সে অসহায় ছাগশিশুর মত ভিতরে ভিতরে কম্পিত হইতেছিল। তাই এ গান গাইবার প্রস্তাব শুনিয়া সে একটু আশ্বস্ত হইল। সে তাড়াতাড়ি হারমোনিয়মের কাছে গেল। সুরেশ বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "তুমি গাও আমি বাজাই।" বলিয়া তাঁর এক বন্ধুকে তবলা ধরিতে বলিলেন।

শুভা তখন কম্পিত স্নিগ্ধকণ্ঠে গাহিল,—

"কোলে তুলে নে মা কালী, কালের কোলে দিস্ না ফেলে।"

ধীর গম্ভীর সুরে, সমস্ত হৃদয় দিয়া শুভা কপালকুণ্ডলা নাটকের এই শেষ সঙ্গীত গাহিল। যখন সে থামিল তখন শ্রোতারা স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিছুক্ষণ বাদে সুরেশ বাবুর একটি বন্ধু বলিল, "বাহবা, বাহবা, বহুত আচ্ছা!"

কথাটা যেন গানের নেশাটা রূঢ়ভাবে ভাঙ্গিয়া দিল। সুরেশ বাবু বিরক্ত হইলেন, শুভাকে আর একটা গাহিতে বলিলেন, "একটা ওস্তাদী গান গাও দেখি।"

শুভা এবার একটা হিন্দুস্থানী গান গাহিল। তবলাওয়ালা তাহাতে দু'চার বার ভ্রূকুটি করিয়া উঠিল, শুভার বার বার তাল কাটিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু সুরেশ বাবু তন্ময় হইয়া বাজাইয়া গেলেন। গান যখন শেষ হইল তখন সুরেশ বাবু একরকম উল্লসিত হইয়া বলিলেন, "চমৎকার! চমৎকার! তোমার ভিতর প্রকৃত music আছে!"

তবলাওয়ালা বলিলেন, "তবে তালটা একটু দুরস্ত করার দরকার।"

"আরে রেখে দেও তোমার তাল! ওসব দুরস্ত হ'তে সময় লাগে না, যদি ভিতরে আসল music থাকে। তোমার যে ক্ষমতা আছে তাতে তুমি এককালে খুব উঁচুদরের গাইয়ে হ'তে পারবে। বাবা, সুরেশ

যায় কি কখনও ভুল করে? একদিন চোখে দেখে আমি যে লোক চিনবো তা' আর কেউ একমাস দেখলে পারবে না। আচ্ছা ভাই! এখন তবে আমরা আসি, শনিবার দুপুরবেলায় তোমাকে নিতে আসবো।"

বলিয়া সুরেশবাবু বন্ধুদের লইয়া বিদায় হইলেন। শুভা অবাক্ হইয়া গেল। গান গাহিয়া এবং গানের আলোচনা শুনিয়া তার মনের আড়ষ্টতা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল। সুরেশ বাবু সম্বন্ধে তাহার ভয়টাও অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল। সে এখন অনেকটা সহজভাবে নড়া-চড়া করিতে পারিতেছিল। যে ভীষণ আশঙ্কায় সে পীড়িত হইয়াছিল তাহা তখনো মনের ভিতরে উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছিল, কিন্তু এখন আর তা'র নিজেকে একান্ত অসহায় মনে হইতেছিল না। বরং চাঁপার কথা মনে হইতেছিল, যে এসব বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে হইলে বেহায়াপণাই প্রধান আশ্রয়।

কিন্তু যখন সুরেশ বাবু কেবল দু'টো গান শুনিয়া বিদায় হইয়া গেলেন, তখন সে অবাক হইয়া গেল। এ সমস্ত ব্যাপারের মানে কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিসের জন্য ইহারা আসিয়াছিল, চাঁপার সঙ্গে কি চুক্তি হইয়াছে, শনিবার কোথায় তাহার যাইতে হইবে, এই সব কথা লইয়া সে কত রকম কল্পনা করিতে লাগিল,—তার প্রত্যেকটি কল্পনাই ভয়াবহ।

সে অস্থির হইয়া চাঁপার ঘরে ছুটিয়া গেল, তাহার সঙ্গে বোঝাপড়া করিবার জন্য। ঠিক করিল, আজই ইহার একটা হেস্ত-নেস্ত করিতে হইবে।

চাঁপাকে সে বেশ একটু রূঢ় ভাবেই বলিল, "এ সবের মানে কি? আমায় বেচে তুমি কত বড়লোক হবে?"

চাঁপার চোখ একবার জ্বলিয়া উঠিল; পরক্ষণে সে হাসিয়া বলিল. "উপস্থিত একমাসে পাঁচশ' টাকা! তার পর কি পাব সে তোমার হাত।"

শুভার বড় কান্না পাইতেছিল; সে চিরদিনই জগতে নিরাশ্রয়! এতবড় বিশ্বসংসারটার মধ্যে তার আপনার বলিবার, তাহার বলিয়া দরদ করিবার একটা লোক সে পায় নাই। এতদিন পরে সে বড় আশা করিয়া চাঁপাকে আপনার করিয়া লইয়াছিল। সেই চাঁপা তার এতবড় শত্রু! এত নিষ্ঠুর! ভগবানের এ কি অবিচার? এই পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ লোক এমন আছে যাদের চারিদিকে আপনার লোক ঘিরিয়া রহিয়াছে, তাহাদের একটু ক্ষুদ্র তপ্ত শ্বাসে দশ দশ জন লোক চমকিয়া উঠিয়াছে, আর তার অদৃষ্টে একটি সহৃদয় বন্ধু বা আত্মীয় এ দীর্ঘ জীবনে জুটিল না!

শৈশব হইতে সে মরীচিকার মত আশা আশ্রয় করিয়া এতদিন চলিয়া আসিয়াছে। একটি দিনের তরে তার সে আশা সফল হইবার মত হইল না। সংসারের শত শত ঝঞ্ঝাবাতের সঙ্গে সে একলা তার দুর্ব্বল হৃদয় লইয়া যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে—কেহ কোন দিন তাহাকে একবার 'আহা' বলে নাই! যখন নিরাশার বেদনায় ব্যথিত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তখন কেহ তাহাকে স্নেহের কোলে টানিয়া লয় নাই। অনাথ শিশু যেমন কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষে আপনি শান্ত হয়, সেও তেমনি একা একাই তার বেদনা কেবল কাঁদিয়া নামাইয়াছে। তার এই দীর্ঘ দুঃখের জীবনের অবশেষে কি এই শেষ হইবে? তার সব আশা উৎসাহে ছাই পড়িয়া সে কি একটা তুচ্ছ, ঘৃণিত, শরীরসর্ব্বস্ব বেশ্যা হইয়া জীবন শেষ করিবে। সে কি অপরাধ করিয়াছে যাতে তার এই পরিণতি?

দীর্ঘ রাত্রি একখানি জীর্ণ কাষ্ঠ আশ্রয় করিয়া যে অপার সমুদ্রে

ভাসিয়া কাটাইয়াছে; দিবসের প্রথম আলোকরেখার সঙ্গে সঙ্গে যদি তার সেই কাঠখানি হাত হইতে খসিয়া যায় তখন সেই হতভাগ্যের হৃদয়ে যতখানি নিরাশা আসে আজ শুভার মনে ঠিক সেই পরিমাণ নিরাশা সেই বেদনা জন্মিল। তাহার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল, সে যেন আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু ওই হৃদয়শূন্য নারী তার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া নীরবে হাসিতেছে দেখিয়া তাহার দৃপ্ত হৃদয় সমস্ত দুর্ব্বলতা চাপিয়া ফেলিল, সে মাথা তুলিয়া সগর্ব্বে আপনার ঘরে ফিরিবার জন্য পা বাড়াইল।

চাঁপা তখন হাসিয়া বলিল, "আরে অত চট কেন ভাই, ব'স কথাটা তোমায় ভেঙ্গে বলি।"

শুভা একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে কাঠ হইয়া গিয়া বসিল।

চাঁপা বলিল, "ওই যে সুরেশ বাবু দেখলে উনি একটি আদত জহুরী। ওঁর মত ওস্তাদ লোক এ কলকাতার সহরে নেই। উনি তোমাকে সেদিন কমলা থিয়েটারে act করতে দেখে একেবারে পাগল হ'য়ে এতদিন তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আমার কাছে জিজ্ঞাসা ক'রতে আমি যখন বল্লাম তুমি আমার এখানে আছ তখনি তিনি তোমায় পাঁচশ' টাকায় বায়না করে ফেল্লেন। এখন যদি তোমার হাতযশ থাকে তবে তুমি আর বেশীদিন পরের গলগ্রহ হয়ে থাকবে না জেনো।"

শুভা উষ্ণভাবে বলিল, "আমি এই মুহূর্ত্তের পর কারো গলগ্রহ হয়ে থাকবো না। এই আমি চল্লুম।" বলিয়া সে উঠিল।

চাঁপা একটু হাসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বসাইল; বলিল, "এখন আর তুমি গলগ্রহ কই? বরং তুমি তোমার এতদিনকার দেনা সব শোধ করেও এক বছরের সব খরচ জুগিয়েছ। এখন আমি তোমায় সহজে ছাড়ছি না। আরে র'স, চট কেন? আমার কথা শোন, তোমার ভাল

বই মন্দ হবে না। তোমায় যেতে হবে তো সেই শনিবার। এখনো দু দিন আছে, এর ভিতর যদি তুমি নিজের ইচ্ছায় যেতে না চাও তবে আমি তোমায় পাঠাব না। এখন ব'স। আর ভাল কথা, এই বই খানা নেও। এর ভেতরে সুশীলার পার্টটা তৈয়ার করগে, দেখবো তোমার কেমন শিক্ষা হ'ল!" বলিয়া সে একখানা নূতন নাটক শুভাকে দিল।

শুভা জোরে সেই বইখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া আপনার ঘরে গিয়ে দুয়ার বন্ধ করিল।

[৫]

সমস্ত রাত্রি শুভা কাঁদিয়া কাটাইল। এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার উপায় সম্বন্ধে নানা উদ্দাম কল্পনা তাহার মনে উদয় হইল। একবার দ্বিপ্রহর রাত্রে সে দুয়ার খুলিয়া পথে বাহির হইবার চেষ্টায় নীচে সদর দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তখন সে রাস্তা লোকে গম্ গম্ করিতেছে, চার পাশের সব বাড়ীতে আলো জ্বলিতেছে, হারমোনিয়ম বাজিতেছে, গান চলিতেছে। সামনে পানওয়ালারা উজ্জ্বল আলোকিত দোকানের সামনে একপাল লোক হাসি তামাসায় পাড়া মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে বরং শুভার সাহস ছিল, কিন্তু দ্বিপদনক্রসঙ্কুল এই পারশূন্য কলিকাতার পথে পা দিতে তাহার সাহস হইল না, সে ঘরে ফিরিয়া গিয়া বালিসে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। শেষ রাত্রে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল তখন অনেকটা বেলা হইয়াছে। সামনের জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া সে সেই পানওয়ালার দোকানের দিকে চাহিল। পানওয়ালা তখন একা সেখানে ঝিমাইতেছে, রাস্তাও প্রায় শূন্য। মুহূর্ত্ত পরে একটি যুবক আসিয়া সেই দোকানের সামনে বাই

সিকেল হইতে নামিয়া পানওয়ালার কাছে দেশালাই লইয়া একটা সিগারেট ধরাইল। যুবককে দেখিয়া শুভার সমস্ত শরীর দিয়া একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ বহিয়া গেল ;—এ সেই !—যাহাকে আশ্রয় করিয়া সে স্বামীর ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতে প্রস্তুত হইয়াছিল এ সেই ধনীর সন্তান। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তার মনের ভিতর একটা সংকল্প গড়িয়া উঠিল। সে বেশ চীৎকার করিয়া ডাকিল "ওগো বাবু, একটু দাঁড়াও।"

বাবুটী শুভার দিকে চাহিয়া চিনিলেন, একটু হাসিয়া বলিলেন, "এ কি! তুমি এখানে?"

শুভা বলিল, "একটিবারও দয়া করে উপরে এস।"

যুবক নগেন এ নিমন্ত্রণ অস্বীকার করিল না।

নগেনের নাম পর্য্যন্ত শুভা জানিত না। এমন সম্পূর্ণ অপরিচিত পুরুষটীকে আজ শুভার পরমাত্মীয় বলিয়া মনে হইল। সে তাহাকে এই অকূল সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়া লইবে এই দৃঢ় বিশ্বাসে তাহার হৃদয় এই সৌম্যমূর্ত্তি যুবককের দিকে ছুটিয়া গেল। সে নীচে গিয়া নগেনকে আপনার ঘরে আনিল। তাহাকে দেখিয়া তাহার হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠিল।

শুভা তাহাকে বসাইয়া নিতান্ত আপনার জনের মত তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিল। দু'জনে কত কথা হইল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সেদিন রাত্রে যে দু'জনেই সামান্য ভুলে কি বিষম নাকাল হইয়াছিল তাহা শুনিয়া শুভা আজ হাসিয়া অস্থির হইল। শুভা তখন জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কর্ত্তাটির খবর কিছু জান?"

নগেন। "ওঃ সে এক ইতিহাস। পরের দিন সকাল বেলায় সে ভদ্রলোক তো ঘরের দোরের কাছে এসে তোমার নাম ধরে চীৎকার করে, গালাগাল দিয়ে দোরে লাথি মেরে, পাড়াশুদ্ধ মাতিয়ে তুলেছিলেন।

তখন তার বিশ্বাস ছিল তুমি ঘরেই আছ, তাকে শাস্তি দেবার জন্য ঘরে শিকল দিয়ে রেখেছ। তার পর যখন বাসাড়েরা তাকে দোর খুলে দিলে আর সে দেখতে পেলে তুমি বাড়ী নেই, তখন সে চেঁচামিচী করে পাড়াশুদ্ধ লোক ডেকে অস্থির ক'রে তুলেছিল। আমার মেজদাদা এটর্ণি, তাঁর কাছে এসেছিল পরামর্শ নিতে। দাদা তাকে থানায় পাঠিয়ে দিলেন। তার পর সেদিন সন্ধ্যা বেলায় দেখলাম সে মদ খেয়ে চুর হ'য়ে এসে তোমার নাম করে কখনো চীৎকার করে কাঁদছে, কখনো গালাগালি করছে।— তার পর, দিন পাঁচ সাত পরে কে জানে কোথায় চলে গেছে।"

শুভা শুনিয়া খুব হাসিল। সব কথায়ই তার আজ হাসি পাইতেছিল হাসিয়া সে বলিল, "তাই তো বেচারার খুব বেশীই কষ্ট হয়েছে বলতে হ'বে ; নইলে পয়সা খরচ করে মদ পর্য্যন্ত খেয়ে বসেছে! আর পরিশ্রম করে বাড়ী ছেড়ে পর্য্যন্ত গেছে।"

এই রকম হাসি তামসা গল্পগুজবে অনেকটা সময় দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। শেষে শুভা বলিল, "যা হ'ক তবু এতদিন পর তোমায় পেলাম। এখন আমার উপর কি হুকুম ?"

"হুকুম তুমি কর।"

"আমার হুকুম এই যে আজ রাত্রের ভিতর তুমি একটু নিরিবিলি জায়গায় আমার জন্য একটা বাড়ী ঠিক ক'রে এস। আমার ভারি বিপদ! এখানে আর এক মুহূর্ত্তও আমার থাকতে সাহস হচ্ছেনা। তুমি যদি কাল সকালের মধ্যে বাড়ী না ঠিক ক'ত্তে পার তবে আর আমায় দেখ্‌তে পাবে না।"

"কি রকম ? কি বিপদ ?"

"সে কথা পরে হবে। এখানে বসে সে কথা ব'লতে পারবো না তা তুমি বাসা ঠিক করে আমায় নিয়ে যাবে বল।"

"নিশ্চয়, পারি তো আজ সন্ধ্যাবেলায়ই তোমাকে নিয়ে যাব।"

"তবে তাই করো লক্ষ্মীটি!" বলিয়া শুভা আবেগের সহিত নগেনের দু'টি হাত চাপিয়া ধরিল।

নগেন অমনি তাহাকে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া চট করিয়া তাহাকে চুম্বন করিল। শুভা আগাগোড়া লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহার হৃদয়ে বিদ্রোহের কোনও চিহ্ন দেখা গেল না।

ঠিক সেই সময় চাঁপা একবার শুভার জানালার কাছে আসিয়া উঁকি মারিয়া গেল। সে দৃশ্য দেখিয়া সে একটু হাসিল, পর মুহূর্ত্তে সে ভ্রূকুটি করিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল।

নগেন তখনি চলিয়া গেল। শুভা তাহাকে বাড়ীর দুয়ার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া ফিরিবার সময় চাঁপাকে সামনে দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "চাঁপা, ভাই, আমি আর তোমার বোঝা হয়ে থাকবো না। আমি কাল যাচ্ছি।"

চাঁপা ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "কোন্ চুলোয়?"

শুভার বড় লজ্জা হইল! কথাটার কোনও সঙ্গত জবাব মনে আসিল না। কিন্তু সে মনে মনে খুব খুসী হইল। চাঁপা পোড়ারমুখী যে শিকার হাতছাড়া হইয়া যায় দেখিয়া মর্ম্মান্তিক চটিয়াছে তাহাতে তাহার বড় আনন্দ হইল। সে একান্ত নিঃসহায় ভাবিয়া চাঁপা তাহাকে লইয়া যা খুসী তাই করিতে চাহিতেছিল, আজ সে সগর্ব্বে চাঁপাকে বুঝাইতে পারিয়াছে যে তাহারও আপনার কেহ আছে, তাই সে আনন্দিত হইল। সে কিছু না বলিয়া হাসিয়া নিজের ঘরের দিকে চলিল।

চাঁপা বলিল, "যাচ্ছ, যাও কিন্তু বলে রাখছি এ পথে সুখ নেই।"

কথাটায় শুভার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। সে মনে মনে ভাবিল, "তা' তো বলবেই—তোমার নিজের মনের মতন হয় নি কি না?" পরক্ষণেই সে হাসিল। আজ সে এমন একটা মুক্তির আনন্দ

বোধ করিতেছিল যে কোনও কথাই তাহাকে ঠিক দাগা দিতে পারিতেছিল না।"

সেই দিন সন্ধ্যা বেলায় নগেন একখানা ট্যাক্সি লইয়া আসিল। শুভা হাসিমুখে চাঁপার কাছে বিদায় লইতে গেল, চাঁপা মুখ ফিরাইয়া সরিয়া গেল। শুভা চলিয়া গেলে সে পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল।

* * * * *

পরের দিন সুরেশ বাবু যখন শুভাকে নিতে আসিলেন তখন চাঁপা কাঁদিয়া ফেলিল। সুরেশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "সুরবালা কই ?"

চাঁপা কেবলি কাঁদিতে লাগিল, কোনও উত্তর দিল না। যখন সুরেশ বাবু বুঝিলেন শুভা নাই, তখন তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। চাঁপা তখন চোখ মুছিয়া ভারি গলায় বলিল, "আমিই যাচ্ছি চলুন, আমিই সুশীলার পার্ট করবো।"

সুরেশ বাবু খুসী হইয়া চাঁপাকে লইয়া গেলেন।

[৬]

শুভা নগেনের সঙ্গে আসিয়া যেখানে নামিল সেটা একটা ইংরাজী ফ্যাসানের ছোট একতালা বাড়ী; সাহেব পাড়ার মধ্যে। নগেনের সঙ্গে কথায়-বার্ত্তায় সে ক্রমে জানিতে পারিল যে নগেন শেয়ারের দালালী করে সম্প্রতি একটা খুব বড় রকম দাঁও মারিয়া হাজার পঞ্চাশেক টাকা পাইয়াছিল, তার কিছু দিয়া সে এই বাড়ীখানা কিনিয়াছে। এ বাড়ীর বিবরণ বাড়ীতে কেহ জানে না। নগেন আরও বলিল যে, সে এ বাড়ীখানা ঠিক শুভার জন্যই কিনিয়াছিল, শুভাও সে কথা অনায়াসে বিশ্বাস করিল, কিন্তু কথাটা সত্য নহে।

বাড়ীখানা আগাগোড়া ফিটফাট সাহেবী ভাবে সাজান, চায়ের পেয়ালা হইতে পিয়ানো পর্য্যন্ত কোনওখানে কোন জিনিষের অভাব নাই।

নগেন নামিয়াই কয়েকটা সুইচ টিপিয়া দিল, সমস্ত বাড়ী বিদ্যুতের আলোকে ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল। একটা খানসামা ও একটি আয়া আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। নগেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া শুভাকে সমস্ত বাড়ী দেখাইল! দরিদ্র শুভা ঐশ্বর্য্যের এ গৌরবে একেবারে আবিষ্ট হইয়া পড়িল। ড্রেসিং রুমে লইয়া নগেন একটা ড্রয়ার চেষ্ট খুলিয়া শুভার চোখের সামনে যে সম্পদ খুলিয়া দিল যে কোনও মেয়েরই তাহাতে তাক্ না লাগিয়া যায় না, শুভা তো গরীবের মেয়ে, গরীবের ঘরণী। নানা রকম দামী দামী রং বেরংএর শাড়ী জামা এবং দুই স্যুট হাল্কা রকমের হাল ফ্যাসানের গহনা। শুভা তার আয়ত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তন্ময় হইয়া চাহিয়া রহিল। নগেন তাহার চিবুক ধরিয়া হাসিয়া বলিল, "All of this is mine and thine,"

শুভা লজ্জায় ও আনন্দে রঙ্গিন হইয়া উঠিল, এবং যখন নগেন তাহাকে বুকের ভিতর টানিয়া তাহার রঙ্গিন গণ্ডে একটা গভীর চুম্বন দিল, তখন সে শরীর সম্পূর্ণ এলাইয়া দিয়া তাহার বুকের সঙ্গে মিশিয়া গেল।

নগেন ধরিয়া বসিল সে নিজ হাতে শুভাকে সাজাইবে। শুভা সলজ্জ কৃতার্থতায় তাহার হাতে আত্মসমর্পণ করিল। নগেন নিপুণ শিল্পীর মত তাহাকে পোষাক ও অলঙ্কারে সাজাইল। তারপর চিত্রকর যেমন আপনার কলার সার্থকতা লাভ করিয়া তফাতে দাঁড়াইয়া নিজের হাতের কাজ দেখিতে থাকে, তেমনি প্রশংসা ও কৃতার্থতার দৃষ্টিতে সে তাহাকে দেখিতে লাগিল। শুভার চোখে মুখে একটা রঙ্গিন নেশার ঘোর ফুটিয়া উঠিল, সে একটু সলজ্জ হাসি নগেনকে বকৃশিস্ দিয়া আরসীর দিকে চাহিল, চাহিয়া নিজে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল।

তার পর নীচে গিয়া দু'জনে খাইতে বসিল। খানসামা টেবিলের উপর খানা দিয়া বিদায় হইয়া গেল ; দুইজনে নিরিবিলি বসিয়া খাইতে লাগিল। শুভা হিন্দুর মেয়ে, এই ম্লেচ্ছ খানা আর ম্লেচ্ছ কায়দা তার মেটেই ভাল লাগিতেছিল না। কিন্তু নগেন যখন তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া হাত ধরিয়া কাঁটা চামচের ব্যবহার শিখাইতে এবং তাহার মুখের ভিতর খাবার উঠাইয়া দিতে লাগিল, তখন আর তাহার কোনও কথা বলিবার উপায় রহিল না। বরং আহারের এই দীর্ঘ সময়টা যেন এক স্বপ্নের ভিতর দিয়া কাটিয়া গেল।

আহারের পর দু'জনে ড্রইং রুমে গিয়া বসিল। রাত্রি এগারটার সময় নগেন শুভার কাছে বিদায় লইল। শুভা নগেনকে ফটক পর্য্যন্ত পৌছাইয়া যখন তাহার ড্রেসিং রুমে ফিরিল তখন তাহার সমস্ত শরীর দিয়া যেন রক্ত ছুটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে। আনন্দের, সম্ভোগের একটা তীব্র নেশায় সে একেবারে মশগুল হইয়া গিয়াছে। সে যেন স্বপ্নে বিচরণ করিতেছে। তখন তার চক্ষে সে কেবলি নগেনকে দেখিতেছে। তার রূপ, তার চাহনী, তার কথাবার্ত্তা, তার আদরযত্ন, সব তাহাকে যেন একেবারে একটা মদিরাময় স্নেহবেষ্টনে ঘিরিয়া সপ্তম স্বর্গে অধিষ্ঠিত করিয়াছে। চিরদুঃখিনী শুভা এত সুখ, এত সৌভাগ্যে একেবারে অভিভূত হইয়া গেল।

নগেন যে এত শীঘ্র চলিয়া গেল তাহাতে যেন তার কান্না পাইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল সে কেন নিঃশেষে নগেনের সবটুকু সর্ব্বদার জন্য পাইল না। আরও মনে হইল যে যে সময় টুকু নগেন ছিল ততক্ষণ শুভা তাহার সময়ের সদ্ব্যবহার করে নাই। তাহাকে বুকের ভিতর যেমনটী করিয়া নিবিড় ভাবে পাইবার জন্য তাহার প্রাণ ছটফট করিতেছিল, তেমনটী করিয়া সে তাহাকে পায় নাই—লজ্জায় বাধিয়াছিল।

তাই আজকার এই সন্ধ্যাটা যেন অনেকটা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে বলিয়া তার মনে হইতে লাগিল।

আরসীর সামনে দাঁড়াইয়া কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে সে এই সব কথা ভাবিতে লাগিল, আর আগামী কল্যের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। ক্রমে যতই তাহার অনাবৃত দেহের সৌষ্ঠব ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইতে লাগিল ততই তার মন সম্ভোগ লিপ্সায় বেশী করিয়া মশ্‌গুল হইতে লাগিল। এই নেশার ঘোরের ভিতর সে গিয়া তার কোমল শয্যায় শুইয়া সুখের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল।

এমনই সুখের স্বপ্নের ভিতর দিয়া তিনটী দিন কাটিয়া গেল।

চতুর্থ দিন খুব প্রত্যূষে একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখিয়া শুভার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ঘুম ভাঙ্গিয়া তাহার মনে হইল যেন সে একটা অপরিচিত স্থানে আসিয়াছে, প্রথমে সে একটু চমকিত হইল। তার পর যখন তার ঘুমটা স্পষ্টরূপে ভাঙ্গিল তখন সব কথা স্মরণ হইল। নগেনের স্মৃতিমাত্রে তার শরীর মন পুলকিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার আবেষ্টনের নূতনত্বের এই ধাক্কাটা এই প্রথম তাহার মনের ভিতর চিন্তার ধারা বহাইয়া দিল! সমস্ত অতীত তার মনের সম্মুখে পুনরভিনীত হইল, সমস্ত জীবনের ঘটনা সে খুঁটি নাটী করিয়া আলোচনা করিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে কি জানি কেন একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস তাহার হৃদয় ভেদ করিয়া বাহির হইল। যখন চাঁপার কথা আর তার ঘৃণিত প্রস্তাবের কথা মনে হইল তখন ক্রোধে তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল, মুখের সবগুল শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই মনে করিল নগেনের সহসা আবির্ভাবের কথা, তাহার উদ্ধারের কথা, সৌভাগ্যের কথা—হৃদয় আনন্দের স্মৃতিতে পুলক চঞ্চল হইয়া উঠিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল, কি আশ্চর্য্য তাহার মন! চাঁপার প্রস্তাবে তাহার বড় অপমান বোধ

হইয়াছিল, অথচ নগেনের প্রণয়িনী হইয়া আজ সে আনন্দে পাগল হইয়া উঠিয়াছে।

শুভা স্বভাবতঃ চিন্তাশীলা। এই কথায় তাহার চিন্তার ধারা গভীরতর ভাবে প্রবাহিত হইল। ক্রমে তাহার নেশা কাটিয়া তাহার মনে হইল, সে করিল কি? কি ভাবিয়া সে স্বামীর গৃহ ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে, আর কি করিতেছে! কোথায় রহিল তাহার জীবনের সব আদর্শ আর কোথায় তাহার ঘৃণ্য জীবন! সে এখন একটা তুচ্ছ স্বৈরিণী বই অন্য কিছুই নয়, এ কথা ভাবিতে তাহার হৃদয় বেদনায় আকুল হইয়া উঠিল। আর এই ঘৃণিত জীবনে যে সে আনন্দ উপভোগ করিতেছে সে কথা মনে হইতে তাহার মন তাহাকে চাবুক মারিতে লাগিল। এই চিন্তার তীব্র জ্বালায় ছটফট করিতে করিতে সে বিছানা হইতে উঠিল। সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ভাবে সে মুখ হাত ধুইয়া কাপড় পরিতে ড্রেসিং রুমে গেল।

এখানে চারিদিকে সব জিনিস নগেনের স্মৃতিতে সুরভিত। এখানে আসিয়াই তাহার মনে হইল কোথায় কখন নগেন দাঁড়াইয়াছিল, কোথায় সে বসিয়াছিল, কখন কি বলিয়াছিল, কেমন করিয়া তাহাকে সাজাইয়াছিল। এই স্মৃতির নেশায় আবার সে অন্ধ, মুগ্ধ হইয়া উঠিল। সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ভাবে সে কাপড়-চোপড় পরিতে লাগিল। নগেন প্রথম দিন যেমন করিয়া তাহাকে সাজাইয়াছিল, মোহমুগ্ধ চিত্তে সে ঠিক তেমনি করিয়া নিজেকে সাজাইল। তার পর সে ঘরে বসিয়া চা খাইতে লাগিল। কি খাইল তাহা সে এক মুহূর্তের জন্যও জানিল না। কাল রাত্রে এইখানে বসিয়া খাইতে খাইতে যে প্রেমলীলার অভিনয় হইয়াছিল তাহার চক্ষে কেবল সেই ছবি ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। সমস্ত শরীর দিয়া সে নগেনের সেই প্রিয়স্মৃতি অনুভব করিল।

অনেকক্ষণ পর তার জ্ঞান হইল যে পাশের ঐ প্রকাণ্ড বাড়ীটায় অর্গানের গভীর ধ্বনির সঙ্গে মিলাইয়া অনেকগুলি নারী কণ্ঠে একটা সুন্দর গান হইতেছে। সে গান শুভার সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং তার কথা সে একটুও শুনিতে বা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু সে সঙ্গীতে তাহার হৃদয় অত্যন্ত গভীর ভাবে আলোড়িত হইল। সে সঙ্গীত গভীর স্নিগ্ধ শান্ত, কিন্তু সেই গাম্ভীর্য্যের ভিতর দিয়া একটা প্রশান্ত বিশাল আনন্দ ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। এই গানের সুরে শুভার হৃদয় একটা সম্পূর্ণ নূতন ভাবে বিচলিত হইয়া গেল। আরও ভাল করিয়া গানটা শুনিবার জন্য শুভা উঠিয়া সেই দিনকার জানলার কাছে দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিল। তাহার চক্ষু শান্ত দৃষ্টিতে আকাশের উপর নিবদ্ধ হইল।

গান থামিয়া গেল। তার পর এমন একটা প্রগাঢ় নীরবতা সমস্ত পাড়াটাকে আচ্ছন্ন করিল যেন সমস্ত জগৎ শুভারই মত সেই গানের সুরের আয়ত শান্তিতে ভরপুর হইয়া গিয়াছে। শুভা অনেকক্ষণ আবিষ্ট ভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল—তখন তাহার মনের ভিতর সেই শব্দশূন্য সুরটা কেবলই গভীর ভাবে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। কিছুক্ষণ বাদে যখন তাহার জ্ঞান হইল, তখন সে দেখিল কতকগুলি ছোট বড় মেয়ে ও কতকগুলি রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনী সার বাঁধিয়া সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়াছে। আয়ার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে পাশের বাড়ী একটা কনভেণ্ট, এখানে কতকগুলি অনূঢ়া খৃষ্টান মেম শিক্ষা ও লোকহিত কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিয়া বাস করেন এবং অনেক-গুলি মেয়েকে রাখিয়া স্কুল করিয়া পড়ান। শুনিয়া শুভা গভীর ভাবে ভাবিতে লাগিল।

জানালা হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে ড্রইংরুমে বসিল। অন্যমনস্ক

ভাবে পিয়ানোটা খুলিয়া সে সেই ম্যাটিনের গানের সুরটা ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বিলাতী সঙ্গীত শুভা মোটে কখনও শিক্ষা করে নাই হারমণি শাস্ত্র তাহার জানা ছিল না, কাজেই সে সঙ্গীতের স্বরূপটা সে ফুটাইয়া তুলিতে পারিল না; কেবল তাহার একটু আভাস পাইল। কিন্তু পিয়ানোতে সে সুর অর্গানের সে শান্ত গাম্ভীর্য্যের ছায়ামাত্র প্রকাশ করিল না। বিরক্ত হইয়া শুভা পিয়ানো ছাড়িয়া দিল; কিন্তু তাহার মাথার ভিতর সেই সুর ঘুরিয়া ফিরিয়া তার মনে একটা সম্পূর্ণ নূতন ভাবের সৃষ্টি করিল। সে অনেকক্ষণ হাতে মাথা রাখিয়া গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিল। কি ভাবিল তাহা সে নিজেই বুঝিল না। মনটা একটা অকারণ বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

ক্রমে তাহার পুরাতন চিন্তার ধারা আবার প্রবাহিত হইল। জীবনটা কিসের জন্য? এই কথা সে ভাবিতে লাগিল। মনে হইল রামপ্রসাদের সেই সরল সুন্দর সঙ্গীত,

"মন তুমি কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জীবন রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলতো সোণা।"

তার জীবনটা এমনি বন্ধ্যা মরুভূমির মতই কি পড়িয়া থাকিবে, সোণা কি সে ফলাইতে পারিবে না। কি আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া সে জীবন আরম্ভ করিয়াছিল, আর আজ কোথায় সে আসিয়া পড়িয়াছে? এই অতল গহ্বর হইতে সে আপনাকে টানিয়া উঠাইয়া জীবনকে সার্থক করিতে পারিবে না কি?

কত অসম্ভব কল্পনা তাহার মাথায় আসিতে লাগিল। মনে হইল, সে তো আজ অনায়াসে তার এই নূতন আবেষ্টনের ভিতর হইতে বাহির

হইয়া জীবনকে সার্থকতার পথে পরিচালিত করিতে পারে। তখনি তাহার মনে হইল, সার্থকতা সে কোন পথে পাইবে? স্বামীগৃহত্যাগের পর হইতে তাহার জীবনের সবগুলি কথা স্মরণ হইল। সে খুব স্পষ্ট বুঝিল যে তার মত অসহায়, বিশেষতঃ রূপ যৌবন সম্পন্ন নারীর পক্ষে পথ পাওয়া মোটেই সহজ নহে। যে পথ সহজ তাহা ধরিয়া আজ সে যেখানে আসিয়া পড়িয়াছে কেবলমাত্র সেই খানেই আসা যায়।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা মনে হইল। এই সব ছাড়িয়া, নগেনকে ছাড়িয়া সে কেমন করিয়া যাইবে? তাহার জীবনের এ তিনটি দিন যে তার সমস্ত অতীতের চেয়ে তার কাছে বেশী দামী হইয়া পড়িয়াছে, তাহা সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল। এই তিনটি দিনই সে প্রথম জীবনের প্রকৃত আস্বাদ পাইয়াছে—সে ভালবাসিয়াছে। এখন আর তার জীবন মরুভূমি নয়, ওতপ্রোতভাবে প্রেমে সরস। এ জীবন ছাড়িবার কল্পনায় তাহার হৃদয়ে বেদনা বোধ করিল। নগেনের প্রিয়-দর্শন মূর্ত্তি তাহার চক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে ব্যথা দিতে লাগিল, আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীর পুলকিত করিয়া তুলিল।

তার জীবনের পরিচিত পুরাতন প্রশ্নগুলি সে নূতন করিয়া সমাধানের চেষ্টা করিল। জীবনের সার্থকতা হয় কিসে? এতদিন সে অনায়াসে বলিয়াছে যে আপনার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া জগতের কোনও প্রকাণ্ড হিতানুষ্ঠানেই জীবনের সার্থকতা। কিন্তু আজ তার মনে হইল কেবল ত্যাগেই কি সার্থকতা? ভোগে কি কিছুই নাই? এই যে আজ তাহার শরীরের শিরায় শিরায় আপনার জীবন সার্থক বোধ করিতেছে এটা কি সবই ভুয়া। আজ জীবনে সে প্রথম সত্য সত্য ভালবাসিয়াছে, ভালবাসা পাইয়াছে। তাতে তাহার মনে যে কৃতার্থতা আসিয়াছে সেটা কি কেবল একটা মোহ। তাই যদি হয় তবে মানুষের মন এতটা ভালবাসার

আকাঙ্ক্ষা দিয়া গড়া হইয়াছে কিসের জন্য? স্বভাবের পরিতৃপ্তিতে যদি সার্থকতা না থাকে তবে কি স্বভাবকে বঞ্চনায় তাহা হইবে? তাই যদি হয় তবে সমস্ত জগৎটা তো একটা প্রকাণ্ড বঞ্চনা।

অনেক দিন ধরিয়া নির্য্যাতনের তলে চিন্তা করিয়া শুভা মন হইতে ধর্ম্মাধর্ম্মের পাপপুণ্যের হিসাব একেবারে মুছিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার মতে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও পাপপুণ্য একটা অন্ধ লোকমতের অনুশাসনের ফল। তার ভিতর না আছে অর্থ, না আছে পরস্পর সঙ্গতি। তাই তার জীবনের সার্থকতার হিসাবের মধ্যে সে মোটেই পাপপুণ্যের অঙ্কপাত হইতে দিল না।

কিন্তু তার মনে হইল যে এই জগৎটা যে বাস্তবিক একটা প্রকাণ্ড বঞ্চনা নয়, সবই যে সত্য সত্যই একটা নিষ্ঠুর অন্ধ মায়া নয় তাহা কে বলিবে? ঠিক তাহারই মত লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি নরনারী রোজ জন্মিতেছে, ভোগ করিতেছে, মরিতেছে, তাদের জীবনে কেবল জৈব-ক্রিয়া ও শারীরিক প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি ছাড়া কিছুই হইতেছে না। ইহাই যদি জীবনের শেষ হয় তবে এ জগৎটা জন্মমৃত্যুর কি ভীষণ একটা নিরর্থক অন্তশূন্য পারম্পর্য্য!

অনেকক্ষণ ভাবিয়া তাহার মাথা গরম হইয়া উঠিল। ক্রমেই জটিল হইতে জটিলতর সমস্যায় পড়িয়া তাহার মন ভয়ানক বিব্রত হইয়া উঠিল। সে ছট্‌ফট্‌ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন দেখিতে পাইল যে পাশের কন্‌ভেণ্টের দোতলার জানালার কাছে দাঁড়াইয়া কতকগুলি মেয়ে পড়া তৈয়ার করিতেছে। দেখিয়া তাহার মনে হইল তাহার শৈশবের কথা। সেই আনন্দের দিন, যখন তাহার চিন্তা ভাবনা কিছুই ছিল না, স্কুলে সহপাঠিনীদের সঙ্গে পড়াশুনা খেলাধুলা করিয়া সে আনন্দে জীবন কাটাইয়াছে আর জীবনের সুখস্বপ্ন দেখিয়াছে। তাহার কৈশোরের সেই আশায় রঙ্গিন জীবন আজ কোথায়?

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে শেষে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। পাশের কনভেণ্টে প্রবেশ করিয়া একটী সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে দেখা করিল। স্কুলে থাকিতে নীচের ক্লাশেই শুভা বেশ ভাল করিয়া ইংরাজীতে কথা-বার্ত্তা বলিতে শিখিয়াছিল। বিবাহের পরও বরাবর সে ইংরাজী বই পড়িয়া সে ভাষার চর্চ্চা রাখিয়াছিল। সে মেমসাহেবকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার মত ছাত্রী আপনাদের স্কুলে লইতে পারেন কি ?"

সন্ন্যাসিনীর নাম সিষ্টার মেরী। তিনি বলিলেন, "তোমার কি বিবাহ হইয়াছে।"

শুভা একটু বিব্রতভাবে উত্তর করিল, "হাঁ।"

সিষ্টার বলিলেন, "তবে আমরা তোমাকে এখানে লইতে পারি না।"

শুভা বিষণ্ন হইল। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া সে বলিল, "আমার লেখাপড়া শিখিবার বড় ইচ্ছা, আপনারা আমার কোনও ব্যবস্থাই কি করিতে পারেন না ?"

সিষ্টার বলিলেন, "আমার তো মনে হয় না।" তার পর শুভার বিষণ্ন শান্তমুখের দিকে চাহিয়া, কি ভাবিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তুমি একবার মাদার সুপিরিয়রের সঙ্গে দেখা করিয়া দেখিতে পার।"

শুভার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি ইচ্ছা করিলেই আমাকে নিতে পারেন ?"

সিষ্টার মেরি বলিলেন, "আমি তা' বলিতে পারি না। তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করিলেই জানিতে পারিবে। আমার সঙ্গে এস আমি তোমাকে তাঁর কাছে লইয়া যাইব।"

শুভা শুভ্রবসনা দীর্ঘকায়া সন্ন্যাসিনীর অনুসরণ করিয়া একটা প্রকাণ্ড ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। ঘরের চারিদিকে আলমারীতে বই সাজান

রহিয়াছে। তাহার মধ্যস্থলে একখানা বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিল। তাহার কাছে বসিয়া একটি সৌম্যমূর্ত্তি বর্ষীয়সী খৃষ্টান সন্ন্যাসিনী ব্যস্তভাবে কাগজপত্র দেখিতেছেন। ইনিই এই কনভেণ্টের কর্ত্রী মাদার ক্রিশ্চিয়ানা তাহার পিছনে মাথার উপর মাতা মেরীর মূর্ত্তি একটা শেলফের উপর রক্ষিত আছে, আর দেয়ালের চারিদিকে যীশুখৃষ্ট ও খৃষ্টীয় মহাপুরুষদিগের ছবি ঝুলিতেছে।

সিষ্টার মেরী শুভার পরিচয় দিয়া চলিয়া গেলেন, মাদার ক্রিশ্চিয়ানা হাস্যমুখে শুভাকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার পার্শ্বে একখানি চেয়ারে বসাইলেন।

মাদার জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ মেয়ে, তুমি কি চাও ?"

শুভা বলিল, "আমি পড়িতে চাই ?"

"কেন ? তুমি কি উদ্দেশ্যে লেখাপড়া শিখিতে চাও।"

শুভা বলিল, "আমি জ্ঞানলাভ করিতে চাই।"

মাদার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শুভার দিকে চাহিলেন, সে দৃষ্টি যেন শুভার মর্ম্মভেদ করিয়া গেল। তিনি বলিলেন, "তুমি বিবাহিত ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তুমি কতদূর লেখাপড়া করিয়াছ ?"

শুভা বলিল। মেম উত্তর করিলেন, "সে হিসাবে তুমি বেশ ভাল ইংরাজি বলিতে পার তো ?"

"আমি—স্কুলে মিস সার্কিসের কাছে পড়িয়াছিলাম, তিনি আমাদের ইংরাজি শিখাইবার জন্য খুব যত্ন করিতেন।"

"ও, তুমি মিস সার্কিসের ছাত্রী! তিনি যে এখন কলিকাতায় আসিয়াছেন! তিনি নিশ্চয় তোমাকে দেখিলে সুখী হইবেন। তিনি এই দুই তিনখানা বাড়ী অন্তরে থাকেন।"

শুভার বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে উত্তর করিল, "তিনি হয় তো আমাকে চিনিতে পারিবেন না।"

মাদার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে তোমার স্বামীর সঙ্গে বাস কর?"

শুভা একটু থমকিয়া বলিল, "হাঁ।"

"তিনি কি করেন?"

শুভার হঠাৎ মনে হইল না। সে খানিকক্ষণ মুখ নীচু করিয়া থাকিয়া শেষে বলিল, "তিনি ব্রোকার।"

মাদার খুব তীব্রদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহার নাম কি?"

শুভা নগেনের উপাধি জানিত না, সে একটু ফাঁপরে পড়িল। একটু থমকিয়া গিয়া সে বেশ একটু বিব্রত হইয়া পড়িল, শেষে সে তাহার স্বামী নিবারণের নাম বলিয়া উদ্ধার হইল।

মাদার তাহার পর ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাহাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, নানা বিষয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া আলাপ করিলেন। এই মহিলাটির স্নিগ্ধভাবে শুভা মুগ্ধ হইল এবং সে বুঝিতে পারিল না কি মোহের বশে সে একঘণ্টার মধ্যে তার মনের সব কথা, তা'র আশার কথা, জগতের শেষ প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে তা'র সন্দেহের ও সিদ্ধান্তের কথা, তা'র জীবন সার্থক করিবার আকুল আকাঙ্ক্ষার কথা, সব এই মায়ের মত স্নেহশীলা রমণীকে জানাইয়া দিল। যখন আলাপ শেষ হইল তখন তিনি আপনার গলা হইতে খুলিয়া শুভার গলায় একখানা সুন্দর রূপার ক্রুশ পরাইয়া দিলেন এবং একখানা বাইবেল উপহার দিয়া বলিলেন, "তোমাকে আমি স্কুলে লইতে পারি না, কিন্তু আমি রোজ তোমার বাড়ীতে গিয়া এই মহাগ্রন্থ পড়াইয়া আসিব। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা

করি তিনি তোমাকে জ্ঞান দিন। তাহা হইলে এই গ্রন্থে তুমি তোমার সকল প্রশ্নের উত্তর পাইবে—শান্তি পাইবে।" বলিয়া তিনি বাইবেল খুলিয়া এক জায়গায় পড়িয়া বলিলেন, "দেখ ইহাতে ঈশ্বর স্বয়ং বলিয়াছেন 'হে শ্রান্ত ও ভারপীড়িত. তোমরা আমার নিকট এস, আমি তোমাদিগকে শান্তি দিব'।"

শুভা কম্পিত হস্তে বাইবেলখানা লইয়া সিষ্টারকে ভক্তিভাবে নমস্কার করিয়া বিদায় হইল। সিষ্টার মেরী তার পর ঘরে আসিলে মাদার বলিলেন, "মেরী কাল রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম যে প্রভু আমাকে একটি পাপীর ত্রাণকার্য্যে তাঁহার যন্ত্রস্বরূপে ব্যবহার করিতেছেন এবং সে পাপী তাঁহার দয়ায় মুক্তির পথে অগ্রসর হইতেছে। সত্যসত্যই প্রভু আমাকে দয়া করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

সিষ্টার মেরী বলিলেন, "আমেন। এই মেয়েটির"—

"এই সেই পাপী স্বৈরিণী, প্রভু ইহাকে আমার নিকট আনিয়াছেন, তাঁহার দয়ায় এ মুক্তি পাইবে।" বলিতে মাদার ক্রিশ্চিয়ানার চক্ষু জল ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

[৭]

মাদার ক্রিশ্চিয়ানার সঙ্গে আলাপ করিয়া শুভার মনটা অনেকটা হাল্কা হইয়া গেল। এই মহীয়সী ধর্ম্মনিষ্ঠা মহিলা তাহার মনের ভিতর হাতড়াইয়া যেন তার মনের সব ময়লা ধুইয়া পুঁছিয়া পরিষ্কার করিয়া দিলেন। তাঁর কাছে শুভা বড় আশার কথা শুনিয়া আসিল, উৎসাহে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। তাহার মন জোর করিয়া বলিল, তার আশা আছে, তার জীবন সার্থক হইবে। এক একটি লোক এমন আছে যাহাদের সাদামাঠা কথাতেও একটা বৈদ্যুতিক শক্তি থাকে যা'তে তাদের

আশে পাশে সকলকে উৎসাহে ভরিয়া দেয়। মাদার ক্রিশ্চিয়ানা সেই শ্রেণীর লোক। তিনি মধুর ভাষায়, দরদের সহিত, হাসিয়া হাসিয়া শুভার কাছে যে সব তত্ত্বকথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে শুভার মনে হইল যেন তার ভিতর একটা নূতন জীবন জাগিয়া উঠিয়াছে। কোনও বাধার কথা, কোনও নিরাশার হেতুর ছায়ামাত্র তখন তাহার মনে আসিল না।

মাদার ক্রিশ্চিয়ানা তাহাকে নূতন সুসমাচারের কতকগুলি অংশ পড়িতে বলিয়াছিলেন। শুভা ঘরে আসিয়া বসিয়াই আগ্রহের সহিত সেই অংশগুলি পড়িতে লাগিল। প্রথমেই সে পড়িল মডলিনের কাহিনী। সে সবটা বুঝিল না। কিন্তু আগ্রহের সহিত সেই অপূর্ব্ব কাহিনীর আদ্যোপান্ত পড়িয়া গেল। তার পর অমিতব্যয়ী পুত্রের (Prodigalson) উপদেশ পাঠ করিল। তার পর ক্রমে ক্রমে সে আরও দুই একটা স্থান পড়িল। তাহার দীর্ঘকাল রুদ্ধ পাঠের তৃষ্ণা যেন আজ শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সে পড়িতে পড়িতে খাইল, খাইয়া আসিয়া আবার পড়িতে বসিল।

অনেকক্ষণ পড়িয়া সে বইখানা রাখিয়া দিল। তখন সে গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার চিন্তায় একটা নূতন ধারা দেখা দিল। ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য, ঈশ্বর, স্বর্গরাজ্য প্রভৃতির কথা একটা সদ্যশোনা মন-কাড়া রূপকথার মত তার মাথার ভিতর ঘুরিতে লাগিল। কথাগুলি ঠিক মনে বসিল না, তাহাতে ঠিক প্রাণের ভিতর হইতে বিশ্বাস জন্মিল না, কিন্তু কথাগুলি বড় ভাল লাগিল। মনে হইল, এ কল্পনাটি বড় সুন্দর। যদি সত্যসত্যই এসব সত্য হয় যদি পরলোক থাকে, ঈশ্বর থাকে, কর্ম্মফল থাকে, আর সবার উপর, পরমেশ্বরের এই অপার স্নেহ থাকে তবে বড়ই সুন্দর মধুময়, অর্থপূর্ণ হয় এ জীবন! কিন্তু, তাহা হইলে সে দাঁড়ায় কোথায়? সে স্পর্দ্ধাভরে যে পাপের পথে পা দিয়া বসিয়াছে

সে পাপ যে একটা বড় পাপ বলিয়া পরিগণিত। তখন তার মনে হইল পতিতা মেরী মডলিনের কথা, যীশুখ্রীষ্টের সেই মহদ্বাণী "যে আপনি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ সেই ইহার প্রতি প্রথম লোষ্ট্রনিক্ষেপ কর।" পাপ যদি সে করিয়াই থাকে তবে নিরাশ হইবার কোনও কারণ নাই। যীশুখৃষ্ট পাপীকে আশার বাণী শুনাইয়াছেন।

কিন্তু সে পাপী কিসে? জগতে সে কেবল একজনকেই ভালবাসিয়াছে—একজনের রূপ গুণে মুগ্ধ হইয়া সে আত্মসমর্পণ করিয়াছে? আর দশজনে ধরিয়া বাঁধিয়া আর একটা লোককে তার উপর যথেচ্ছ প্রভুত্ব করিবার অধিকার দিয়াছিল, সে অধিকার ও সে অত্যাচার সে অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া সে লোকের চক্ষে পাপী হইতে পারে, কিন্তু যদি কোনও ন্যায়বান ঈশ্বর থাকেন তবে তাঁ'র চক্ষে কি সে পাপী হইবে? অসম্ভব! এই কথা ভাবিতে ভাবিতে তা'র মনে নগেনের মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল, সে মন হারাইয়া সেই মনোরম চিন্তায় আত্মসমর্পণ করিল, তাহার প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল, আর সব ভাবনা চিন্তা মন হইতে মুছিয়া গেল।

যখন নগেন আসিয়া সত্যসত্যই ঘরে ঢুকিল তখন সে তাহারই ধ্যানে একেবারে তন্ময় হইয়াছিল। সম্মুখে ধ্যেয় বস্তুকে সশরীরে দেখিয়া তাহার শিরায় শিরায় নাচন উঠিল, সে লাফাইয়া উঠিয়া তাহাকে সম্ভাষণ করিল। পরস্পরকে আলিঙ্গন বদ্ধ করিয়া তাহারা কিছুক্ষণ নীরবে পরস্পরের সান্নিধ্য উপভোগ করিল তার পর একখানা কৌচের উপর বসিল।

ঠিক সেই সময় শুভার মনের ভিতরটায় ভয়ানক তোলপাড় হইতেছিল। তাহার প্রাণের ভিতর কে যেন বলিতেছিল, "এ অন্যায়, এ পাপ"—তাহার মনের ভিতর সে মাদার ক্রিশ্চিয়ানায় সৌম্যমূর্ত্তি অপ্রসন্ন দেখিতে পাইল, আর দেখিল বইয়ের ভিতর হইতে যীশুখৃষ্ট যেন বেদনা

কাতর-হৃদয়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু নগেনের এত কাছে বসিয়া তার লুব্ধ-হৃদয় আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। তাহার লালসার প্রবল স্রোতে সকল দুশ্চিন্তা ভাসাইয়া লইয়া গেল।

তখন বেলা প্রায় ৪টা। তাহারা চা খাইয়া গান বাজনা, গল্পগুজব, হাস্য পরিহাস করিয়া যে কেমন করিয়া সময় কাটাইয়া দিল তাহা কেহ বুঝিতেই পারিল না যখন রাত্রি ৯টার সময় আয়া আসিয়া খবর দিল যে খানা তৈয়ার তখন তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া গেল যে এতটা রাত্রি হইয়া গিয়াছে।

খানা তৈয়ার শুনিয়া নগেন তাহার কোটটা খুলিয়া মুখ হাত ধুইতে গেল। দুই পা যাইয়াই আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "ও হো! তোমার জন্য একটা জিনিস এনেছি তা এতক্ষণ দেখানই হয় নি।" বলিয়া কোটের পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া শুভাকে দিয়া বলিল, "এইটা প'ড়ে দেখ।" সে মুখ হাত ধুইতে গেল।

শুভা খুলিয়া পড়িল, একখানা বাঙ্গলা দলিল, মায় আসবাব এই বাড়ী খানার দানপত্র। নগেন আজই শুভার বরাবর এই বাড়ীখানার দানপত্র রেজেষ্ট্রী করিয়া আনিয়াছে। পড়িয়া শুভার শরীর মন পুলকিত হইয়া উঠিল—এই তুচ্ছ ঐশ্বর্য্যের জন্য নহে, নগেন তাহাকে কত ভালবাসে তাই বুঝিয়া সে পুলকিত হইল। সবটা সে পড়িল না, খানিকটা পড়িয়াই সে ভাঁজ করিয়া রাখিতে গেল। সেই সময় সেই কাগজের ভাঁজের ভিতর হইতে একখানা চিঠি গড়াইয়া মাটিতে পড়িল।

শুভা চিঠিখানা কুড়াইয়া লইয়া দেখিল খামের মোড়কের উপর মেয়েলী হরফে নগেনের ঠিকানা লেখা। চিঠিখানা খুলিয়া পড়িবার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা হইল। সে তাড়াতাড়ি সেখানা কুড়াইয়া লইয়া ড্রেসিংরুমে গিয়া দরজা বন্ধ করিল।

চিঠিখানা পড়িয়া সে স্তব্ধ নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। এক মুহূর্ত্তের জন্য তার বোধশক্তি তিরোহিত হইল, সমস্ত পৃথিবী তাহার চক্ষের সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল, মাথার ভিতর শিরাগুলি দপ্ দপ্ করিয়া লাফাইতে লাগিল; সে মাটিতে বসিয়া পড়িল।

চিঠিখানা নগেনের স্ত্রী চপলার লেখা। চপলাকে শুভা দূর হইতে দেখিয়াছে—বছর ষোল বয়সের ছোট্ট একটি সুন্দরী, চঞ্চল জীবনে একেবারে ভরপুর, যেন একটা খাদশূন্য আনন্দের অফুরাণ ফোয়ারা। তার কথা এত দিন তার মনে উঠে নাই, আজ এই চিঠি পড়িয়া তাহার সেই সদ্যঃফোটা ফুলের মত উজ্জ্বল তরুণ মুখখানি মনে পড়িয়া গেল।

চিঠিখানা ভবানীপুর, চপলার বাপের বাড়ী হইতে লেখা। চিঠিতে প্রকাশ যে সে চারদিন হইল বাপের বাড়ী গিয়াছে, ইহার মধ্যে দুই দিন নগেন সেখানে গিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিয়াছে,—আবার যাইবার কথা ছিল, সে যায় নাই বলিয়া বধূ অনুযোগ করিয়াছে। খুব বেশী অভিমান করিয়া সে চিঠি লিখিয়াছে এবং শাসাইয়াছে যে যদি আজ সন্ধ্যাবেলা তার ফরমাসের জিনিসগুলি লইয়া নগেন হুজুরে হাজির না হয় তবে Mattimonial Penal Code মতে তাহার দণ্ড হইবে, সে সাত দিন নগেনের সঙ্গে কথা কহিবে না এবং একমাস তাহাকে চুমো খাইবে না। বালিকা হিসাব করিয়া দেখাইয়াছে যে তাহাতে নগেন যতগুলি মধুর কথা হইতে বঞ্চিত হইবে তাহা এক সঙ্গে করিয়া লিখিলে একখানা ওয়েবষ্টার ডিক্সনারীর মত বই হইবে এবং চুমোর সংখ্যা প্রায় পরার্দ্ধ হইবে।

এই সরল বিশ্বাসময়ী বালিকার চিঠিখানা পড়িয়া শুভার বালির প্রাসাদ চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার পায়ের তলা হইতে মাটী যেন সরিয়া গেল। যখন সে ভাবিতে পারিল তখন সে মনে মনে

বলিল, "কি ক'রতে বসেছি আমি! সুখের নেশায় বিভোর হ'য়ে একবার ভেবে দেখিনি যে আর একজন আমারি মত নারীর গলায় ছুরি দিচ্ছি, তার জীবনটাকে ব্যর্থ করে দিচ্ছি।" এ কথা স্থির করিতে তার দেরী হইল না যে চপলার প্রেমের স্বপ্ন সে ভাঙ্গিতে দিবে না, তার উপর এ দুপুরে ডাকাতি সে কিছুতেই করিবে না। সে নগেনকে ছাড়িয়া এমন করিয়া লুকাইবে যে নগেন আর কিছুতেই তাহার সন্ধান পাইবে না। কিন্তু—এই কথা ভাবিতেই তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল—তাহার নিজের কি হইবে? সে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে? এই এতবড় বিশ্বের ভিতরে তার তো এক ফোঁটা জায়গা কোথাও নাই। আর—কোনও দিনই তার আপনার বলিবার কেহ ছিল না, এখনো কেহ রহিল না। ছিল না সে বরং ছিল ভাল কিন্তু এ যে স্বর্গ হাতে পাইয়া সে হারাইল!

শুভা মাটির সহিত মিশিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কেবলি কাঁদিতে লাগিল, কাঁদিয়া আর তাহার আশ মিটিল না। তাহার বুক ঠেলিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে দুঃখের বন্যা তাহার সব ভাসাইয়া লইয়া চলিল। সে ভাবিতে চেষ্টা করিল এখন সে কোথায় যাইবে, কি করিবে? ভাবিয়া কূল পাইল না, তাহার শূন্য হৃদয় ভরিয়া কেবল একটি কথাই ধ্বনিত হইতে লাগিল, "সে একান্ত অসহায়, নিতান্ত একা! সে দুঃখিনী, তার কোনও বন্ধু নাই!"

তখন তার মনে হইল সেই মহাবাক্য, "এস আমার কাছে তোমরা, হে শ্রান্ত ও ভারপীড়িত, আমি তোমাদিগকে শান্তি দিব।" তাহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল মাদার ক্রিশ্চিয়ানা সেই পুণ্যময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি, তাঁ'র সেই স্নিগ্ধ, মনোহর বাণী যখন তিনি এই মহান্ আশার কথা তাহাকে শুনাইতেছিলেন। সে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া, ক্রুশটী তাহার বুকে

চাপিয়া; আকুল হৃদয়ে ডাকিল, "কোথায় তুমি যীশুখৃষ্ট, কোথায় প্রভু জগদীশ্বর, তোমার এ আর্ত্ত ক্লিষ্ট সন্তানকে আসিয়া তুমি শান্তি দিবে না কি ?" যুক্ত করে উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া শুভা ধ্যান করিতে লাগিল। তখন তাহার হৃদয় শান্ত হইল, সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

নগেন ততক্ষণ আসিয়া দরজায় ধাক্কাধাক্কি করিতেছিল। শুভা তাড়াতাড়ি চিঠিখানা বুকের ভেতর গুঁজিয়া ফেলিয়া পাশের ওয়াশ হ্যাণ্ড ষ্ট্যাণ্ডে মুখ ধুইতে ধুইতে বলিল, "একটু দাঁড়াও, আমি এই এলাম বলে।" নগেন চলিয়া গেল।

ড্রেসিংরুমের দ্বার খুলিয়াই শুভা সাঁ করিয়া খানার ঘরে প্রবেশ করিয়া আয়া ও খানসামাকে বলিল, "তোমরা খানার সময় এখানে থেকো, না হলে সাহেবের বড় অসুবিধা হয়।" নগেন ততক্ষণ বাহিরে বারান্দায় পায়চারী করিতেছিল, শুভা আয়াকে দিয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল।

নগেন খাইতে বসিয়া, খানসামাকে বলিল, "তুমি খানা দিয়ে চলে যাও।" কিন্তু শুভা বলিল, "না ওরা না থাকলে বড় অসুবিধা লাগে, তোমার খাওয়াই হয় না। ওরাই আজ খাবার দিক।" বলিয়া একাগ্রভাবে সুপ খাইতে লাগিল। নগেন কিছু বলিল না, কেবল একটু হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা এর শোধ পরে দেবো।"

শুভার প্রাণের ভিতর চমকিয়া উঠিল। এ কি ভীষণ পরীক্ষা তার সম্মুখে! সে মনে মনে তীব্রভাবে ভাবিতে লাগিল, তার বাহ্যজ্ঞান একেবারে রহিত হইয়া গেল। অপটু হস্তে ছুরী কাঁটা ব্যবহার করিতে চিন্তার ব্যাঘাত হয় দেখিয়া সে ক্রমে সেগুলি ফেলিয়া হাত দিয়া খাইতে আরম্ভ করিল—কি খাইল তাহার জ্ঞান হইল না।

তার চমক ভাঙ্গিল যখন খানসামা একটা বোতল খুলিয়া খানিকটা

স্যাম্পেন নগেনের গেলাসে ঢালিয়া দিল। তাহার কাছে বোতল আনিলে সে হঠাৎ পথের মাঝে সাপ দেখিলে লোকে যেমন চমকায় তেমনি করিয়া চমকিয়া উঠিল। কাতর ভাবে সে নগেনকে বলিল, "ও কি মদ? তুমি মদ খাচ্ছ কেন?"

নগেন হাসিয়া সবটা স্যাম্পেন এক নিঃশ্বাসে খাইয়া ফেলিল। বলিল, "এতটুকুতে নেশা হয় না। তোমার ভয় নেই, তুমিও একটু খাও, আমার কথা শোন। নেহাৎ স্যাম্পেন না খাও একটু পোর্ট খাও, তাতে কোনও অনিষ্ট হবে না।"

শুভার বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে সমস্ত সাহস সংগ্রহ করিয়া বলিল, "মদ আমি কিছুতেই খাব না। তোমাকেও আর খেতে দেব না।"

নগেন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল বলিল, "তোমার বুঝি নিবারণের কথা মনে হচ্ছে? কোনও ভয় নাই। তুমি পোর্ট খেতে ভয় পাচ্ছ কখনও ওষুদ ব'লে পোর্ট খাও নি?"

"খেয়েছি।"

"আচ্ছা তবে ওষুদের মাত্রাই খাও, এক আউন্স খাও, আমার মাথা খাও।" বলিয়া সে নিজ হাতে আউন্স দুয়েক পোর্ট ঢালিয়া শুভার মুখের কাছে ধরিল। শুভ তখন ভয়ে ভয়ে নির্ব্বিবাদে সেটা খাইয়া ফেলিল।

নগেন আরও খানিকটা স্যাম্পেন ঢালিয়া লইল। শুভা তাহার হাত চাপিয়া ধরিতে গিয়া থামিয়া গেল—তাহার মনে হইল নগেনকে স্পর্শ করিবার অধিকার তাহার নাই।

বস্তুতঃ নগেনের মদ খাওয়ার বিশেষ অভ্যাস ছিল না। কালে ভদ্রে ফ্যাসানের খাতিরে সে এক আধটুকু কখনো খাইয়াছে। কিন্তু সে আজ ইচ্ছা করিয়াই মদ কিনিয়া আনিয়াছিল, নিজে খাইবে, শুভাকে

খাওয়াইবে বলিয়া। এ কয় দিন সে শুভার সঙ্গে যতটা মিশিয়া যাইতে চাহিয়াছে ততটা পারে নাই, কেমন একটা লজ্জার বাধা আসিয়া তাহাদের ভিতর একটা ভদ্রতা ও ভব্যতার ব্যবধান রাখিয়া দিয়াছে। আজ সে সংকল্প করিয়াছে যে এ ব্যবধান দূর করিতে হইবে। তাই সে সকল সঙ্কোচনাশিনী সুরার সহায়তা গ্রহণ করিয়াছে। তাহার শরীরকে দুই গ্লাশ শ্যাম্পেনেই বেশ একটু টলাইয়া দিল। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, মুখখানা যেন টস্‌টস করিতে লাগিল, কথাবার্ত্তাও বেশ একটু নিঃসঙ্কোচ হইয়া উঠিল। শুভার ভয় ক্রমশঃই বাড়িয়া গেল কোনও ক্রমে খাওয়া শেষ করিয়াই শুভা ছুটিয়া শুইবার ঘরে গিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া বিছানায় বসিয়া পড়িল। যেটুকু পোর্ট সে খাইয়াছিল তাহাতে কোনও রকম নেশা না হইলেও সে একটু বেশীরকম উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল।

ততক্ষণ আর এক গ্লাস মদ খাইয়া নগেন কতকটা অস্থির পদে শুভার ঘরের দুয়ারে ঘা মারিতে লাগিল, বলিল "শুভামণি দোর খোল, লক্ষ্মীং।"

শুভা মনকে জোর দিবার জন্যই দুই হাতে খাট খুব শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিল, "না দোর খুলবো না, তুমি বাড়ী যাও।"

"ঠাট্টা রাখ মণি. দোর খোল, আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে তোমার জন্যে; সত্যি! খোল, দেখ, আমি মাতাল হইনি, মাতাল আমি হব না। কখখুনো না।"

শুভা কেবল বলিল, "তুমি বাড়ী যাও।"

"এই তো আমার বাড়ী; তুমি যেখানে সেখানে ছাড়া আমার বাড়ী কোথায়; আমাকে পায় ঠেলো না লক্ষ্মীটি! আমি তবে মরে' যাব।"

কথাগুলি মাতালের কথা নয়। মদ না খাইলে নগেন এ কথাগুলি

এমন অসঙ্কোচে বলিয়া যাইতে পারিত না, মদে তাহার সঙ্কোচ দূর করিয়া দিয়াছিল, এই পর্য্যন্ত কিন্তু সে হুঁস হারায় নাই।

কথা শুনিয়া শুভার মনের ভিতর ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল, তার ইচ্ছা হইল তখনি দুয়ার খুলিয়া তাহার আদরের ধনকে ঘরে তুলিয়া আনে। কিন্তু সে প্রবল বেগে বুক চাপিয়া ধরিল। তাহার হাতে ঠেকিল সেই ক্রুশ ও বুকের ভিতর খস্‌খস্‌ করিয়া উঠিল সেই চিঠিখানা। সে কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

তাহার পর এক ঘণ্টা ধরিয়া নগেন দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল, শপথ করিল সে আর কখনও মদ ছুঁইবে না— শুভার দিব্য করিয়া শপথ করিল, কত আদর করিয়া, ডাকিল, কত প্রাণস্পর্শী দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িল। প্রত্যেকটি কথা শুভার অন্তরে গিয়া ছুঁচের মত বিঁধিতেছিল, তাহার হৃদয় প্রত্যেকটি কথায় চুরমার হইয়া যাইতেছিল, কিন্তু সে নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল। অন্তরে তাহার দুর্ব্বল হৃদয়, আর বাহিরে এই প্রবল প্রলোভন, দুয়ের সঙ্গে সে সকল শক্তি সংগ্রহ করিয়া যুঝিতে লাগিল। তাহার আঁতে ঘা দিয়া নগেন এক একটি কথা বলিতে লাগিল আর সে কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সে তাহার প্রেমাস্পদকে দীর্ঘ চেষ্টার পর বিমুখ করিল। যখন শেষ হতাশ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া, ভগ্ন হৃদয়ে নগেন বলিল, "তোমার জন্য আমি সব ছাড়লাম শুভা, আর তুমি আমায় পায় ঠাঁই দিলে না?" তখন শুভা আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না, সে উঠিয়া আসিল, দুয়ারের হুড়কায় হাত দিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। পায়ের শব্দ শুনিয়া বুঝিল নগেন চলিয়া যাইতেছে। তারপর সে মাটিতে লুটিয়া পড়িয়া অবিশ্রাম কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার রাত্রি প্রভাত হইল, কিন্তু প্রভাতের আলোর সঙ্গে সঙ্গে সে আত্মপ্রসাদের সহিত অনুভব

করিল সে জয়ী হইয়াছে! পরের জন্য আত্মবলিদান করিয়া সে আজ ধন্য হইয়াছে!

[৮]

শুভা যখন শান্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন কনভেণ্টের অর্গানে প্রভাতী সঙ্গীত বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে শত কণ্ঠে গভীর অর্চ্চনার স্বর ধ্বনিত হইল। শুভা শুদ্ধ শান্ত চিত্তে উর্দ্ধদিকে চাহিয়া সেই প্রার্থনার স্বরের সহিত মিলাইয়া আপনার হৃদয়ের প্রার্থনা জানাইল; একটা অপূর্ব্ব আনন্দে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে ড্রইংরুমে গিয়া বাইবেলখানা লইয়া পড়িতে লাগিল। সেখানে বসিয়াই সে চা খাইল, আর পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ বাদে দ্বারে আসিয়া মাদার ক্রিশ্চিয়ানা শুভাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইলেন। শুভা স্নিগ্ধমুখে নত মস্তকে তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিয়া বসাইল। তাঁহাকে পাইয়া যে শুভার সমস্ত সত্তা নিঃশেষরূপে ধন্য হইয়া গিয়াছে তাহা তাহার মুখ দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা গেল। মাদার তাঁহার বাইবেল খুলিয়া শুভাকে পড়াইতে লাগিলেন। তিনি St Luke এর সুসমাচার অবলম্বন করিয়া মোটামুটী ভাবে যীশুখৃষ্টের জীবনী ও তাঁহার অপূর্ব্ব লীলাকাহিনী বর্ণনা করিয়া তাঁহার কয়েকটি উপদেশ (parable) অবলম্বন করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত তত্ত্বগুলি বিশ্লেষণ করিতে লাগিলেন।

শুভা শেষে বলিল, "দেখুন আমার মনে যে কথাগুলি উঠ্‌ছে সেগুলি আমি অকপটে আপনার কাছে ব'লতে চাই, যদি কিছু মনে না করেন। আমি সব কথা গুছিয়ে ইংরেজীতে বলতে পারবো না। আপনি বাঙ্গালা বোঝেন কি?"

মাদার ক্রিশ্চান বলিলেন, "তুমি বাঙ্গালায় বল, আমি ভাল বাঙ্গালা ব'লতে না পারলেও বাঙ্গালা বুঝি।"

শুভা বলিল, "পাপ পুণ্যের মা॰কাটি কি? আপনি হয় তো যেটাকে পাপ মনে করেন আমি সেটা পাপ মনে করি না, আমি যেটা পাপ মনে করি আপনি সেটা সৎকার্য্য বলে বর্ণনা করেন। ধরুণ, আপনারা যে সব জিনিস খান' তা হিন্দু ধার্ম্মিক লোকেরা মহাপাপ ব'লে মনে করে।"

ক্রি। "দেখ প্রভু এ কথার জবাব দিয়েছেন, 'যা' তোমাদের মুখের ভিতর যায় তা'র দ্বারা ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম হয় না যা' তোমাদের মুখ হইতে বাহির হয় তাহাতে ধর্ম্মাধর্ম্ম।" মুখের ভিতর যায় কি? খাদ্য। বাহির হয় কি? সত্য ও অসত্য কথা।"

শু। মানলাম অপনার ধর্ম্মশাস্ত্রে এ কথা বলে, কিন্তু আমাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্রে তো উল্‌টা কথা বলে। কোনটা ঠিক?

ক্রিশ্চান। এ কথা নির্ণয় করা কঠিন নয়। যদি স্বীকার কর যীশুখৃষ্ট ঈশ্বরের পুত্র এবং তিনি জগৎকে ত্রাণ করবার জন্য জগতে এসে-ছিলেন তবে সেই জগদীশ্বরের নিজের মুখের কথাই যে এ সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ সে কথা কি আর বলতে হ'বে? তুমি ব'লবে যীশু যে ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরের অবতার তার প্রমাণ কি? প্রমাণ তাঁরই মুখের কথা। তিনি দয়া ক'রে জগৎকে এই বাণী জানিয়েছেন তাই আমারা এ কথা জানতে পেরেছি না হ'লে সেই প্রথম পাতক দুষ্ট মানুষ আমরা, আমাদের সাধ্য কি এই প্রেমের কাহিনী, এই আনন্দের বাণী জানতে পারি?

শুভা কথা তুলিল, "এসব যে যীশুখৃষ্টের নিজের মুখের কথা তা'র প্রমাণ কি?"

উত্তরে মাদার ক্রিশ্চান চারিটি সুসমাচারের নানা স্থান হইতে

নানা বাক্য এবং Old Testment এর নানা ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধার করিয়া দীর্ঘকাল বক্তৃতা করিয়া বলিলেন, "ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন নিষ্কলঙ্ক চরিত্র সাধুপুরুষ এই একই কথা বলিয়াছেন, তাঁরা মিথ্যা বলিতে চাওয়া সম্ভব হইলেও এমন এক জোট হইয়া মিথ্যা বলা অসম্ভব।"

শু। 'তা' ছাড়া, যীশুই যে সে মহাপ্রভু তার একমাত্র প্রমাণ তাঁর নিজের কথা। তিনি তো ভ্রান্ত হ'তে পারেন, কিংবা নিজের ধর্ম্ম প্রচারের সুবিধার জন্য একথা বলে থাকতে পারেন। আমাদের দেশেও তো এমন অনেক মহাপুরুষ জন্মেছেন যাঁরা নিজেদেরকে ঈশ্বরের অবতার প্রচার ক'রেছেন, অনেক বঞ্চকও জন্মেছে যারা নিজেদেরকে অবতার ব'লে জানিয়েছে। এই সে দিন তো কল্কি অবতারের একটা বীভৎস মোকদ্দমা হ'য়ে গেল।

কথাটায় মাদার ক্রিশ্চিয়ানায় মুখ একেবারে লাল হইয়া গেল, তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর বুকের ক্রুশের উপর হাত দিয়া একটু ধ্যানস্থ হইয়া সম্পূর্ণ শান্তচিত্তে উত্তর করিলেন, "এ কথার উত্তর সুধু মুখের কথায় দেওয়া চলে না—এটা দীর্ঘ অধ্যয়ন সাপেক্ষ। তুমি বেশ নিরপেক্ষভাবে যাশুর জীবন তন্ন তন্ন ক'রে আলোচনা ক'রে দেখ, বাইবেলের উপদেশ ছেড়ে দিয়ে সমস্ত মানবের সাধারণ নীতিজ্ঞান, স্বাভাবিক বিবেক বুদ্ধি দিয়ে আলোচনা ক'রে দেখ, তাঁর জীবনে কোথাও পাপের ছায়ামাত্রও দেখতে পাবে না। মানুষ এমন কে আছে যে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ! অতি বড় সাধু মহাপুরুষ যে, তা'র ভিতরও, যতই চাপা থাকুক, পাপ আছে। কিন্তু এই একটি মানুষ সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। যিনি এমন নিষ্পাপ এমন সাধু তিনি কি অসত্য ব'লতে পারেন? তাঁর মনের কাছে সম্পূর্ণ যাচাই হ'য়ে যেটা নির্ভাজ সত্য ব'লে প্রতিষ্ঠিত না হ'য়েছে সেটাকে কি তিনি সত্য ব'লে প্রচার করতে পারেন? প্রভু যীশুর কথার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ

তাঁর জীবন; সেই জীবনকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা ক'রে দেখ' কোনও দ্বিধা, কোনও দ্বন্দ্ব থাকবে না।"

মাদার ক্রিশ্চিয়ানায় সমস্ত মুখ এক অপূর্ব্ব আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কি গভীর অতলস্পর্শ তাঁর বিশ্বাস! এই রমণী যখন এই কথাগুলি বলিতেছিলেন তখন যেন সে তা'র সমুদয় সত্তা দিয়া যীশু-খৃষ্টের সান্নিধ্য অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহার বাক্য ও তাহার মন যেন তার মহা প্রভুর করস্পর্শে উজ্জ্বল ও আনন্দময় হইয়া উঠিতেছিল। শুভা তন্ময় হইয়া এই দেবীর সরল অতল বিশ্বাসের স্বরূপ দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইতেছিল। যখন তিনি তাঁর ওজস্বিনী ভাষায় তাঁর বক্তব্য শেষ করিলেন তখন শুভা কিছুক্ষণ নীরব স্তব্ধ হইয়া রহিল। সে কোনও দিন প্রকৃত সাধুর সান্নিধ্য অনুভব করে নাই, আজ তাহা অনুভব করিয়া সে মুগ্ধ হইয়া মাথা নত করিল।...

কিছুক্ষণ পরে শুভা বলি, "ভাল মন্দ, পাপ পুণ্য বিচার করবার কি উপায় আছে? ঈশ্বরের আজ্ঞা যা' বাইবেলে লেখা আছে সে অতি সামান্য। আর আর ধর্ম্মেও এমনি কত অনুশাসন আছে, ধ'রলাম সে সবও ঈশ্বরের আজ্ঞা। কিন্তু এই সব অনুশাসন একত্র ক'রে যে 'ফর্দ' নিয়ম পাই তা' আমাদের এই জটিল জীবনের পক্ষে কিছুই নয়। জীবনে এমন সব জটিল সমস্যা এসে পড়ে যেখানে এই সব সোজা নিয়মে কোনই সাহয্য হয় না। ধরুন' 'সত্য কথা বলিবে অসত্য বলা পাপ' এটা একটা সাধারণ নিয়ম। কিন্তু অসত্য কথা বলা কি সব সময়েই পাপ? যখন ছোট শিশুকে ভুলাবার জন্য আমরা নানা রকম মিথ্যা কথা বলি তখন কি আমরা পাপাচরণ করি? ধরুন আমি এক শঙ্কটাপন্ন রোগীর শুশ্রূষা করছি। এখন খবর এসেছে যে তার একমাত্র পুত্র মারা গেছে। রোগীকে যদি সে কথা জানাই তবে সে মারা যাবে এ নিশ্চয় জানি।

এ অবস্থায় যদি রোগী আমাকে জিজ্ঞাসা করে তার ছেলের খবর, তবে আমি মিথ্যা বলিলে কি আমার পাপ হবে? আমার তো মনে হয় এখানে সত্য কথা বলাই অন্যায় হ'বে। এই সব শঙ্কটময় প্রশ্নের সমাধান কেমন করে' করা যাবে?"

ক্রি। নিরন্তর সশ্রদ্ধভাবে যদি ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করা যায় তবে এই মহাগ্রন্থের ভিতরই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে। খুব জটিল সমস্যা সব এসে পড়ে সন্দেহ নাই, যার উত্তর কেবল এই সব সাধারণ নিয়ম দিয়ে নির্ণয় করা যায় না, কিন্তু যদি সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের তত্ত্ব ভাল করে হৃদয়ঙ্গম কর তবে কখনই এমন কোন সমস্যায় তোমাকে বিপন্ন ক'রতে পারবে না। আমার এই পঞ্চান্ন বছরের জীবনে এক দিনের তরে আমি বিপন্ন হই নি। যখনি কোনও ধর্ম্ম সঙ্কট উপস্থিত হ'য়েছে শ্রদ্ধার সহিত ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ক'রে আমি তাতে তার সমাধান পেয়েছি। তা ছাড়া ভগবান দয়া ক'রে আমাদের সবারই মনে এমন একটা প্রদীপ জেলে দিয়েছেন যার দ্বারা আমরা ইচ্ছা ক'রলেই অধর্ম্ম হ'তে ধর্ম্মকে বেছে নিতে পারি। সেটা আমাদের বিবেক। তাকে ফাঁকি দেবার যো নেই, অধর্ম্ম ক'রলে সে তোমাকে পোড়াবে, ধর্ম্মের পথে তোমাকে আলো দেবে।

শুভা। কিন্তু এটা তো কেবল ভাল লাগা মন্দ লাগার কথা। আমরা সব সময়ই যে আমাদের ভাল লাগা মন্দ লাগা দিয়ে পাপ পুণ্যের বিচার ক'রে উঠতে পারি তা' তো ঠিক নয়। ধরুন নরনারীর অধর্ম্ম, সমন্ধ, এটা একটা পাপ তা ধর্ম্মশাস্ত্রে বলে। কিন্তু আমি এমন সব লোকের মধ্যে বাস ক'রে এসেছি যারা দিবারাত্রি এই পাপ আচরণ ক'রছে, অথচ পরম আনন্দে দিন কাটাচ্ছে—এর জন্য তা'দের মনে কোনও রকম দ্বিধা বা সন্দেহ বা দুঃখ পর্য্যন্ত হয় না।

ক্রি। তাদের বিবেককে তারা অন্ধ ক'রে ফেলেছে তাই তাদের মনে আর তার কোনও সাড়া পাওয়া যায় না। দেখ, মানুষের মনের ভিতর স্বর্গ ও শয়তানের নিরন্তর সংগ্রাম চ'লছে, যদি তুমি শয়তানের কাছে আত্মবিক্রয় ক'রে বস' তা' হ'লে স্বর্গের ছায়ামাত্র তোমার মনে থাকবে না। তখন মুক্তির একমাত্র আশা প্রভু যীশুর দয়া।

শুভা। মাপ ক'রবেন, আপনি হয় তো তাদের জানেন না তাই ব'লছেন যে তারা শয়তানের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মবিক্রয় করেছে। আমি তা'দের খুব ভাল করে জানি। তাদের মধ্যে এমন সব মেয়ে আছে যারা অনেক গৃহস্থের মেয়ের চেয়ে জ্ঞানে ও অনেক গুণে গরীয়সী। দয়া ধর্ম্ম তাদের ভিতর খুব আছে। আর্ত্তের সেবা, দুঃখীর দুঃখে কাঁদা এ সব যদি ধর্ম্ম হয় তবে তা' তাদের ভিতর যথেষ্ট আছে। আমি এমন মেয়ে মানুষও তাদের ভিতর দেখেছি যাদেরকে, কেবল এই এক পাপ বাদ দিলে ঘৃণার চেয়ে বরঞ্চ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা উচিত।

মাদার একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তা' হ'তে পারে, কিন্তু সে পাপ যে বড় ভীষণ পাপ। তারা যে এই পাপ অনায়াসে করে এতেই বোঝা যাচ্ছে যে তাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানটা লোপ পেয়েছে, বিবেক তাদের অন্ধ হ'য়েছে। তবে যে তারা কতক সৎকার্য্য করে সে কেবল গতানুগতিক ভাবে; দশজনের মুখে শুনে বা কাজ দেখে তাদের একটা নকল বিবেকবুদ্ধি জন্মেছে যেটা তাদের নিজস্ব নয়, কেবল লোকমতের প্রতিকৃতিমাত্র।

শুভা। এ পাপ কি সত্যই এত ভীষণ? কেন? অবশ্য আমি স্বীকার করি যে মাত্রাধিক্যে এটা গুরুতর অনিষ্টকারক, কিন্তু ধর্ম্মনিষিদ্ধ সম্বন্ধমাত্রই কি তাই? অনেক সময় এমনভাবে এমনি সম্বন্ধ ঘটে' থাকে যাতে সে অপরাধীদিগের নিন্দা ক'রবার বা দোষ দেবার কোনও অবসর

থাকে না। ধরুন খুব ছেলেবেলায় একটি মেয়ের মা বাপ ধরে' তাকে বিবাহ দিলেন এমন একজনের সঙ্গে যার সঙ্গে মনের মিল তো হ'তেই পারে না, তা ছাড়া সে পাপিষ্ঠ অত্যাচারী। সে মেয়েটি কোনও কথা না ক'য়ে নীরবে সকল অত্যাচার সয়ে' যদি চুপচাপ জীবন কাটিয়ে গেল, তবে একটা জীবন একেবারে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হ'য়ে গেল। কিন্তু যদি তার জীবনের ভিতর এমন একজন কেউ এসে পড়ে যে তা'র সমস্ত সত্তাকে জাগিয়ে তোলে তার জীবনের জড়ত্ব ঘুচিয়ে দিয়ে, তার ভিতর যা কিছু ভাল আছে তা উদ্‌বুদ্ধ করে' তোলে—এমন একজন আসে যাকে ভাল-বেসে সে আপনাকে জানতে পারে আর তার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রতে শেখে—তবে কি সে তাকে বিমুখ ক'রে ধর্ম্ম ক'রবে? এখানে যদি তার হৃদয়কে সে নিবৃত্ত করে তবেই সে কেবল একটা অন্ধ লোকমতকে তার জীবনের ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ক'রলে বলতে হ'বে না? অপর পক্ষে সে যদি লোকমত্ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে তা'র হৃদয়ের দেবতা ও একমাত্র ধর্ম্মসঙ্গত স্বামী ও প্রভুর কাছে যায় তবে কি সে ঠিক সত্যধর্ম্ম, জীবনের ধর্ম্ম পালন ক'রছে বলতে হবে না।

ম্যাঁদার ক্রিশ্চিয়ানার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। গভীর স্বরে আবেগের সহিত তিনি বলিলেন "তুমি একটা বড় সমস্যার কথা তুলেছ, এর উত্তর দিতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। আমি কেবল এই কথাটা এখন ব'লতে চাই যে তুমি যে ভাবের কথা বলছো সে ভাব আমার অজানা নেই। আমার জীবনে আমি সে প্রশ্নের সমাধান করেছি। শোন মেয়ে, আমি যখন তোমারই মত ছোট্ট মেয়েটি ছিলাম তখন এমনি একজন আমার জীবনের পথে এসেছিল, সে আমাকে ভালবাসতো আমিও তাকে ভাল বাসতাম। আমার বিবাহ হয় নাই, কিন্তু সে বিবাহিত। অনেক দিন অনেক রাত্রি আমি কেঁদে কাটিয়েছি কত দুঃখ পেয়েছি তা

কি বলবো। রাত্রের পর রাত্রি আমি বিনিদ্র নয়নে প্রার্থনা ক'রেছি মেরী মায়ের চরণে পড়ে' কেঁদেছি ; তবে মায়ের দয়া হ'য়েছে। তিনি আমার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত ক'রেছেন, তাঁর আপনার সন্তানকে আমায় দিয়েছেন—তিনিই এখন আমার একমাত্র প্রেমাস্পদ। আমার মনের মানুষটি আমার কখনও এত প্রিয় ছিল না, যেমন প্রভু যীশু খৃষ্ট। সে কখনও আমায় এত ভালবাসতে পারে কি যেমন সেই সকল প্রেমের আধার পারেন ? প্রভু যীশুর প্রিয়া হয়ে আমি যে কৃতার্থতা লাভ করেছি, মানুষের প্রেমে তা' কি কখনো সম্ভব ?"

মাদার ক্রিশ্চিয়ানার দুই চক্ষু গড়াইয়া পবিত্র অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল, তিনি ঊর্দ্ধমুখী হইয়া অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ, ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন। শুভাও মোহাবিষ্ট হইয়া এই স্বর্গীয় জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত সন্ন্যাসিনীর কমনীয় মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে কনভেণ্টে টং টং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল তখন মাদার ক্রিশ্চিয়ানার চমক ভাঙ্গিল। তিনি চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন "এখন আমার যেতে হবে, আমার উপাসনার সময় হ'য়ে এল ৷"

শুভা বলিল, "আপনি যদি দয়া করে কিছু খেয়ে যান তবে"—

মাদার বলিলেন, "আজকে আমার উপবাস। তা' ছাড়া আমি তো বাছা তোমার কিছু খাব না।"

শুভা বুঝিয়া, মাথা নত করিল ; পাপের পণ্য দান বলিয়াও গ্রহণ করিতে এই শুচিস্মিতা নারী অসম্মত।

দ্বারের কাছে আসিয়া শুভা বলিল, "আমি হয় তো আজই এ বাড়ী থেকে চলে যাব। আপনার চরণ আর দেখতে পাব কি না জানি না মা।"

বলিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

মাদার ক্রিশ্চিয়ানা তাঁর মাথায় হাত রাখিয়া আদর করিয়া বলিলেন, "তুমি যেখানে থাকবে আমাকে খবর দিলেই আমি যত শীঘ্র পারি দেখা করবো। জান না বাছা তুমি আমার কত আদরের।" বলিয়া তিনি শুভাকে বুকের কাছে টানিয়া চুম্বন করিলেন। শুভা মোহাবিষ্টের মত সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল, সন্ন্যাসিনী চলিয়া গেলেন।

অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া শুভা ঘরে ফিরিল। তাহার মাথার ভিতর আকাশ পাতাল চিন্তা হইতে লাগিল। নগেন্দ্র তার সব, নগেনের প্রেমে সে আপনাকে জানিয়াছে, তবু সে তার কেউ নয়! তাকে ছাড়িয়া তাহার এ দুর্ব্বিসহ জীবন কাটাইতে হইবে। কেমন করিয়া সে বাঁচিবে? তার চক্ষের সম্মুখে জাগিয়া উঠিল এই সন্ন্যাসিনীর ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তি, তাহার অতলস্পর্শ প্রেম। সে দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইল, এই সন্ন্যাসিনীর সকল ধর্ম্মের, সকল পুণ্যের, সকল জ্ঞানের আশ্রয় তাহার এই গভীর প্রেম ও বিশ্বাস। যদি এমনি বিশ্বাস ও এমনি প্রেম পাওয়া সম্ভব হইত তবে প্রাণটা রাখিবার মত কিছু হইত। কিন্তু সে কোথায় পাইবে এ বিশ্বাস—তাহার প্রেমের যে সাকার ও সসীম মূর্ত্তি সে তাহার চক্ষের সমক্ষে সর্ব্বদা দেখিতেছে, তাহাকে ছাড়া তার প্রেম কি করিয়া সম্ভব হইবে?

কনভেণ্টের একটা চাকর সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দিয়া মাদার ক্রিশ্চান তাহাকে কয়েকখানা সুন্দর বই পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহা শুভা লইল। তা'র মধ্যে ছিল Thomas A Kempi এর Imitation of Chris , একখানি প্রার্থনা পুস্তক আরও কয়েকখানি ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় ছোট ছোট বই। শুভা বইগুলি লইয়া ধন্যবাদ দিয়া একখানি পত্র লিখিয়া সেই লোকটাকে বিদায় করিল।

আয়া আসিয়া বলিল, হাজরি প্রস্তুত। শুভা খাইবার জন্য উঠিতেই

দেখিল বাড়ীর সামনে একখানা প্রকাণ্ড জুড়ী গাড়ী থামিল। তাহার প্রাণের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল; ভয় হইল বুঝি বা নগেন আসিয়াছে—আনন্দে প্রাণ নাচিয়া উঠিল, অথচ শঙ্কায় কাঁপিতে লাগিল।

গাড়ী হইতে বাহির হইলেন নগেনের মেজদা সত্যেন্দ্র, যিনি এটর্ণি। তিনি সটান গট্ গট করিয়া ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া শুভাকে বলিলেন, "তুমিই এখানে থাক ?"

শুভা লোকটার ভাবচরিত্র দেখিয়া অবাক্ হইয়া বলিল, "হুঁ।"

"আর কেউ ?"

"কেউ না।"

"তা বেশ, এখন লক্ষীটির মত সুড় সুড় করে বেরিয়ে পড় তো বাড়ী থেকে।"

শুভা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সভয়ে বাবুটীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বাবুটী ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন, "অমন হাবার মত আমার দিকে চেয়ে কি করছো, সত্যেন রায় নগেন নয়। বেরো পোড়ারমুখী, শিগ্গির বেরো, নইলে এই চাবুক দিয়ে পিঠের চামড়া তুলে দেবো। বেরো বাড়ী থেকে।"

শুভার ভিতর সিংহী তখন গর্জ্জিয়া উঠিল, সে বলিল, "কে তুমি বেয়াদব ?"

"সে খোঁজে দরকার কি চাঁদ, তুমি বেরোও না আমার বাড়ী থেকে। যদি চাবুক খেতে না চাও তবে যেমন আছ তেমনি এক্ষুণি বেরিয়ে পড়।"

শুভা বলিল, "এ বাড়ী তোমার নয় আমার, তুমিই বেরোও, নয় তো পুলিস ডাকবো।"

"তবে রে নচ্ছার বেটী, আমি এটর্ণী আমাকে তুমি আইন দেখাও,

আমি তোমাকে আমার আইন দেখাচ্ছি," বলিয়া সপাং করিয়া শুভাকে চাবুকের এক ঘা লাগাইয়া বলিল, "এখনো বলছি বেরোও। নচ্ছার মাগী, আমাদের সোণার সংসার ছারখার ক'রতে বসেছেন, আবার আমার সামনে তেজ! আমাকে আইন দেখাচ্ছেন। এই আমি ঘড়ি ধরলাম। দু মিনিটের মধ্যে তুমি যদি রাস্তায় না বেরুবে তো চাবকে বের করবো বলছি।"

শুভার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল, কিন্তু সে শব্দ করিল না। মুহূর্তমাত্র স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া সে সম্মুখ হইতে তাহার উপহার প্রাপ্ত বাইবেল ও অন্য বই কখানা লইয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

দুই পা যাইয়াই সে ফিরিয়া বলিল, "এ গয়না ও কাপড় ছেড়ে যাই, এ তো আমার নয়।"

সত্যেনবাবু বলিলেন, "কোনও দরকার নেই, তুমি যেমন আছ তেমনি যাও।"

শুভা বাহির হইয়া পড়িল। সম্মুখে একখানা খালি ট্যাক্সি পাইয়া সে তাহাতে উঠিয়া, মুহূর্ত মধ্যে সে পাড়া ছাড়িয়া গেল। তা'র বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল। সেই তো স্বেচ্ছায় নগেনকে ছাড়িয়া, এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইতেছিল, মাদার ক্রিশ্চান না আসিয়া পড়িলে এতক্ষণ সে কোথায় চলিয়া যাইত। তবে কেন মিছামিছি তার এ অপমান ও লাঞ্ছনা হইল। সে অনেক ভাবিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আপনাকে বুঝাইল, যে তার অপরাধের জন্য এ অপমানটা তার পাওনা ছিল।

সত্যেন্দ্রবাবু অপ্রসন্ন ভাবে সমস্ত বাড়ী ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন। তিনি যে রাগের মাথায় সত্য সত্যই একটা অসহায় রমণীকে প্রহার করিয়া বসিলেন তাহাতে তাঁহার মনটা অন্ধকার হইয়া উঠিল। ঘুরিতে ঘুরিতে

যখন তিনি আসিয়া দেখিলেন যে খানার ঘরে শুভার জন্য আসন সাজান রহিয়াছে, খানা তৈয়ার, তখন তাঁহার মনটা নিজের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। অভুক্ত, অসহায়, কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় এই মেয়েটাকে তিনি রাস্তায় পাঠাইয়া দিয়া একটা অপকার্য্য করিয়াছেন বলিয়া বেশ তীব্র ভাবেই বোধ করিতে লাগিল। যাহা হউক সে সঙ্কোচ ঝাড়িয়া ফেলিয়া বাড়ীর ঘর দুয়ার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া তিনি দেখিতে লাগিলেন। তিনি অনুসন্ধান করিতেছিলেন সেই দানপত্রখানা।

গতকল্য যখন নগেন সেই দানপত্রখানা রেজেষ্ট্রী করিতে গিয়াছিল তখন সবরেজিষ্ট্রারবাবু দলিল খানি দেখিয়া একটু সন্দিগ্ধ হইয়া উঠেন। সত্যেনবাবু তাঁহার বিশেষ পরিচিত। সবরেজিষ্ট্রারবাবু সত্যেনবাবুকে ডাকাইয়া গোপনে দানপত্রের খবর এবং সে বাড়ীর ঠিকানাটা তাঁহাকে জানাইয়া দেন। সত্যেনবাবু কিছুক্ষণ পরেই এই বাড়ীতে একজন লোক পাঠাইয়া সন্ধান নেন। সে আসিয়া বলিল যে এবাড়ীতে একটি স্ত্রীলোক থাকে এবং ছোটবাবুও তখন এবাড়ীতে। তখন তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিলেন যে নগেন থাকিতে এ বাড়ীতে আসার চেয়ে তার অসাক্ষাতে গিয়া মাগীটাকে তাড়াইয়া দেওয়াই ঠিক হইবে। রাত্রে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি নগেনের জন্য অপেক্ষা করিলেন। যখন নগেন ফিরিয়া আসিল তখন সে বলিল সে ভবানীপুর গিয়াছিল। তাহার চেহারা দেখিয়া এবং মুখের গন্ধে সত্যেনবাবু বুঝিলেন সে মদ খাইয়া আসিয়াছে। সে রাত্রে কিছু না বলিয়া পরের দিন একটা কাজ দিয়া তিনি নগেনকে বর্দ্ধমানে পাঠাইয়া দিলেন এবং স্বয়ং হাওড়া ষ্টেশনে তাহাকে উঠাইয়া দিয়া একেবারে এই বাড়ীতে আসিয়া হাজির হইলেন।

দানপত্র কোথাও পাওয়া গেল না। সেখানা শুভা তাহার বাইবেলের ভিতর রাখিয়া দিয়াছিল, যত্ন করিয়া উঠাইয়া রাখে নাই, তাই বিনা

যত্নে তাহা তাহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। সত্যেনবাবু বাড়ীতে যত কিছু ড্রয়ার বাক্স আলমারী প্রভৃতি ছিল সব খুলিয়া খোঁজ করিতে লাগিলেন। যখন তিনি এই কাজে ব্যাপৃত তখন মাদার ক্রিশ্চিয়ানা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সত্যেন্দ্র যখন শুভাকে গালাগালি করিতেছিলেন, তখন বুড়া খানসামা অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু বাবুর দেহখানা এবং দ্বারস্থ চারটী ভোজপুরিয়া দরওয়ানের লাঠীর বহর দেখিয়া তফাৎ হইতেই পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছিল। যখন সত্যেনবাবু সত্য সত্যই শুভাকে চাবুক মারিয়া বসিলেন তখন আয়া ও খানসামা যুক্তি করিয়া কনভেণ্টের মেমসাহেবকে খবর দেওয়া সঙ্গত বিবেচনা করিল। মেমসাহেবের কাছে খবর পৌছাইতে কিছু দেরী হইল, কিন্তু খবর পাইবামাত্র তিনি থানায় টেলিফোঁ করিয়া ছুটিয়া আসিলেন।

"শুভা, শুভা, কোথায় তুমি?" বলিয়া মেমসাহেব ছুটিয়া ঘরে ঢুকিলেন। সত্যেন্দ্র তখন ড্রইংরুমে একটা ক্যাবিনেট খুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। মাদার গভীর স্বরে বলিলেন "কে তুমি? শুভা কোথায়?"

সত্যেন্দ্রের হাতটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু যথাসম্ভব ধীরভাবে তিনি উত্তর করিলেন "রাস্তায় কোনও খানে তাকে পাইবেন।"

"ও! তুমি সেই কাপুরুষ! তুমি তাকে মেরেছ?"

"তাতে আপনার কি?"

"আমার সব। বল শীগ্গির কোথায় তাকে রেখেছ?"

"আপনি কেন এত উত্তপ্ত হ'য়ে উঠছেন? সে কোথায় আছে আমি তা' কেমন ক'রে জান্‌বো? আমি তা'কে রাস্তায় বের হ'তে দেখেছি এই পর্য্যন্ত।"

"আর তার পর তুমি তা'র জিনিসপত্র চুরী ক'রতে আরম্ভ ক'রেছ কেমন? তুমি এই মুহূর্ত্তে ঘর থেকে বের হও না হ'লে অনর্থ হ'বে।"

সত্যেন্দ্র খুব জোর করিয়া বলিলেন, "দেখুন আপনাকে বলে রাখি যে আপনি একজন সলিসিটরের সঙ্গে কথা ক'চ্ছেন, আমার সঙ্গে বেশী বাড়াবাড়ী ক'রবেন না। এ বাড়ী আমার, আপনি এখানে অনধিকার প্রবেশ ক'রে মিছে উৎপাত ক'রছেন। বেশী গোলমাল করেন তো আমাকে পুলিশের শরণাপন্ন হ'তে হ'বে।"

ক্রিশ্চান হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা সে দেখা যাবে ওই তো, ওই যে পুলিস এসেছে—ইনস্পেক্টর, এই লোকটি এই বাড়ীর অধিকারিণীকে কোথায় গোপন ক'রে তার জিনিসপত্র নাড়াচাড়া ক'রছে।"

পুলিস দেখিয়া সত্যেন্দ্র একেবারে ভ্যাবাচেকা খাইয়া গেলেন। সব ইন্‌স্পেক্টার অনেকক্ষণ অনুসন্ধান করিয়া শেষে সত্যেন্দ্রকে থানায় লইয়া গিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আদেশ অনুসারে অনুসন্ধান সাপেক্ষে নিজের মুচলেকায় তাঁহাকে খালাস দিল! শুভার সন্ধান চলিতে লাগিল।

সেইদিন সন্ধ্যাকালে বর্দ্ধমান হইতে ফিরিয়া নগেন ষ্টেশন হইতে সোজা গেল শুভার বাড়ীতে। সে বাড়ীতে তালাবন্ধ ও পুলিস পাহারা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। অনুসন্ধানে যাহা শুনিল, তাহাতে বুঝিল যে সত্যেন আসিয়াছিলেন এবং তার পর হইতে শুভাকে আর পাওয়া যাইতেছে না। সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। প্রথমে সে ফুটপাথের উপর বসিয়া পড়িল। অনেকক্ষণ ভাবিয়া সে উঠিয়া গেল বাড়ীতে আর ফিরিল না, ভবানীপুর শ্বশুরবাড়ী গেল।

] ১০]

শুভা ট্যাক্সিতে চড়িয়া তা'র কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিল। কোথায় যাইবে, কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। হঠাৎ তাহার চোখ পড়িল তাহার বাইবেলের ভাঁজে রাখা দানপত্র-খানার উপরে। সঙ্গে সঙ্গে কত কথা তা'র মনে পড়িল,—নগেনের সঙ্গে তার কাল রাত্রির ব্যবহারের কথা, নগেনের ভালবাসা, তার ব্যর্থ কাতর অনুরোধের কথা, তার সঙ্গে কত কথা হইয়াছে, দু'জনে মিলিয়া যখন যাহা করিয়াছে সব মনে পড়িল, শরীর রোমাঞ্চিত হইল, চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল! মনে হইল তা'র সুখের স্বপ্ন এত শীঘ্র জন্মের মত ভাঙ্গিয়া গেল—চিরদুঃখিনী সে, আর কি সে সুখের দেখা পাইবে?

ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাহার মনে পড়িল যে এই দানপত্র সম্বন্ধে তা'র একটা মস্ত কর্ত্তব্য আছে সেটা অবিলম্বে সারিয়া ফেলিয়া নগেনের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ একেবারে চুকাইয়া ফেলা দরকার। বাড়ীখানা নগেনকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। নগেনকে কি? একটু ভাবিয়া শুভা একটু হাসিল, স্থির করিল, নগেনকে নয় তা'র স্ত্রীকে বাড়ীখানা ফিরাইয়া দিবে। তাহার স্বামীটি সম্বন্ধে সরল-হৃদয়া চপলাকে একটু সজাগ করিয়া দেওয়া সে আবশ্যক মনে করিল। কলিকাতা সহরের সব মেয়েমানুষ যে শুভার মত উদারচিত্ত নয়, সে কথা বুঝিতে তা'র কষ্ট হইল না।

কি করিয়া বাড়ী ফিরিয়া দিতে হইবে তাহা সে জানিত না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল কোনও উকীলকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবে। উকীল জগতে কেবল একটী প্রাণীর সঙ্গে তার

জানা ছিল, সে চাঁপার সেই দেওর—পুলিসকোর্টের উকীল। তাহার সঙ্গে দেখা করিবে বলিয়া সে ড্রাইভারকে পুলিসকোর্টে যাইতে বলিল।

তখন লালবাজারে পুলিসকোর্ট ছিল। শুভার গাড়ী সে খানে আসিয়া থামিলে সে দেখিল যে ব্যাপার সে যত সোজা মনে করিয়াছিল তত সোজা নয়। এই একরাশ বেটাছেলের মধ্যে নামিয়া সেই উকীলটীকে সে কেমন করিয়া একলা খুঁজিয়া বাহির করিবে ভাবিয়া অজ্ঞান হইল। এমন সময় হঠাৎ তার গাড়ীর সামনে একটী লোককে সে দেখিতে পাইল, তাহাকে দেখিয়া উকীল বলিয়া মনে হইল। তাহাকে সে ডাকিয়া গাড়ীর ভিতর লইল এবং তাহার সহায়তায় এক এটর্ণী বাড়ী গিয়া সেই দিনই বেলা তিনটার মধ্যে চপলার নামে ঐ বাড়ীর দানপত্র রেজেষ্ট্রী করিয়া দিল। তাহার সঙ্গে নগদ টাকা ছিল না; কিন্তু তাহাতে কোনই অসুবিধা হইল না। সে তাহার এই নূতন বন্ধুটীর সাহায্যে তাহার গলার বহুমূল্য হারটী বেচিয়া ৫০০৲ টাকা সংগ্রহ করিল। তার মধ্যে তাহার সমুদয় খরচ খরচা প্রায় তিনশো টাকা লাগিল। তাহার বন্ধু ঠিক উকীল নয়, একটী ব্যারিষ্টারের কেরাণী এবং তিনি শুভার অনভিজ্ঞতার সুযোগে বেশ দু'পয়সা মারিয়া লইলেন। তাহাকে বিদায় দিয়া অবশিষ্ট দুইশত টাকা লইয়া শুভা সিয়ালদহ ষ্টেশন গিয়া দার্জ্জিলিঙ মেলে কলিকাতা ছাড়িয়া গেল।

একা একা এই তার প্রথম পথ চলা। প্রথমে বড় ভয় হইয়াছিল, কিন্তু ক্রমে দেখিতে পাইল যে সে যতটা ভয় করিয়াছিল তেমন ভয়ের বাস্তবিক কোনও হেতু নাই। পরের দিন সে জলপাইগুড়ি আসিয়া নামিল, এবং একখানা ঠিকাগাড়ী করিয়া তাহার পিসতুত ভাই সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী গেল।

সতীশ তা'র এখনকার মধ্যে নিকটতম পুরুষ আত্মীয়। শুভার একটি বড় বোন আছে, কিন্তু সে পরাধীন, তা'র কাছে গিয়া তাহাকে বিব্রত করাটা শুভা সঙ্গত মনে করে নাই। সতীশ তা'র বাল্যসুহৃদ। ছেলে বেলায় দু'জনে এক সঙ্গে মানুষ হইয়াছে, কারণ সতীশ শুভার বাপের কাছে থাকিয়া লেখাপড়া করিত। এখানে সে এখন সামান্য বেতনে চা বাগানে কেরাণীগিরী করে। শুভার মনে মনে আশা হইল যে সতীশের আশ্রয়ে থাকিয়া সে নিজে শিক্ষাদান করিয়া কিছু উপার্জ্জনের জোগাড় করিতে পারিলে, বাকী জীবনটা নির্ব্বিঘ্নে কাটাইয়া দিতে পারিবে।

বলা বাহুল্য, শুভা ভুল বুঝিয়াছিল। তাহার কুকীর্ত্তির কথা সতীশের অজানা ছিল না। যে রমণী কুলত্যাগিনী হইয়াছে তাহাকে গৃহে স্থান দিতে কোন গৃহস্থ পারে? অবশ্য সতীশ শুভার বাপের অন্ন খাইয়াছে, সে শুভার জন্য অনেকটা করিতে বাধ্য, কিন্তু, তা'র বাপ বাঁচিয়া থাকিলেও তো আজ তাহাকে ঠাঁই দিতেন কি না সন্দেহ; বাপের চেয়ে বেশী সে কি করিতে পারে? তবে কি শুভা অকূলে ভাসিয়া যাইবে—অর্থাৎ সে কি আবার কলিকাতায় ফিরিয়া বেশ্যাবৃত্তি করিবে? সতীশ বরঞ্চ শুভাকে খুন করিবে তবু তাহা করিতে দিবে না।

"তবে আমি কি ক'রবো?" দারুণ হতাশায় শুভা এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। সতীশ মাথা চুলকাইতে লাগিল। সে কথার সে কি জবাব দিবে? 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।' ধর্ম্মের পথ ছাড়িয়া কখনো কাহার সুখ হয় না। এখন ভরা ডুবাইয়া সতীশকে উপায় করিতে বলিলে কি হইবে? কিন্তু তাই বলিয়া সে শুভাকে আবার বাহির হইয়া যাইতে দিতে পারে না। তার ঘরে স্থান দেওয়া, সে

তো অসম্ভব। সে ছা'পোশা মানুষ, স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া ভদ্রপল্লীতে বাস করে শুভাকে ঘরে রাখিয়া সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া?

খড়ের কয়খানি ঘর লইয়া সতীশের বাড়ী। তা'র অন্দর ও বাহিরের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়াইয়া ভাই বোনের এই কথা বার্ত্তা হইতেছিল। সতীশ তাহাকে ভিতরেও ডাকিতে সাহস পাইতেছিল না, বাহিরেও রাখিতে পারিতেছিল না। মোটের উপর শুভার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিবে কিছুই সে ঠিক করিতে পারিতেছিল না।

তখন বেলা প্রায় দশটা। শুভা কাল সকাল হইতে কিছু খায় নাই, মাথা ঝিম ঝিম করিতেছিল। তার উপর এই রকম অপ্রত্যাশিত নিরাশার বাণী শুনিয়া সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে বলিল, "আমার গা কেমন ক'রছে আমায় একটু ব'সতে দেও, তা'র পর যা' হয় করো'। বলিয়া সে একখানা ঘরের ছায়ায় বসিয়া পড়িল, তা'র পর সেই খানেই মাটিতে লুটাইয়া পড়িল; তাহার ভয়ানক মাথা ঘুরিতেছিল, এক মুহূর্ত্তের জন্য তা'র বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইল।

"আহা—হা—হা" করিয়া সতীশ তখন তাহার মাথার কাছে গিয়া বসিল, তাহার স্ত্রীকে ডাকিয়া জল আনিতে বলিল, স্বামী-স্ত্রীতে শুশ্রূষা করিয়া তাহাকে অনেকটা সুস্থ করিয়া, স্ত্রীর পরামর্শে সতীশ আপাততঃ শুভাকে ঘরের ভিতর লইয়া যাওয়াই স্থির করিল। সতীশের স্ত্রী তাহাকে খানিকটা দুধ গরম করিয়া খাওয়াইলে শুভা একটু সুস্থ বোধ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

সতীশের নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও তিন দিনের জন্য শুভাকে তাহার ঘরে রাখিতে হইল। এই তিন দিন স্বামী-স্ত্রীতে অনেক পরামর্শ করিল, কোনও সিদ্ধান্ত করিয়া উঠিতে পারিল না। শুভাকে বাড়ীতে রাখা অসম্ভব; অথচ সে যদি সতীশের ভগিনী পরিচয়ে এখানেই বেশ্যাবৃত্তি

করিতে বসিয়া যায় সেও তো মাথা কাটা যাইবার কথা। লোকে যদি জানে যে সতীশের এক ভগ্নী বেশ্যা সেই তো একটা ভীষণ লজ্জার কথা! তিন দিন ভাবিয়া সে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। তাই চতুর্থ দিনে শুভা যখন কলিকাতা ফিরিবার প্রস্তাব করিল, তখন সে নাচার হইয়া তাহাকে বিদায় দিল। শুভা আবার কলিকাতায় ফিরিয়া গেল।

পথে সে আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। তার বুক ঠেলিয়া কেবলি কান্না আসিতে লাগিল। এত বড় সংসারটায় সে এত একা, তাই ভাবিতে তার বুক ফাটিয়া গেল। কেহ তাহার আপনার নাই, কাহারও কাছে সে আশ্রয় পাইবে না। একবার মনে হইল তা'র স্বামীর কথা। তার কাছে অন্ততঃ সে তো আশ্রয় পাইয়া ছিল। স্বামী যতই কেন অনাদর করুক না, তাহাকে তো এমন করিয়া নিরাশ্রয় হইয়া পথে দাঁড়াইতে হয় নাই? তার কেন দুর্ম্মতি হইল, সে কেন গৃহত্যাগ করিতে গেল? সতীশের কাছে সে শুনিয়াছিল যে তাহার গৃহত্যাগের পর নিবারণ নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে। তবে তো তার গৃহত্যাগ বেচারার প্রাণে বড় লাগিয়াছে। মনে হইল যে, তাহার স্বামী তাহাকে একেবারে ভালবাসিত না এমন নহে। মাঝে মাঝে তাহাকে ভাল কাপড় চোপড় কিনিয়া দিয়া নিবারণ তাহাকে সাজাইত সে কথা মনে পড়িল। মাঝে মাঝে যখন তাহার সখ হইত, তখন সে আদর করিত তাহাও মনে পড়িল। আর বিশেষতঃ যখন কেহ তাহাকে কোনওরূপ অপমান বা নিন্দা করিত বা কোনও কারণে যদি কাহারও সঙ্গে তাহার ঝগড়া বাঁধিত তখন যে নিবারণ তাহার পক্ষ লইয়া কি বিষম ঝগড়া করিত, সেকথা খুব ভাল করিয়া মনে পড়িল। শুভার তপ্ত পীড়িত নিরাশ্রয় হৃদয় তাহার বিবাহিত জীবনের সুখের এই ক্ষুদ্র

কুঁড়াগুলি কুড়াইয়া অমৃত প্রাশ রচনা করিতে চেষ্টা করিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, গৃহত্যাগ করিয়া সে অতি অপকার্য্য করিয়াছে। বিশেষতঃ তা'র কর্ত্তব্যের যে গুরুতর ক্রটি হইয়াছে এই কথাই তাহাকে অধিক পীড়া দিতেছিল। তাহার জন্য একটি লোকের জীবন যে একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে—সে যে তাহাকে পাইয়াই পড়াশুনা ছাড়িয়া জীবনের সকল উন্নতির আকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়া দিয়াছিল, আর তাহাকে হারাইয়া বিবাগী হইয়া গিয়াছে এই কথা স্মরণ করিতে তাহার বড় বেদনা বোধ হইল।

ধীরে ধীরে তাহার মনে আর একটা ছবি ভাসিয়া উঠিল—সে নগেনের। তার তিনদিনের সুখের সাম্রাজ্য! তা'র কাছে তার দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের সকল সত্য ও কল্পিত সুখ সৌন্দর্য্য মলিন হইয়া গেল। সে অনেক্ষণ ধ্যনস্থ হইয়া মনে মনে সেই তিন দিনের পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিল। কেন সে সুখ ভাঙ্গিল? সে আপনি ইচ্ছা করিয়া সে সুখের প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে সত্য, কিন্তু সে ইচ্ছা না করিলেও যে ভাঙ্গিত তা তো সে পরের দিনের ঘটনাতেই বুঝিতে পারিয়াছে। কেন সে সুখ ভাঙ্গিল? নগেন তাহাকে ভালবাসে, সেও নগেনকে ভালবাসে সে ভালবাসার যে জোড়া নাই। কিন্তু তবু নগেন তা'র কেউ নয়—কি না তার এক ফোঁটা এক স্ত্রী কোথা হইতে আসিয়া জবরদস্তী করিয়া শুভার প্রাপ্য রাজ্য জুড়িয়া বসিয়াছে। বিধাতার অন্ধ বিচারে শুভাকে জুড়িয়া দিয়াছে নিবারণের সঙ্গে, আর নগেনকে দিয়াছে চপলার হাতে। দুজনেরই একটা স্বত্ব সমাজ স্থির করিয়া দিয়াছে। এ কি অবিচার!—ভালবাসার জগতে সে নগেনের আর নগেন চিরদিনই তার। হাঁ নগেন তারই, কিন্তু তবু সে অতি পর! সে কি আর কখনও তাকে পাইবে?

শুভা বুঝিল নগেনকে পাওয়া না পাওয়া তা'র হাত। একবার মনে হইল, "কেন আমি তাকে ছাড়বো? কখনও তা'কে ছাড়াবো না।" স্থির করিল কলিকাতায় যাইয়াই সে নগেনকে চিঠি লিখিবে।— আবার তা'র মহত্তর সত্তা জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে বুঝাইল যে, সে অসম্ভব। সেচ্ছায় সে যাহা চপলাকে দিয়াছে তাহা সে ফেরত লইবার চেষ্টা করিতে পারে না।

সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে সে আবার সেই আদি প্রশ্নে ফিরিয়া আসিল, এখন সে কি করিবে? কোথায় যাইবে? স্বামীর আশ্রয় জন্মের মত গিয়াছে, নগেনের আশাও আকাশ কুসুম। বাকী এক চাঁপা —অর্থাৎ সুরেশবাবু! তার কথা মনে হইতেই মন ভয়ানক বিরক্ত হইয়া উঠিল। সে ভ্রূকুঞ্চিত করিল। তবে সে যাইবে কোথায়, কাহার আশ্রয়ে থাকিবে?

ট্রেণ তখন সারা ব্রিজের উপর দিয়া চলিয়াছে। গাড়ীতে বাজনা বাজিতে লাগিল ঝম্ ঝম্ ঝম্। নীচে পদ্মার শান্তশীতল বিশাল বক্ষ দিগন্ত বিস্তৃত হইয়া বহিয়া চলিয়াছে—সে যেন হাত ছড়াইয়া শুভাকে আহ্বান করিতে লাগিল। শুভা যেন তা'র প্রশ্নের উত্তর শুনিতে পাইল বাজনার তালে তালে নদী বলিতেছে, "এস আমার শীতল বক্ষে, চিরজন্মের নিরুদ্বেগ আশ্রয় লইয়া আমি তোমার জন্য বসিয়া আছি।" শুভা উঠিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্তের জন্য তার সমস্ত জ্ঞান লুপ্ত হইল, যন্ত্রচালিতের মত সে গাড়ীর দরজার কাছে গেল, দুয়ার খুলিবার জন্য হাতলে হাত দিল— তখন একবার সে ভাবিল, "এক লাফ দিলেই তো জন্মের শোধ সকল দুঃখ সকল দুশ্চিন্তার শেষ! কেন সব শেষ করিব না? কিসের জন্য এ জীবন?"

সেই তার পুরাতন প্রশ্ন? কিসের জন্য এ জীবন? শুভার চমক

ভাঙ্গিল। সব পুরাতন কথা তা'র মনে হইল। জীবন সার্থক করিতে হইবে—মানুষ হইতে হইবে, এই পণ করিয়া সে বাড়ীর বাহির হইয়াছে। কিন্তু করিতেছে কি? ঘরে স্বামীর প্রভুত্ব ছাড়িয়া নগেনের প্রভুত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে গিয়াছিল। সেখানে বিমুখ হইয়া সে গিয়াছে সতীশের আশ্রয় লইতে। আজ তা'কে সুরেশের আশ্রয়ে যাইতে হইবে বলিয়া সে জীবন বিসর্জ্জন দিতে অগ্রসর হইয়াছে। কেন, পুরুষের আশ্রয় ছাড়া কি স্ত্রীলোকের চলে না? তাই যদি হয় তবে তার স্বামী কি দোষ করিয়াছিল? আশ্রয় যদি চাও, যদি পুরুষকে ছাড়া তোমার না চলে, তবে সে আশ্রয়ের দাম দিতে হইবে। সবাই সমান দাম চায় না, এক রকম দামও চায় না, কেউ কম, কেউ বেশী; কিন্তু দাম চাই—সে দাম পরাধীনতা, প্রভুত্ব স্বীকার, নিজের আত্মার স্বতন্ত্রতা অস্বীকার! এই না স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধের মূল কথা। নারী মনে করে সে দীনা ক্ষীণা অবলা, তাই না পুরুষের এই আধিপত্য?

এই কথায় তার সকল ভাবনা চিন্তা এক নূতন ধারায় প্রবাহিত হইল। নারীর স্বাধীন সত্তা কি অসম্ভব? পুরুষের ঘাড়ে না চড়িয়া কি নারী জীবনে সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। কেন পারিবে না? মনে পড়িল চাঁপার কথা, আর মাদার ক্রিশ্চিয়ানার কথা। মাদার ক্রিশ্চিয়ানার গরীয়ান চরিত্রের কথা যতই সে মনে ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার নিজের উপর শ্রদ্ধা বাড়িতে লাগিল, আত্মশক্তির উপর নিষ্ঠা জন্মিতে লাগিল। সে স্থির করিল সে আপনার পায়ে দাঁড়াইয়া আপনার শক্তিতে আপনার জীবন সার্থক করিবে—পুরুষের অধীনতা স্বীকার করিয়া তাহার আশ্রয় কামনা করিবে না। সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ জাতির উপর একটা দারুণ বিদ্বেষ তাহার মনের ভিতর গড়িয়া উঠিতে লাগিল।

শুভা অনেক ভাবিল। যতই ভাবিল ততই তার মনের ভিতর এই ভাবটা শিকড় গাড়িয়া বসিয়া যাইতে লাগিল। নারীর স্বাতন্ত্র্যের দিক দিয়া সে জগৎকে এক নূতন চক্ষে দেখিতে লাগিল। তা'র যত পুরাতন সংস্কার ছিল সব যেন এ দৃষ্টিতে ওলট পালট হইয়া গেল। এতদিন সে যত কিছু ভাবিয়াছে তার ভিতর সে একটা কথা তা'র নিজের অজ্ঞাতসারে আগাগোড়া স্বীকার করিয়া গিয়াছে, তাহা নারীর পুরুষের উপর একান্ত নির্ভর! এই কথাটা স্বীকার করিয়া লইলে পুরুষ ও নারীর বর্ত্তমান সম্বন্ধটা, মোটের উপর অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু শুভার মনের দৃষ্টি একেবারে সম্পূর্ণ ঘুরিয়া গিয়াছিল। সে নারীর স্বাতন্ত্র্যের দৃষ্টিক্ষেত্র হইতে স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ আলোচনা করিয়া তা'র মধ্যে কিছুই ভাল দেখিতে পাইল না। যে প্রেম তা'র জীবনকে এত সরস করিয়া তুলিয়াছিল, সেই নগেনের ভালবাসাও তা'র কাছে একটা নিন্দনীয় বস্তু হইয়া উঠিল। নগেন তাহাকে ভালবাসিত; কিন্তু তা'র মানে কি? শুভার জন্য সে অনেক পয়সা খরচ করিয়াছে, তাহাকে অনেক আদর করিয়াছে, কিন্তু সেই সমস্ত তলাইয়া আজ শুভা দেখিতে পাইল তাহার মধ্যে শুধু পুরুষের পর্ব্বত প্রমাণ অহঙ্কার। শুভাকে কে ভাল চক্ষে দেখিয়াছিল, তার মধ্যে এমন কিছু দেখিয়াছিল যাতে সে নগেনের কাছে পৃথিবীর অন্য সব মেয়ের চেয়ে বেশী দামী হইয়া উঠিয়াছিল। এমন দামী জিনিসটা যে তা'র নিজস্ব এই গর্ব্বটাই নগেনের সমস্ত আদর যত্নের মূল বলিয়া আজ শুভার মনে হইল। তা'র মনে পড়িল ছেলে বেলার কথা, যখন তা'র নিজের বেড়ালছানাটাকে কেউ সুন্দর বলিলে গর্ব্বে তা'র বুক ফাটিয়া যাইত। ঠিক তেমনি নগেনের মুখে তাদের নিজের ঘোড়া, নিজের বাড়ী, নিজের মোটর, নিজের চশমাটির বিষয়ে পর্য্যন্ত একটা

গর্ব্ব সে লক্ষ্য করিয়াছে এবং দেখিয়াছে তাহার এই সব প্রশংসিত জিনিসের উপর তা'র যত্নের অবধি ছিল না। শুভার উপর যত্নও কি সেই স্বত্বাধিকার মূলক অভিমানের আর একটা প্রকাশ মাত্র নয়। একটা ঘোড়া কি গরুতে পুরুষের যে মমতা, মেয়ে মানুষ, অর্থাৎ নিজের নিজস্ব এবং সম্পূর্ণ পরাধীন যে স্ত্রীলোক তা'র উপর আদর যত্ন তা'র চেয়ে স্বতন্ত্র পংক্তিতে বলিয়া শুভার আজ মনে হইল না।

ভাবিতে ঘৃণায় তাহার মন ভরিয়া উঠিল। একটা পুরুষের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইয়া, তা'র অভিমানের ইন্ধন জোগাইয়া সে যে জীবনকে সার্থক মনে করিয়াছিল তাই ভাবিতে তার হৃদয় ধিক্কারে পূর্ণ হইল। এই ক্ষীণ আত্মাদর লইয়া সে মনুষ্যত্ব দাবী করিতে স্পর্দ্ধা করিতেছে! আপনার উপর শ্রদ্ধা তার এত অল্প এই কথা ভাবিতে আজ তা'র লজ্জা বোধ হইল। সে খুব জোর করিয়া বলিল "ছি, ছি, ছি!"

প্রবল ধিক্কারের সহিত তাহার মন আজ সমস্ত পুরুষ জাতিকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া কতকটা স্বাধীন ভাবে তার আপনার সত্তাকে অনুভব করিল। ইহাতে তাহার প্রাণের ভিতর একটা প্রবল শক্তির সাড়া পাইল। সে মনে মনে স্থির করিল, আপনার পায়ে দাঁড়াইয়া সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে বুঝিয়া মানুষ হইতে হইবে! না পারে তবে তার গলায় দড়ি। আর কখনও কোনও পুরুষের আশ্রয় কামনা করিবে না।

কথাটা মুখে বলা যত সহজ কাজে করা তত সহজ নয় তাহা সে তখনই বুঝিতে পারিল। স্বামীর গৃহ ছাড়িয়া অবধি তাহার সংসার সম্বন্ধে একটা অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে। সে জানিয়াছে যে, অন্ততঃ এ দেশে, মেয়ে মানুষের পক্ষে স্বতন্ত্র ভাবে টিকিয়া থাকাই কঠিন, আপনা আপনি মানুষ হওয়া তো কোন ছার! তাই সে এখন গভীর

ভাবে নিজের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে লাগিল। সে দেখিতে পাইল যে অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব তা'র কাটীয়া গিয়াছে, সে অনেকটা নির্ভয়ে খুব জোরের সহিত নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিল।

[১১]

দুপুর বেলায় চাঁপা আহারাদি করিয়া মুখ ধুইয়া উপরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় দুয়ার ঠেলিয়া বাড়ীতে ঢুকিল—শুভা। নগেন তাহাকে যে সাজে সাজাইয়া দিয়াছিল শুভা ঠিক সেই শাড়ী, সেই জামা, সেই জুতা, সেই গহনা পরিয়াছিল, কেবল ছিল না তার সেই হার। খুব মূল্যবান্ পোষাক, কিন্তু পাঁচ দিনের অনবরত ব্যবহারে ময়লা ও এলোথেলো হইয়া গিয়াছে। তার চেহারাও অনেকটা এলোথেলো কিন্তু দৃপ্ত, উজ্জ্বল।

চাঁপা একদণ্ড চাহিয়া রহিল। তার মনটা নানা কারণে বিষ হইয়া উঠিল। মাগী যে অপকর্ম্ম করিয়া আবার বাড়ী বহিয়া তা'র মেকী ঐশ্বর্য্য দেখাইতে আসিয়াছে তাহাতে তাহার ঘৃণা হইল। সে মুখ ফিরাইয়া সিঁড়িতে উঠিতে লাগিল।

শুভা ডাকিয়া বলিল, "চাঁপা, ভাই, একটু দাঁড়াও, আমি তোমার কাছে ফিরে এসেছি, আবার কয়েকটা দিনের জন্ম আমায় আশ্রয় দেও।"

চাঁপা মুখ ফিরাইয়া, ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "কেন? আর কি মরবার জায়গা পেলে না? যে চুলোয় গিয়েছিলে সেখানে ঠাঁই মিললো না? বাজারে কি দড়ি কলসী জুটলো না?"

শুভা হাসিয়া বলিল, "সব মিলেছিল দিদি, কিন্তু তবু তোমার অন্ন না হ'লে আমার রুচলো না বলে এলাম। তোমার বাড়ীতে খেটে খাব, তা' কি আমায় থাকতে দেবে না।"

"না গো বাবু, আর মিঠে কথায় কাজ নেই, এখন বিদেয় হও!"

"বিদেয় হ'য়ে কোথায় যাব? জানতো আমার কেউ নেই।"

"সোজা গঙ্গায় যাও। পয়সা না থাকে দিচ্ছি, একগাছ দড়ী আর একটা কলসী কিনে নিয়ে যাও। বেরোও।"

শুভার কান্না পাইল, সে চোখের জল আটকাইতে পারিল না। চোখে আঁচল দিয়া খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। চাঁপাও তা'র দিকে এক দৃষ্টে নীরবে চাহিয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে চোখ মুছিয়া শুভা মুখ ফিরাইয়া দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইল।

চাঁপা তখন ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। রুদ্ধ অভিমান ছাড়া পাইয়া চোখ ফাটিয়া জল ছুটিল। সে বলিল "যাবি কোথায় পোড়ারমুখী! তোকে আমি ছাড়তে পারলে তো? তুই আমায় এমন ক'রে কাঁদাস কেমন করে রে মুখপুড়ি!"

তখন দু'জনে চোখের জলের ভিতর দিয়া হাসিল। চাঁপা তাড়াতাড়ি শুভাকে স্নান করাইয়া খাওয়াইল, তার পর দু'জনে বসিয়া গল্প করিতে লাগিল।

সে অনেক কথা। কথায় কথায় তাহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ বোঝাপড়া হইয়া গেল। শুভা যে কি দারুণ ভুল বুঝিয়াছিল শুনিয়া তাক লাগিয়া গেল। এখন সে কথায় হাসি পাইল। কি বোকা শুভা!

চাঁপার সব কথা শুভা শুনিল। শুভা পলাইয়া যাওয়ায় চাঁপাকেই বাধ্য হইয়া এলবার্ট থিয়েটারে সুশীলার পার্ট লইতে হইয়াছে। সব তৈয়ার হইয়াছে, তিন দিন পর নূতন নাটক এলবার্ট থিয়েটারে অভিনীত হইবে, কিন্তু তার মধ্যে এক বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কমলা থিয়েটারের ম্যানেজার অতুল বাবু চাঁপা ও সুরেশ

বাবুর নামে হাইকোর্টে নালিশ করিয়াছে। অতুল বাবু বলে যে চাঁপা নাকি অতুলের সঙ্গে চুক্তি করিয়াছিল যে পাঁচ বছর সে কমলা থিয়েটারে অভিনয় করিবে। সেই চুক্তি ভঙ্গ করিয়া চাঁপা এলবার্ট থিয়েটারে অভিনয় করিতে উদ্যোগ করিতেছে বলিয়া অতুল বাবু চাঁপার উপর স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য নালিস করিয়াছে, সুরেশ বাবুর নামে ড্যামেজের নালিশ হইয়াছে। সেই মোকদ্দমার শুনানী না হওয়া পর্য্যন্ত যাহাতে চাঁপা এলবার্ট থিয়েটারে অভিনয় না করিতে পারে সেজন্য অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করিয়া একখানা দরখাস্তও করিয়াছে। সেই দরখাস্তের শুনানী কাল হইবে।

দু'জনে কথাবার্ত্তা হইতে হইতে সুরেশ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি খুব ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আসিয়াছিলেন, চাঁপাকে কিছু জরুরী কথা বলিতে, কিন্তু শুভাকে সম্মুখে দেখিয়া সে সব কথা তখনকার মত ভুলিয়া গেলেন।

"এই যে সুরবালা! বলি তোমার কি কোনও জিন পরীর সঙ্গে আলাপ আছে। থেকে থেকে এমন বেমালুম ডুব মার কি ক'রে বল দিকিন।"

শুভা হাসিল। তিন জনে মোকদ্দমা-মামলার কথা আলাপ হইল। শেষে চাঁপা বলিল, "তবে সুরেশ বাবু, এখন আমায় ছেড়ে দিন; আপনার সুরবালা তো এসে পৌঁছেছে এখন আমাকে আমার অতুলের হাতে ছেড়ে দিন, মামলা-মোকদ্দমা মিটে যাক।"

সু। সে কি হয়? প্লে হ'তে আর মোটে তিন দিন বাকী এর ভিতর কি সুরবালা ঐ পার্ট তয়ের ক'রতে পারবে?

চাঁ। বাজী ফেলুন। আমি ওকে শিখিয়েছি তো, আমি জানি। তিন দিনে ও যা পারবে তিন মাসে আমি তা' পারবো না।

শুভা। আহা চাঁপার যা' কথা! আমি একদিন ষ্টেজে নামলুম না, আমি নাকি ঐ পারি!

কিন্তু তার খুব প্রবল ইচ্ছা হইতেছিল যে সুরেশ বাবু চাঁপার প্রস্তাব গ্রহণ করুক। সুরেশ বাবু বলিলেন, "তা ছাড়া, অতুল যখন মামলা ক'রেছে তখন আমি তা'কে ছাড়তে পারি না! তার মামলা আগাগোড়া মিথ্যা, আর এটর্ণী বলেছেন এ মোকদ্দমা তার কিছুতেই টিকবে না। বাছাধনের কাছ থেকে ঠুকে খরচটা আদায় করে নি, তার পর দেখা যাবে সুরবালাকেই রাখি কি তোমাকেই রাখি।"

এ বিষয় অনেকক্ষণ বাদানুবাদের পরে স্থির হইল যে আজ হইতে শুভা রিহার্সালে যাইবে। যদি কোনও ক্রমে চাঁপাকে আদালত হইতে আটকাইয়া ফেলে তবে, যদি পারে, তবে শুভাই সুশীলার পার্ট করিবে।

শুভা তৈয়ার হইতে লাগিল।

পরের দিন চাঁপা হাইকোর্টে গেল। বৈকালে ফিরিয়া সংবাদ দিল দু'পক্ষের সাওয়াল জবাব হইয়া গেল, কিন্তু জজ আজ রায় দিলেন না; কাল রায় হইবে। চাঁপা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কি ঘেন্না মাগো! ওই অ'তলো'টা একটা দলিল ক'রেছে তাতে নাকি আমি সই করেছি। মিথ্যে, মিথ্যে, আগাগোড়া মিথ্যে। ভদ্র লোকের ছেলে আদালতে দাঁড়িয়ে এমনি সটান মিথ্যে বলে যায় কি করে? মাগো!"

পরের দিন অসম্ভব সম্ভব হইল। সুরেশ বাবু অতুলের কাছে খরচা তো পাইলই না, বরং চাঁপার উপর আপাততঃ অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারী হইয়া গেল। সুরেশ বাবু ভারী চটিয়া গেলেন। তাঁহার এটর্ণী ও ব্যারিষ্টারকে বলিলেন, "এমন অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা কিছুতেই হইতে

পারে না। চুক্তি প্রমাণ হইলে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা হইলেও হইতে পারে, কিন্তু অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা তো এ অবস্থায় একদম বে-আইনী।" সুরেশ বাবু আপীল করিতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেলেন। চাঁপা বলিল, "আপনার সুশীলা তো তৈয়ার আছে, আর কাজ কি হাঙ্গামায়।" কিন্তু সুরেশ বাবু তাহাতে মানিলেন না। আপীল রুজু হইল।

অতুলবাবুর লম্ফ ঝম্ফ দেখে কে? এলবার্ট থিয়েটারের এই নূতন নাটক লইয়া খুব আলোচনা হইতেছিল, একটা প্রকাণ্ড রকম কিছু হইবে লোকের এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল। সেটা এখনকার মত একদম মাটি হইয়া গেল ভাবিয়া অতুলবাবু নিশ্চিন্ত মনে গোঁফে চাড়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু পরের দিন সকাল বেলায় হ্যাণ্ডবিলে আবার এলবার্ট মহাসমারোহে নূতন নাটক "সুশীলা"র অভিনয়ের সংবাদ দেখিয়া তিনি কিছু বিস্মিত হইলেন। নিজে সেদিন এলবার্ট থিয়েটারে গেলেন।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় হইয়া গেল। শুভার অভিনয়ে সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। দিনের পর দিন "সুরবালার" অভিনয় দেখিবার জন্য এলবার্ট থিয়েটারে লোকে লোকারণ্য হইতে লাগিল। সকলেই বলিল, চাঁপা বা চারুর এ অভিনেত্রীর সঙ্গেই কোনও রকম তুলনাই হয় না।

অতুলবাবু বড় চটিয়া গেলেন।

[১২]

নগেন সেদিন রাত্রে সটান শ্বশুর বাড়ী গিয়া হাজির হইল। শ্বশুর শালা শালী সবাই তার রকম সকম দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। সবাই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নানা রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল, নগেন কোনও জবাব দিল না; কেবল মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল।

তার মনের ভিতর নানা রকম ঝড় বহিতেছিল। সে তুমুল জটিল

ভাব প্রবাহের সম্যক পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পরস্পর বিরুদ্ধ নানা তীব্রভাব ওলট পালট খাইয়া তার মনটা তোলপাড় করিতে- ছিল। একই সঙ্গে দুই তিনটা চিন্তাস্রোত তার মনের ভিতর ধাক্কা- ধাক্কি করিতেছিল। প্রথম, তা'র দুর্দ্দমনীয় লজ্জা বোধ হইতেছিল। কি করিয়া ইহার পর সে তার দাদাদের কাছে আর তার বন্ধুবান্ধবদের কাছে মুখ দেখাইবে তাই ভাবিতে অস্থির হইতেছিল। মনে হইতেছিল, সেই মুহূর্ত্তে যদি সে কোনও উপায়ে একেবারে অদৃশ্য হইয়া যাইতে পারিত তবেই ভাল হইত। সঙ্গে সঙ্গে ভারি রাগ হইতেছিল তার মেজদার এই অনধিকার প্রবেশে। সে যে কাজটা অন্যায় করিয়াছে সে কথা সত্য, কিন্তু তাতে মেজদার কি? আর যদিই বা তার কিছু হয় তাই কি এমনি করিয়া এই সব কাণ্ড করিতে হয়? তার সঙ্গে লুকোচুরী করিয়া গোপনে গিয়া একেবারে শুভাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দেওয়া! কাজটা যে অতি গর্হিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে কি সন্দেহ আছে? তা ছাড়া বাড়ী শুভার—শুভাকে দিয়া যদি মেজদার নামে একটা নালিশ করিয়া দেওয়া যায় তবেই মেজদার আক্কেল হয়। এইখানে হঠাৎ মনে হইল শুভা গেল কোথায়? তাই চিন্তা করিতে করিতে সে অনেক দূর চলিয়া গেল।

এই রকম এলোমেলো ভাবে নানা রকমের চিন্তা তার মনটাকে ভীষণ ভাবে নাচাইতে লাগিল। কিন্তু সবার উপর তার মনে একটা দারুণ জ্বালা বোধ হইতে লাগিল। ইহাতে সে এই ভাবিয়া একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিল যে সে বাস্তবিক লোকটা ভাল, কেননা অন্যায় কাজ করিয়া সে এতটা অনুশোচনা বোধ করিতেছিল। একথা তাহার মনে হইল না যে এই বেদনা ঠিক খাঁটি বিবেকদংশন নয়। ধরা পড়ার লজ্জাটা অনেক সময় এই রকম মেকী অনুতাপরূপে দেখা দেয়,

তার সঙ্গে আসল অনুতাপের আকাশ পাতাল তফাৎ। চুরী করিতে ধরা পড়িয়া আপ্‌শোষ না করে এমন চোর নাই, কিন্তু এ আপ্‌শোষ খাঁটি অনুতাপ নয়।

যাই হউক তার দুঃখ হইতেছিল, বড় রাগ হইতেছিল নিজের উপর। কেমন করিয়া সে এত কাণ্ড-কারখানা করিয়া বসিল? চপলার কাছে সে এখন কি বলিয়া মুখ দেখাইবে, তাকে কি বলিবে? সারাক্ষণ সে এই ভাবিতেছিল। সরলা বালিকার তার উপর এত ভালবাসা এত অগাধ বিশ্বাস—সে তার কি প্রতিদান দিয়াছে? চপলার মনে যে সে কত বড় দাগা দিয়া বসিয়াছে তাই ভাবিতে সে মনে মনে সত্য সত্যই বিষম বেদনা বোধ করিল।

আর একটা শঙ্কা ও বেদনা তাকে পীড়া দিতেছিল। সে শুভার কথা। সে কোথায় গিয়াছে, কি করিতেছে? সে যে অসহায়, কত দুঃখী তাহা নগেন জানিত। সে ইহাও জানিত যে শুভাকে ঘরের বাহির করিয়া নিরাশ্রয় করিবার জন্য সেই দায়ী। তা' ছাড়া সে শুভাকে সত্য সত্যই ভাল বাসিত। তাই শুভার কথা ভাবিতে তার শঙ্কায়, বেদনায় বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল।

যখন চপলা নগেনের কাছে আসিল তখন নগেনের বুক ভীষণ কাঁপিতেছিল। দণ্ডিত অপরাধী তার শাস্তার কাছে দাঁড়াইয়া যে আতঙ্ক বোধ করে নগেন এই ছোট্ট হাস্যময়ী বালিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তেমনি আতঙ্কে পীড়িত হইতেছিল। স্বামীর মুখ দেখিয়া চপলার হাসি মিলাইয়া গেল, সে বলিল, "ও কি, তোমার কি হ'য়েছে?"

কাতর ঔৎসুক্য ও অনুনয়ের দৃষ্টি নগেনের মুখের উপর রাখিয়া সে নগেনের দু'টি হাত ধরিয়া দাঁড়াইল।

নগেন এই কথার অনেক উত্তর মুসাবিদা করিয়াছিল, অনেক

বক্তৃতা মনে মনে গড়িয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু তার কিছুই বলা হইল না, সে অন্তরের বেদনায় জর্জ্জর হইয়াছিল, এই স্নেহের প্রশ্নের স্পর্শে একেবারে গলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

চপলার বুক অজ্ঞাত আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল, তা'র চোখও জলে ভরিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি স্বামীর মাথাটা তা'র বুকের কাছে টানিয়া লইয়া সস্নেহে তাহার চোখ মুছাইতে লাগিল, আর কোন প্রশ্ন করিতেও তার সাহস হল না। সে মনের ভিতর কত সব অমঙ্গল কল্পনা করিতে লাগিল যাহা মুখে বলা যায় না।

কিছুক্ষণ বাদে নগেন আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "চপলা, তুমি আর আমায় আদর করো না, তোমার আদর পাবার অধিকার আমার নাই।"

চপলার মুখ শুকাইয়া গেল, তার বুকের ভিতর ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। সে কি ভাবিবে কি বলিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না। নগেন তাহাকে ধরিয়া বসাইল, তার সামনে বসিয়া সে বলিতে লাগিল, "চপলা, তুমি আমাকে এত বিশ্বাস কর এত ভালবাস, কিন্তু আমি তার কি প্রতিদান দিয়েছি জান? এ ক'দিন তোমার কাছে আমি আসিনি কেন জান? তুমি আমার সম্বন্ধে স্বপ্নেও যা ভাবতে পারনি সেই কাজ আমি করেছি।"

বলিয়া সে ক্রমে ক্রমে শুভাসংক্রান্ত সমস্ত ইতিহাস চপলার কাছে বলিয়া ফেলিল। অনেক ভাবিয়া সে এই রকম করাটাই সঙ্গত বোধ করিয়াছিল, কথা গুলি বলিয়া ফেলিয়া মনটা অনেকটা পাতলা বোধ করিল।

চপলার মুখ একদম শাদা হইয়া গেল। সে কাঠ হইয়া সমস্ত ইতিহাস শুনিল, একটিও কথা বলিল না। খানিকক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া সে

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল; সে জানলার দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু কোনও কথা বলিল না।

এটা নগেন হিসাব করে নাই। চপলা কোনও একটা কথা বলিবেই এটা সে ধরিয়া লইয়াছিল। সে যে কি কথা বলিবে, ইহা লইয়া সে অনেক গবেষণা করিয়াছিল, একবার ভাবিয়াছিল, খুব রাগ করিবে, তাকে খুব একচোট 'ন ভূত ন ভবিষ্যতি' রকমের বকুনি দিবে, হয়তো বা তাড়াইয়া দিবে। আবার ভাবিয়াছিল হয়তো সে তাকে একেবারে ক্ষমা করিবে, আর চাই কি প্রভাত বাবুর 'সিঁদুর কৌটা'র বকুরাণীর মত শুভার সঙ্গে তার একটা বিয়ের জোগাড় করিতে বলিবে। এই রকম নানা জল্পনা কল্পনা সে করিয়াছিল। কিন্তু চপলা কিছুই বলিলে না, খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেল।

এ অবস্থায় কি করিতে হইবে নগেনের তাহা মুসাবিদা করা ছিল না, তাই সে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া থপ্ করিয়া চপলার হাত ধরিয়া বলিল, "যাচ্ছ কোথায়? একথা যদি তুমি কাউকে বল তবে আমি গলায় দড়ি দেব।"

চপলা তখন ধপাস করিয়া বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া ভয়ানক কাঁদিতে আরম্ভ করিল। তাহার সমস্ত ক্ষুদ্র হৃদয় মথিত করিয়া বিশ্বজোড়া দুঃখ অজস্র অশ্রুধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু কথা কহিল না। নগেন তাহাকে শান্ত করিবার এক আধটুকু চেষ্টা করিল, কিন্তু রকম সকম দেখিয়া বেশী দূর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। শেষে সে নিতান্ত হতাশ ভাবে একখানা ইজি চেয়ারে শুইয়া পড়িল। এমনি অবস্থায় কখন যে দু'জনে ঘুমাইয়া পড়িল বুঝিতে পারিল না।

পরের দিন সকালে নগেন ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। চাহিয়া

দেখিল সকাল হইয়াছে, চারিদিকে লোকজন কাজ-কর্ম্ম করিতেছে, চপলাও কখন উঠিয়া গিয়াছে। সে অনেক্ষণ গভীর হইয়া বসিয়া গত রাত্রির এবং তাহার পূর্ব্বের সমস্ত কথা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ভাবিতে লাগিল। ভাবিয়া কূল কিনারা পাইল না। সমস্ত অনিশ্চিতের মধ্যে সে কেবল একটি কথা নিশ্চয় করিয়া বুঝিল—চপলার বিশ্বাস ও ভালবাসা সে জন্মের মত হারাইয়াছে; তার ফলে যে তাদের দুইজনের জীবনে কত বিষ জমাট বাঁধিয়া উঠিবে তাহা কল্পনা করিতে তাহার মাথা-ঘুরিয়া গেল।

অনেকক্ষণ পরে উঠিয়া সে পাশের বাথরুমে গিয়া মুখ ধুইতে বসিল। স্থির করিল যে মুখ হাত ধুইয়া আপাততঃ সে চলিয়া যাইবে, আর সহসা এ মুখো হইবে না। কিন্তু যাইবে কোথায়? বাড়ী? সে পথ তার কাছে একেবারে বন্ধ বলিয়া মনে হইল। তবে কোথায় যাইবে? নানারকম উদ্ভট কল্পনা তার মনে উঠিতে লাগিল, কোনওটাই বিশেষ সুবিধাজনক মনে হইল না।

মুখ ধুইয়া যখন সে ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখন পর্য্যন্ত সে কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সে কাপড় পরিতে পরিতে ভাবিতে লাগিল। কাপড় পরিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল এক, থালা খাবার ও চায়ের পেয়ালা হাতে স্মিতমুখে চপলা দাঁড়াইয়া আছে।

হাসিয়া চপলা বলিল, "যাওয়া হ'চ্ছে কোথায়? শুভার খোঁজে না কি?"

চপলার এ মূর্ত্তি দেখিয়া নগেনের মন হইতে যেন একটা পাহাড় নামিয়া গেল। তবু কথাটায় সে হাসিতে পারিল না, একটু বিষণ্ণ মুখে বলিল, "তা' কতকটা বটেই তো, তার একটা খোঁজ করা কি উচিত নয়?"

চপলাও গম্ভীর হইয়া বলিল, "হাঁ তা করবে বই কি, বেচারা একলা

কোথায় কি হ'ল কে জানে? চাই কি জলে ডুবে মরাও বিচিত্র নয়! আমিও তাই ভাবছিলাম। একবার তার খোঁজটা কর। কিন্তু এখনি যেতে হ'বে কি? মা ব'লছিলেন, আজকে এখান থেকেই খেয়ে একেবারে আপিসে বেরোও, তখনি গেলে হ'বে না?"

নগেন অবাক হইয়া গেল, এই কি সেই চপলা? সে নীরবে খাবার খাইতে খাইতে ভাবিতে লাগিল। শেষে চায়ের পেয়ালা হাতে করিয়া বলিল' "চপলা, তুমি আমায় শুভার খোঁজ করতে বলছো! তুমি কি ভাবছো? তোমার যদি তা'তে অনিষ্ট হয় তা' একবার ভাবছো না।"

চপলা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। কি যেন একটা তার গলা চাপিয়া ধরিতেছিল, সে জোর করিয়া সেটাকে নামাইল, তার পর শান্ত-ভাবে বলিল, "না আমার একটুও ভয় নাই।"

"ভয় নাই? চপলা, তোমার আমার মধ্যে আমি একটুও মিথ্যার আড়াল রাখতে চাই না। সত্যি কথা বলবো, আমি শুভাকে এখনো সমান ভালবাসি, আর হয় তো তাকে আবার দেখতে পেলে ঠিক তেমনি আত্মহারা হ'ব, তোমায় ভুলে যাব! আমি আমার নিজেকে আর এক ফোঁটা বিশ্বাস করি না।"

"তাতে আমি ডরাই না।"

"কেন?"

চপলা সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তুমি ঠিক জেনো তুমি চিরদিনই আমারই, আর কারও হ'তে পারবে না"

নগেন স্তব্ধ হইয়া শুনিল, আর কোনও কথা বলিল না। একবার মনে হইল চপলার ঐ ছোট্ট মুখখানি বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে বলে "হাঁ আমি চিরদিনই তোমারই।" কিন্তু মনের ভিতর যে মন সেখানে সে অনুভব করিতেছিল যে কথাটা এখনও সে সত্য বলিয়া

স্বীকার করিতে পারে না। চপলাকে সে প্রাণের অধিক ভাল বাসে সত্য, কিন্তু শুভাকেও সে অন্ততঃ তার সমান ভালবাসে। বরং শুভার প্রতি ভালবাসায় যে মাদকতা আছে বুঝি বা চপলার প্রতি প্রেমে তাহা নাই। তাই সে মিথ্যাটা বলিতে পারিল না। কিন্তু চপলাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিল। তার পর গম্ভীর ভাবে চা খাইতে লাগিল।

সেই খানেই খাওয়া দাওয়া করিয়া একেবারে আফিস যাওয়া স্থির হইল। খাওয়া দাওয়া হইতে হইতে একটু বেলা হইল। বাহির হইবার সময় ডাকপিয়ন চপলার নামে একখানা রেজেষ্টারী চিঠি লইয়া আসিল। নগেন দেখিল তাহা শুভার দান পত্র!

[১৩]

সত্যেনের মোকদ্দমাটা অসম্ভব রকম পাকিয়া উঠিল। যখন সব-ইন্‌স্পেক্টর সত্যেন্দ্রকে থানায় লইয়া গেল তখন এজাহার সম্বন্ধে নানা রকম গোলযোগ উপস্থিত হইল। সত্যেনের অপরাধ যাহা প্রমাণিত হইয়াছিল তাহাতে ফরিয়াদির নালিস ব্যতীত কোনও মোকদ্দমা চলে না! শুভা আসিয়া নালিস না করিলে অনধিকার প্রবেশ বা আক্রমণের নালিসে পুলিশ কিছু করিতে পারে না। সবইনস্পেক্টর সমস্ত অবস্থা ইনস্পেক্টারকে বলিলেন, ইনস্পেক্টার বলিলেন, "ফরিয়াদী যখন কেউ নাই তখন এ সম্বন্ধে আমরা কি করিব? ইহাকে ছাড়িয়া দেও।" এমন সময় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আসিয়া পৌঁছিলেন। সমস্ত অবস্থা শুনিয়া তিনি সত্যেনের উপর তেলে-বেগুনে জলিয়া উঠিলেন, কিন্তু দেখিলেন কিছু করা তাঁর অসাধ্য। তবু তিনি হাল ছাড়িলেন না, বলিলেন, "সে মেয়ে মানুষটা কোথায়?"

কেহ তাহার সদুত্তর দিতে পারিল না। ক্রমে প্রকাশ হইল যে শুভাকে কেহ সে বাড়ী হইতে বাহির হইতে দেখে নাই। অথচ বাড়ীতেও তাহাকে পাওয়া যায় নাই। এই কথা লইয়া সত্যেন্দ্রকে অনেকক্ষণ জেরা করিতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ভ্রূকুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি শেষে হুকুম দিলেন যে শুভার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হউক, আর অনুসন্ধান সাপেক্ষে সত্যেন্দ্রকে মুচলেকা লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হউক।

সত্যেন্দ্র ছাড়া পাইয়া অফিসে চলিয়া গেল। তার মন তখন ভীষণ আশঙ্কায় অন্ধকার হইয়া উঠিল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কথায় বার্ত্তায় তাহার জ্ঞান হইল যে শুভার নিরুদ্দেশ হওয়াটা তাহার ঘাড়ে চাপান কিছুই আশ্চর্য্য নয়। ঘটনা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে যদি শুভাকে সত্য সত্যই না পাওয়া যায় তবে তাহাকে গুম করার অপরাধ তাহার উপর আরোপিত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। অবশ্য কেবল সন্দেহের উপর মামলা চলে না, কিন্তু তিনি শুভাকে কোনও খানে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছেন বা গুম খুন করিয়াছেন এই ধারণা যদি পুলিসকে পাইয়া বসে তবে তাহাদের পক্ষে সাক্ষী সাবুদ তৈয়ার করাও তো বিশেষ বিচিত্র নয়? ভাবিতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল।

তিনি রাগের মাথায় এমন একটা বেহিসাবী কাজ করিয়া ফেলিয়াছেন ভাবিয়া তাঁহার নিজের উপর ভীষণ রাগ হইল। শুভাকে দাঁতে চিবাইয়া খাইতে ইচ্ছা হইল। আর সব চেয়ে বেশী রাগ হইল সেই হতভাগা নগেনটার উপর।

সেদিন অফিসে গিয়া আর তার কাজ কর্ম্ম করা হইল না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শুভার সন্ধানে নানারকম লোক লাগাইতে ও নানাস্থানে অনুসন্ধান করিতে দিন কাটিয়া গেল। পরের দিন তিনি শুভার অনু-

সন্ধানে সকল সংবাদপত্রে নানা রকমের বিজ্ঞাপন দিলেন। যে শুভাকে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে চক্ষের অন্তরাল করিবার জন্য তিনি অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন ইহার পর সপ্তাহ ভরিয়া তিনি সেই শুভারই সন্ধানে অহোরাত্র নিযুক্ত রহিলেন। কিন্তু সন্ধান মিলিল না।

এদিকে থানায় একটা ভয়ানক আবিষ্কার হইল। শুভার অনুসন্ধানের জন্য পুলিস হইতে নানা চেষ্টা হইল। একজন সব-ইনস্পেক্টর এই উপলক্ষে নিকটবর্ত্তী একটা পুকুরে জাল ফেলিয়া, একটা স্ত্রীলোকের মৃতদেহ উঠাইয়া ফেলিলেন। সে দেহটা জলে ফুলিয়া পচিয়া এমন হইয়াছে যে তাহা চিনিবার উপায় নাই। তার সঙ্গে এক টুক্‌রা সিল্কের কাপড় ও গলায় ঝুলান একটা রূপার ক্রুশ পাওয়া গেল। মাদার ক্রিশ্চান সে লাস দেখিয়া বলিলেন যে তিনি শুভাকে ঠিক ঐরকম একটা ক্রুশ দিয়াছিলেন, আর তাঁর যতদূর স্মরণ হয় তিনি যখন শেষ শুভাকে দেখিয়াছিলেন তখন শুভার পরণে সিল্কের শাড়ী ছিল।

শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া ডাক্তাররা বলিলেন যে রমণী জলে ডুবিয়া মরে নাই, কোনও রূপ সাহস দ্বারা ইহাকে বধ করা হইয়াছে। ডাক্তারেরা ইহা বলিলেন যে শবদেহ যে রকম পচিয়াছে তাহাতে অন্ততঃ সাত আট দিন পূর্ব্বে ইহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় কিন্তু তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

সমস্ত অবস্থা পুলিশ কমিশনার সাহেবের গোচর করান হইল। ঠিক সেই সময়ে বিলাতে সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ক্রিপেনের মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার ক্রিপেন তাঁহার স্ত্রীকে গুমখুন করিবার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। তাঁহার স্ত্রীর মৃত দেহ পাওয়া যায় নাই, কিন্তু ক্রিপেনের বাড়ীতে একটি বাক্সে কতকটা নরমাংস ও একটা জামা মাটির তলায় পাওয়া যায়। আনুসঙ্গিক অবস্থার প্রমাণে ক্রিপেন

দোষী সাব্যস্ত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। পুলিস কমিশনার ক্রিপেনের মোকদ্দমার সমস্ত অবস্থা আলোচনা করিয়া সাব্যস্ত করিলেন যে যে প্রমাণ উপস্থিত আছে এই প্রমাণে সত্যেনের বিচার হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং সত্যেন্দ্র অভিযুক্ত হইলেন, কিন্তু সরকার পক্ষে ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেলকে বলিয়া দেওয়া হইল যে তিনি যেন কেবলমাত্র সমস্ত সাক্ষী প্রমাণ যথাযথ ভাবে আদালতে উপস্থিত করেন, আসামীর শাস্তি হওয়ার জন্য কোনও রূপ বিশেষ চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই।

[১৪]

নগেন তার আফিসে গিয়াই প্রথমে একরাশ চিঠি পত্র লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে মন বসাইতে পারিল না। তার পর সেদিনকার কাগজগুলি লইয়া পড়িতে বসিল, তার মাথার ভিতর কিছুই ঢুকিল না। একখানা Financial Times লইয়া সে অনেকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, পরে হঠাৎ আবিষ্কার করিল যে সে কাগজ মোটেই পড়িতেছে না, ভাবিতেছে শুভার কথা, এই ভীষণ গোলমেলে ব্যাপারটার কথা, ইহার প্রতিকারের কথা! বিরক্ত হইয়া কাগজ ফেলিয়া দিয়া সে টেবিলের উপর দুই হাতে মাথা চাপিয়া একাগ্র মনে ভাবিতে লাগিল।

নানা কথাই সে ভাবিতেছিল, তার মধ্যে প্রধান চিন্তা এখন দাঁড়াইয়াছিল এই যে সে এখন বাড়ীতে উঠিবে কি করিয়া। দাদাদের কাছে কিংবা বৌদিদিদের কাছে মুখ দেখাইবার কথা মনে হইতে তার লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। চপলার সম্বন্ধে সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। আর যা হউক না হউক, তার সঙ্গে একটা বোঝা পড়া

হইয়া সে সঙ্কোচের দায় হইতে উদ্ধার পাইয়াছে। কিন্তু আর সব আত্মীয় বন্ধুদের কথা ভাবিতে তার প্রাণ একেবারে এতটুকু হইয়া গেল।

এখন সে কি করিবে? ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিল যে বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব। না যাইবার একটা ওজুহাত সে সৃষ্টি করিয়া লইল। সে মনকে বুঝাইল যে মেজদা তার সঙ্গে যে ব্যবহার করিয়াছেন তা'তে তার আর মেজদার সঙ্গে ভাব রাখা চলে না। তার মান রাখিতে হইলে তা'র এখন ভিন্ন হওয়া দরকার। সে রাগ 'করিয়া আর বাড়ী ফিরিবে না নিজের লজ্জাটাকে ঢাকা দিবার জন্য সে এই কলহের আবরণ সৃষ্টি করিয়া লইল এবং ক্রমে সে নিজেই বিশ্বাস করিল যে সে যে বাড়ী ফিরিতেছে না সে লজ্জায় নহে, মেজদার সঙ্গে রাগ করিয়া।

মন স্থির করিয়া সে তখনি তার বেয়ারাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিল। তার জিনিস পত্র ঠিক করিয়া আফিসে আনিতে হুকুম দিল। এখানে আপাততঃ একটা আস্তানা গাড়িয়া তার পর অবস্থা বিবেচনা করিয়া যেখানে যাওয়া সাব্যস্ত হয় সেইখানে যাইবে। সে মনে মনে এই ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিল যে এই উপায়ে অন্ততঃ কিছুদিন সে মেজদার সামনাসামনি দাঁড়াইবার দায় হইতে উদ্ধার পাইবে। সে যে রাগ করিয়া বাড়ী ছাড়িয়া গেল সে কথা প্রকাশ করিতে সে বেয়ারাকে বলিয়া দিয়াছিল।

বেয়ারাকে বিদায় দিয়া সে শেয়ারের বাজারের দিকে গেল। পথে মনে হইল যে শুভার একটা খোঁজ ~~করা~~ নিতান্ত দরকার। শুভার খোঁজ যে সে অনায়াসে পাইবে সে সম্বন্ধে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কেন না কলিকাতায় চাঁপা ছাড়া শুভার অন্য বন্ধু বা আশ্রয় কেহ নাই একথা নগেনের জানা ছিল। তাই সে ট্রামে চড়িয়া সোজা চাঁপার বাড়ী গেল। চাঁপা তখন বাড়ী ছিল না, তার ঝি তাহাকে জানাইল যে শুভা চারিদিন হ'ল সে বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে আর ফেরে নাই। নগেন শুনিয়া স্তম্ভিত

হইল! এখানে আসে নাই? তবে শুভা গেল কোথায়। আর তো কোথাও তাহার স্থান নাই। কত ভয়ানক কল্পনা তার মাথার ভিতর দিয়া বোঁ বোঁ করিয়া ছুটিয়া গেল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে শুভাকে সন্ধান করিবার কোনও সূত্রই তাহার জানা নাই, সে আর তাহাকে পাইবে না আর,—হয়তো সে বাঁচিয়া নাই। নগেনের মাথা ঘুরিয়া উঠিল, সে জোর করিয়া একটা ল্যাম্প পোষ্ট ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে তা'র মনে হইল যে এ বিষয়ে পুলিশের সাহায্য লওয়া উচিত। সে ভাবিয়া চিন্তিয়া লালবাজারে ফিরিয়া গিয়া থানায় ইনস্পেক্টর সাহেবের সহিত দেখা করিয়া শুভার নিরুদ্দেশ হওয়ার কথা ও তাহার সন্দেহের কথা জানাইল।

ইন্‌স্পেক্টার শুনিয়া বলিলেন, "কি নাম বল্লেন? শুভসঙ্গিনী দেবী?" বলিয়া একখানা মোটা খাতার পাতা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন

"আজ্ঞে হাঁ, তা'কে শুভা বলিয়া সবাই ডাকে।"

ইনস্পেক্টর চোখ তুলিয়া নগেনের দিকে চাহিয়া বলিলেন "শুভা"! তাই বলুন—নংকির্ড ষ্ট্রীটে সে থাকতো না?"

আশান্বিত হইয়া নগেন বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, সে কোথায় আছে অনুগ্রহ করিয়া যদি বলিয়া দেন—"

ইন্‌স্পেক্টর অবিচলিত ভাবে বলিল, "আপনি তার কে হন?"

নগেন থতমত খাইয়া গেল, সে একটা কোনও সুবিধাজনক উত্তর দিতে পারিল না। ইন্‌স্পেক্টর আবার বলিলেন, "সত্যেন্দ্রনাথ রায় সলিসিটার আপনার ভাই?"

নগেন বলিল "আজ্ঞে হাঁ, আপনারা শুভা সম্বন্ধে কোনও খবর জানেন কি?"

"আপনি কি বলেন সেইটাই আমাদের শোনার দরকার। আপনি একবার অনুগ্রহ করে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হ্যারিম্যানের সঙ্গে দেখা ক'রবেন।" বলিয়া ইন্‌স্পেক্টর তাহার সঙ্গে একটি কনষ্টেবল দিয়া হ্যারিমান সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিল। হ্যারিমান কিড্ ষ্ট্রীটের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট। তিনি তখন লালবাজার পুলিশ কমিশনারের আফিসে উপস্থিত ছিলেন। ইনস্পেক্টারের চিঠি পড়িয়া তিনি উৎফুল্ল হইয়া যেন একটা হারানিধি পাইয়াছেন এই ভাব করিয়া নগেনকে একটি কামরায় ডাকিয়া বসাইলেন এবং অনূ্যন একঘণ্টা কাল তাহাকে জেরা করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। নগেন শেষে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা শুভার কোনও সংবাদ জানেন কি? সে এখন কোথায়?"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হাসিয়া বলিলেন, "আমি জানতে পারলে কিছু পয়সা খরচ করতে রাজি আছি। আর তুমি বোধ হয় তার চেয়ে বেশী দাম দিতে রাজী আছ।"

ক্ষুণ্ণমনে নগেন পুলিশ আফিস হইতে ফিরিল। তাহার মন তখন মেঘাচ্ছন্ন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কথার ভাবে সে বুঝিতে পারিল যে পুলিশের সন্দেহ যে সত্যেন্দ্র শুভাকে গুম করিয়াছে এবং হয় তো বা তাহাকে খুন করিয়াছে। এ সন্দেহ তাহার মনে এতক্ষণে জাগিয়া উঠিল, ভীষণ আশঙ্কায় তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল যে আজ সকালে সে শুভার নিকট হইতে রেজেষ্ট্রী ডাকে দানপত্রখানা পাইয়াছে। সে ছুটিয়া হ্যারিমান সাহেবের কাছে গিয়া বলিল, "দেখুন, আমি একটা খবর আপনাকে দিতে পারি; শুভা কাল রেজেষ্ট্রি আফিসে গিয়ে আমার স্ত্রীর নামে কিড্ ষ্ট্রিটের বাড়ীর একখানা দানপত্র রেজেষ্ট্রী করিয়াছে, সেখানা আজ সকালের ডাকে আমার স্ত্রী পেয়েছে।"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে নগেনের দিকে চাহিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে দানপত্র কোথায় ?"

"ভবানীপুরে আমার শ্বশুর বাড়ীতে আমার স্ত্রীর কাছে আছে।"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একজন ইন্‌স্পেক্টারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ইন্‌স্পেক্টারের সঙ্গে খানিকক্ষণ অন্য ঘরে গিয়া পরামর্শ করিয়া, শেষে আসিয়া বলিলেন, "তুমি তোমার স্ত্রীকে একখানা চিঠি লিখে দাও, এই ইন্‌স্পেক্টারকে সেই দানপত্রখানা মোড়ক শুদ্ধ দিতে। ইন্‌স্পেক্টর না আসা পর্য্যন্ত তুমি এখানে অপেক্ষা ক'রবে।"

নগেন বলিল, "চলুন আমি সঙ্গে যাচ্ছি, আমি না গেলে আমার স্ত্রী হয় তো নাও দিতে পারে।"

হ্যারিমান হাসিয়া ইন্‌স্পেক্টারের দিকে চাহিলেন, তা'র পর দু'জনে পরামর্শ করিয়া শেষে ইন্‌স্পেক্টার নগেনকে লইয়া ভবানীপুর রওনা হইলেন।

চপলার কাছে দলিল দু'খানা মিলিল বটে কিন্তু মোড়ক খানা অনেক খুঁজিয়াও পাওয়া গেল না। ইন্‌স্পেক্টার সন্দিগ্ধ ভাবে নগেনের মুখের দিকে চাহিল, তাহাতে নগেন যেন ভ্যাবাচেকা খাইয়া গেল। তার পর তাহারা রেজেষ্ট্রী আফিসে গেল ও সেখানে ইন্‌স্পেক্টার খানিকক্ষণ কাগজ-পত্র দেখিয়া এবং রেজিষ্ট্রারকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া যে এটর্নীর বাড়ী দলিল লেখাপড়া হইয়াছিল তাহার আফিসে গেল। এটর্নী আফিসে অনুসন্ধানে জানা গেল যে জীবন পাল নামে একজন ব্যারিষ্টারের কেরাণী একটি সুসজ্জিত মহিলাকে আনিয়াছিল এবং সেই নিজেকে শুভসঙ্গিনী বলিয়া পরিচয় দিয়া এই দলিল সম্পাদন করিয়াছে। জীবন পালের কথায় নির্ভর করিয়া এটর্নী শুভাকে রেজেষ্ট্রী অফিসে সেনাক্ত করিয়াছে। অনেক খুঁজিয়াও জীবন পালকে সে দিন পাওয়া

গেল না। ইনস্পেক্টার তাহার বাড়ীর ঠিকানা জোগাড় করিয়া চলিয়া গেলেন।

নগেন যখন ইনস্পেক্টারের হাত হইতে মুক্তি পাইল তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। তাড়াতাড়ি আফিসে ফিরিয়া গিয়া দেখিল, বেয়ারা তাহার জিনিস পত্র কিছুই আনে নাই। তাহার পরিবর্ত্তে আসিয়াছেন স্বয়ং সত্যেন রায়। সত্যেন বাবু ঘরে, টেবিলের পাশে গালে হাত দিয়া বসিয়া আছেন। বাহির হইতে দেখিয়াই নগেনের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। সে বলির পশুর মত নতমস্তকে ঘরে ঢুকিতেই সত্যেন্দ্র মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

সত্যেন্দ্র গম্ভীর ভাবে নগেনকে বসিতে বলিলেন। নগেন অত্যন্ত গোবেচারার মত বসিয়া পড়িল। সত্যেন বলিলেন, "কোথায় ছিলে এতক্ষণ? আমি সেই দু'পুর হ'তে তোমার জন্য ব'সে আছি।"

নগেন বলিল, "সে সমস্ত দিন পুলিসের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে।" সত্যেন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "পুলিসের সঙ্গে! কোথায়? কখন?"

পুলিস অফিসে যাওয়ার পর হইতে সেদিন যাহা যাহা ঘটিয়া ছিল নগেন বর্ণনা করিল। সত্যেন্দ্রের মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "বেটারা দেখি আমার পেছনে নিতান্তই লেগেছে। ভ্যালা বিপদ! এখন তো সে মাগীটাকে খুঁজে না বের ক'রলেই চলছে না।"

নগেন বলিল, "সে কোথায়?"

সত্যেন প্রতিধ্বনির মত বলিল "কোথায়? কে জানে কোথায়? তুমি হয় তো বের ক'রলেও করতে পার।"

নগেন বলিল, "আমি তা'র কোনও সন্ধানই জানি না।"

সত্যেন্দ্রের মুখখানা অত্যন্ত ফ্যাকাসে ও শুকনো হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "যা হ'ক তা'কে বের করবার চেষ্টা করতে হ'বে। আর তুমি খুব সাবধানে থেকো। পুলিসের কাছে আর কোনও কথা হঠাৎ ব'লে ফেলো না। আর শোন, সে দানপত্রখানা কোথায়?"

"ইনস্পেক্টারের কাছে!"

"ইনস্পেক্টারের কাছে! সর্ব্বনাশ! এত বড় একটা প্রমাণ আমার পক্ষের, সেটা পুলিশের হাতে গেছে।"

নগেন বলিল, "ইনস্পেক্টার রসীদ দিয়া লইয়াছে।"

সত্যেন অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "জীবন পাল, বল্লে না? বোস সাহেবের কেরাণী সে। চল একবার তার বাড়ী যাই। সে হয় তো সন্ধান দিতে পারে।"

দু'জনে জীবন পালের বাড়ী গেলেন। সে বাড়ী সত্যেনের কোনও কারণে জানা ছিল। জীবন পাল বাড়ীতেই ছিল। সত্যেন ও নগেন তাহার নিকট সকল কথাই শুনিল, কিন্তু জেনারেল পোষ্ট আফিসে চিঠিখানা পোষ্ট করার পর যে শুভা ট্যাক্সি লইয়া কোথায় গেল, তাহা সে বলিতে পারিল না।

যখন তাহারা জীবন পালের সঙ্গে কথা কহিতেছে ঠিক সেই সময়ে সেই ইনস্পেক্টর সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই নগেন ও সত্যেন্দ্র হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। ইনস্পেক্টার তাহা লক্ষ্য করিল।

তার পর নগেন সত্যেনের সঙ্গে বাড়ী ফিরিল। পথে সত্যেন্দ্র নগেনকে বলিয়াছিলেন যে এ ব্যাপারের কথা বাড়ীতে প্রকাশ করা হয় নাই। আর তৃতীয় ব্যক্তি একথা না জানিলেই ভাল হয়। নগেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল; কিন্তু পুলিসের কাণ্ডকারখানায় একটা অনির্দ্দিষ্ট অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাহার মনটা অন্ধকার হইয়া আসিল।

[১৫]

এলবার্ট থিয়েটারের চেহারা ফিরিয়া গেল। শুভা ওরফে সুরবালার নাম থিয়েটারগামিদিগের মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল, তার গান, তার বক্তৃতা গ্রামোফোনে উঠিল, সহরে মফঃস্বলে তার নামে হৈ হৈ পড়িয়া গেল। এলবার্ট থিয়েটারে রাতের পর রাত ঘর ভরতি লোক হইতে লাগিল। একমাস অন্তে সুরেশ বাবু শুভার বেনিফিট নাইট দিলেন, তাহাতে শুভার হাজার টাকা রোজগার হইল।

এখন শুভার অভাব নাই। সে চাঁপাকে অনেক বলিয়া কহিয়া একখানা বড় বাড়ী ভাড়া করিয়াছে এবং তাহা যতদূর সম্ভব ভাল আসবাব দিয়া সাজাইয়াছে। চাঁপা প্রথমে এ বাড়ীতে আসিতে সম্মত হয় নাই কিন্তু শুভা তাহাকে হাতে পায় ধরিয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া সম্মত করিয়াছে। শুভা এতদিনে স্বচ্ছল স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে।

তার মনটা এই অপ্রত্যাশিত সফলতায় অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। একমাস আগে যে সে সারা-ব্রিজ হইতে পদ্মায় লাফাইয়া পড়িতে গিয়াছিল সে কথা এখন তার ভাল করিয়া মনেই পড়ে না। অতীতের সে দুঃখ কষ্ট তার কাছে একটা অর্দ্ধবিস্মৃত দুঃস্বপ্নের মত সারশূন্য হইয়া উঠিয়াছিল।

এ সুখের সূর্য্যালোকের মধ্যে যে একেবারে ছায়া ছিল না এমন নহে। সেই দিন ট্রেণে বসিয়া তার ভিতর যে নূতন অনুভূতি, নূতন একটা শক্তির ধারা আসিয়াছিল তাহাতে তাহার জীবনকে অনেকটা ওলট পালট করিয়া ফেলিয়াছিল। এখন সে ব্রীড়াসঙ্কুচিতা বধূ নয়, পুরুষের ভয়ে কুণ্ঠিত নয়। পুরুষ জাতির উপর দারুণ অশ্রদ্ধায় তাহার হৃদয় লজ্জা সঙ্কোচ দূর করিয়া একটা দৃঢ় বর্ম্মে আচ্ছাদিত হইয়াছিল। এখন পুরুষের

ঙ্গে কথা কহিতে সে লজ্জায়, ভয়ে মরিয়া যায় না, অপমানের ভয়ে
ণ্ঠিত সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে না। সে ঘাড় পাতিয়া ঘা খাইতে
শিখিয়াছে ঘা ফিরাইয়া দিতেও শিখিয়াছে। চাঁপার মত সে
পলা মুখরা নয় ; সে ধীর, গম্ভীর প্রকৃতি। তার গাম্ভীর্য্য ভেদ করিয়া কেহ
াহার সহিত বেশী একটা মাখামাখি করিতে অগ্রসর হইত না। যদি
কেহ অগ্রসর হইত তবে সে দারুণ ধাক্কা খাইয়া ফিরিত। একটা তীব্র
্ব তিরস্কার, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও কুঞ্চিত ভ্রূ দেখাইয়া শুভা আশ্চর্য্য ভাবে অতি
বড় লম্পটকেও লজ্জিত করিয়া তুলিত। থিয়েটারের ভিতরে সকলেই
তাহাকে দু'দিনের পরিচয়ে চিনিয়া ফেলিয়াছিল, তাই সেখানে কেহ
তাহাকে ঘাঁটাইত না।

কিন্তু তার অতুলনীয় রূপ, তা'র সঙ্গীতের মদির লহরী, আর তার
অভিনয় চাতুর্য্য তাহাকে ষ্টেজের বাহিরে সারাদেশের প্রশংসার দৃষ্টির
ভিতর আনিয়া ফেলিয়াছিল। কাজেই অনেকের কাছে সে কামনার
বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। নিত্যই দুই চারিটা অত্যন্ত ঘৃণ্য প্রস্তাবে তা'র
কর্ণ কলুষিত হইত। অনেক স্থানে প্রস্তাবটা প্রকাশ্যতঃ খুব খারাপ
ভাবে হইত না, কিন্তু তাহার লক্ষ্য ও শেষ কোথায় তাহা তাহার জানা
ছিল। কলিকাতার একটি মস্ত বড় লোক তাহার বাড়ীতে আসিয়া দু'টি
গান শুনিবার প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন এবং সে গানের দাম দিতে
চাহিয়াছিলেন অনেক। প্রস্তাবটা খুব ভদ্রভাবে উপস্থিত করা হইয়াছিল,
তাই শুভাও খুব ভদ্রভাবে উত্তর দিয়া পাঠাইল যে ভদ্রলোকটির সঙ্গীত
পিপাসা যদি অত্যন্ত প্রবল হয় তবে তিনি রোজ থিয়েটারে যাইতে পারেন,
গ্রামোফোনেও শুভার গান শুনিতে পারেন। না হয়, ইচ্ছা করেন তো
তাঁর স্ত্রী বা কন্যাকে শুভার কাছে পাঠাইলে শুভা তাহাদিগকে গান
শিখাইয়া দিতে পারে তাহাদের মুখ উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত শুনিয়া তিনি

তৃপ্ত হইতে পারিবেন। এ প্রস্তাব শুনিয়া ভদ্র লোকটি অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিয়াছিলেন। শেষে কি ভাবিয়া তিনি শুভার কাছে প্রস্তাব করিলেন যে শুভা যদি তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার স্ত্রীকে সঙ্গীত শিক্ষা দেয় তবে তিনি তাহাকে যথেষ্ট পারিশ্রমিক দিতে প্রস্তুত আছেন। শুভা বলিয়া পাঠাইল সে পারিশ্রমিক চায় না, কিন্তু সে বাড়ী বহিয়া শিখাইয়া আসিতে পারিবে না, ভদ্রলোকটী যদি তাঁর স্ত্রীকে শুভার বাড়ী পাঠাইতে পারেন তবেই শিক্ষাদান সম্ভব। ভদ্রলোকটীর মনে মনে যে কি দুর্ব্বুদ্ধি ছিল তাহা শুভার বুঝিতে বাকী ছিল না।

এমনি অনেক বচসা, অনেক কথা কাটাকাটি তার রোজ করিতে হইত। ইহাতে তাহার পুরুষদ্বেষ ক্রমাগত বাড়িয়া চলিল। সে দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইল যে পুরুষ জাতি স্বভাবতঃ পাপাশয় এবং নারীর অপমান তাহাদের জীবনের এক ব্রত। সে এ কথা ভাবিতে বেদনা বোধ করিত, আর এই সব অপমান জনক প্রস্তাবে বড় বিরক্ত হইত। এই টুকুই তার এখনকার আনন্দময় জীবনের একমাত্র ছায়াপাত।

বেনিফিট নাইটে থিয়েটারের লোকেরা সকলে ধরিয়া বসিল শুভার সকলকে খাওয়াতে হইবে। শুভা অনায়াসে সম্মত হইল। লোককে খাওয়াইয়া তৃপ্তিলাভ করা বাঙ্গালীর মেয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। শুভার ভিতর এই আকাঙ্ক্ষা চিরদিনই ছিল, কিন্তু কোনও দিনই সে ইহা পরিতৃপ্ত করিবার অবসর পায় নাই। তাই সুরেশবাবু প্রমুখ অভিনেতৃ-গণের এ প্রস্তাবে সে ধন্য হইয়া গেল; সে নিজ হাতে রাঁধিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইবার প্রস্তাব করিল।

পরের দিন তাহার সুসজ্জিত বিস্তীর্ণ গৃহে আনন্দমেলা বসিয়া গেল। এলবার্ট থিয়েটারের সকল পুরুষ ও নারী তাহার বাড়ীতে সারাদিন ভরিয়া আনন্দ উৎসব করিতে লাগিল। যাহারা এখানে আসিয়াছিল

তাহার মধ্যে বেশীর ভাগ লোকের "ফুর্ত্তি" করাই পেশা। এখানে সে "ফুর্ত্তির" একটা প্রধান অঙ্গের অসদ্ভাব ছিল, কেননা শুভা মদের কোনও ব্যবস্থাই করে নাই। কিন্তু অপর একটি প্রধান অঙ্গের অভাব হয় নাই। অনাত্মীয় পুরুষ ও নারীর একত্র আনন্দ সম্মিলন আমাদের দেশে ভদ্র সমাজে প্রায় হয় না, তাই এইরূপ পুরুষ ও নারীর একত্রে মিশিয়া ভদ্রভাবে আলাপ আমাদের প্রায় অপরিজ্ঞাত। এরকম স্থলে যে আনন্দ হয় তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় ভদ্রভাবে দেওয়া অসম্ভব।

পেশাদার আমুদেদের যে কতকগুলি মামুলী প্রক্রিয়া আছে, তার কোনওটিই আজকার অনুষ্ঠানে বাদ পড়িল না।

প্রবল বেগে আমোদ আহ্লাদ চলিতে লাগিল। সকলেই প্রাণপণ করিয়া অনুভব করিতে চেষ্টা করিল যে খুব একটা আমোদ হইতেছে, তাই হাসির স্রোত আর থামিল না।

প্রায় বেলা ৪টার সময় খাওয়ার ডাক পড়িল। শুভা নিজেই বেশীর ভাগ রান্না করিয়াছিল, আর কতকটা করিয়াছিল চাঁপা। খাবার প্রস্তুত, এই সংবাদে সকল কণ্ঠে একটা প্রচণ্ড আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। সকলে খাইতে বসিল। শুভা নিজে পরিবেশন করিল, সকলে তৃপ্তির সহিত খাইল। তার পর আরও খানিকক্ষণ হট্টগোলের পর সভাভঙ্গ হইল।

[১৬]

শুভা যদিও রান্না করিতেছিল, তবু মাঝে মাঝে যাইয়া অতিথিদের খবরাখবর লইতেছিল। আর, পরিবেশনের সময় সে আগাগোড়াই সবার কাছে ছিল। যতক্ষণ সে এই দলে ছিল ততক্ষণ দলে মিশিয়া সকলের সঙ্গে সে সমানে হাসি তামাসা করিয়াছিল। তার সত্য সত্যই

বড় আনন্দ হইতেছিল। এতগুলি লোককে খাওয়াইয়া সে মনে মনে খুব তৃপ্তিলাভ করিতেছিল। আর যখন নিমন্ত্রিতগণ শতমুখে তার রান্নার প্রশংসা করিতেছিল তখন তার আনন্দ বুকে ধরিতেছিল না। তাই সে সর্ব্বক্ষণই হাসিতেছিল—হাসি মুখ ছাড়া সে এক দণ্ডও ছিল না। যখন শেষ অতিথিকে হাসিমুখে বিদায় দিয়া সে বসিবার ঘরে ফিরিয়া একটি কৌচে বসিল তখন তাহার মুখ হাসিতে ভরা ছিল।

কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সে অনুভব করিল যে মুখে তাঁর হাসি লাগিয়া আছে বটে, কিন্তু তার প্রাণের ভিতর একদম ফাঁকা—শুধু ফাঁকা নয় একেবারে অন্ধকার। এই অন্তঃসারশূন্য আমোদের বেদনায় পীড়িত তাহার অন্তরাত্মা হঠাৎ জাগ্রত হইয়া তাহার সমস্ত চিত্ত একটা অহেতুক বিষাদে ছাইয়া দিল। এমন অকারণ বেদনা সে কথনও অনুভব করে নাই। ইহাতে যেন তাহার প্রাণ একেবারে চুর চুর করিয়া দিতে লাগিল, অথচ সে বুঝিতে পারিল না কেন এ বিষাদ!

তার দীর্ঘকাললুপ্ত আত্মজিজ্ঞাসা আবার নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল যে এ সবই ভূয়া, সব মেকী! আমোদ আহ্লাদের ভিতর তার প্রকৃত আনন্দবোধ নাই, প্রাণের ভিতর তার জীবনের ব্যর্থতার হাহাকার হৃদয় জুড়িয়া অন্ধকার ঢালিয়া দিয়াছে। এই কি তার জীবনের সার্থকতা? ইহারই জন্য কি সে তার পরিচিত জগতের সমস্ত গঞ্জনা মাথায় করিয়া ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছে। কতকগুলি অন্তঃসারশূন্য নরনারীর সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া, তুচ্ছ আমোদে মাতিয়া থাকিবার জন্যই কি সে সংসার ছাড়িয়া আসিয়াছে? তা' ছাড়া তার জীবনে আর কি উপকার হইতেছে? সে একজন নামজাদা নটী, অনেক টাকা সে রোজগার করে' কোনই অভাব নাই তার—এই কি তার জীবনের শেষ লক্ষ্য? অবশ্য নয়, কিন্তু ইহা ছাড়া আর সে কি লাভ

করিয়াছে ? আর তার নটীজীবনে কেবল মাত্র অসাধু অপদার্থ কতকগুলি লোকের নিরন্তর সাহচর্য্যে আর কি-ই বা বেশী সে করিবে ?

ভাবিতে ভাবিতে তার মনটা ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল, প্রাণটা নিদারুণ যাতনায় কাঁদিয়া উঠিল। এ জীবন ছাড়িতে হইবে, তার জীবন সার্থক করিবার পথে সোজা গিয়া দাঁড়াইতে হইবে। তীব্র বেদনার সহিত সে অনুভব করিল এপথ সে পথ নয়।

কিন্তু সে পথ কোথায় ? কেমন করিয়া সে পথ ধরিবে ? কিসে জীবন সার্থক হইবে ? ভাবিতে ভাবিতে তার মনে পড়িল তার এতদিনের পরিত্যক্ত ধর্ম্মগ্রন্থের কথা। মাদার ক্রিশ্চিয়ানার উপহৃত বইগুলি এই ঘরেরই একটি তাকের উপর পরিচ্ছন্নভাবে সাজান ছিল। অনেক দিন সে সেগুলি খোলে নাই। আজ সে উঠিয়া তার ভিতর হইতে কেম্পিসের Imitation of Christ খানা লইয়া খুলিল। বই খুলিয়াই সে পড়িল "Vanity of Vanities, all is Vanity".

কথাটা অতি পুরাতন। সে অনেকবার শুনিয়াছে, আমাদের এদেশে একথা অনেকেই অনেকবার শুনিয়াছে। কিন্তু সব সময় সব কথা মনে বসে না। ঠিক এই সময় শুভার মনের যে অবস্থা হইয়াছিল তাহাতে এই উপদেশটা তার প্রাণে যেন একটা অপূর্ব্ব প্রত্যাদেশের মত বোধ হইল। তাই তো! সকলি তো মিথ্যা, সব শুধু অভিমান। তার সমস্ত জীবনটা একটা অভিমানের প্রকাণ্ড পর্ব্বত বলিয়া মনে হইল। তার বাড়ীঘর আসবাব, তার খ্যাতিলাভে তৃপ্তি, তার প্রতিষ্ঠার গর্ব্ব, তার রূপের সুখ্যাতিতে আনন্দ, সব তার কাছে আজ এই মিথ্যা অভিমানের প্রকাশ বলিয়া মনে হইল। মিথ্যার এই বিরাট প্রাসাদ রচনাই কি তা'র জীবনের একমাত্র প্রয়োজন ? ইহাই কি তা'র জীবনের সার ? শুভা খুব গভীরভাবে ভাবিতে লাগিল। তার অন্তরাত্মা আজ জাগিয়া

উঠিয়াছে, তার পরিতৃপ্তির পথের সন্ধানে আজ সে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। সে মনে মনে কত কল্পনা করিতে লাগিল, কত ভাঙ্গিতে গড়িতে লাগিল, কোনও একটা সহজ বা সম্ভব পন্থা তাহার মনে আসিল না।

তখন তাহার মনে হইল মাদার ক্রিশ্চিয়ানার কথা। সেই নারীর জীবনের পরতে পরতে যে সার্থকতা ও তৃপ্তির সন্ধান সে পাইয়াছে, তাহার কথা স্মরণ করিয়া তাহার-হিংসা হইল। সে তৃপ্তি কি তাহার পক্ষে পাওয়া একেবারেই অসম্ভব ?

চাঁপা তাহাকে ডাকিতে আসিয়া, বলিল, "ও পোড়ারমুখী, খাবিনে ? বেলা যে পড়ে' এল, এতক্ষণে ঐ বইগুলো নিয়ে কি পিণ্ডি করছিস ?" শুভা মুখ ফিরাতেই সে বলিল, "ওমা ! ও কি ? অমন হাঁড়িপানা মুখ করেছিস্ কেন ? কি হ'য়েছে তোর ?"

"জানিনা বোন্, আমার প্রাণটা কি জানি কেন বড় খাঁ খাঁ ক'রছে।"

চাঁপা দরদের সহিত তাহার কাছে গিয়া বসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শুভা বলিল, "আমার আজ কেবলি মনে হচ্ছে. কেন এ জীবন ? কেবল এমনি ক'রে হেসে খেলে, নেচে গেয়ে দিন কাটালাম যদি তবে মানুষ হ'য়ে জন্মালাম কি ক'রতে ?"

"শোন মেয়ের কথা ! তুই চাস কি বল দিকিনি ? দেশময় তোর নাম ছড়িয়ে পড়েছে, আমাদের সবাইকে তুই কাণা ক'রে দিয়েছিস। নেবেই একমাসে দেড় হাজার টাকা রোজগার করলি। এখন তুই পায়ের উপর পা দিয়ে খাবি, যা খুসি তাই করবি। মন চায় তো গরীব দুঃখীকে প্রাণভরে দান ক'রতে পারিস, চাই কি তীর্থ ধর্ম্ম যা ইচ্ছে ক'রতে পারিস, আর যদি তেমন মনে হয়, যাকে তোর মনে ধরে সেই তোর পায়ে এসে লুটিয়ে প'ড়বে। আর চাস কি ?"

শুভা কিছু বলিল না। খানিকক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, "হাঁ ভাই কাল আমি তীর্থ ক'রতেই যাব। তুই যাবি সঙ্গে ?"

"কোথায় যাবি ?"

"এই ক'লকাতায়, কিড্ ষ্ট্রীটে।"

"আ মরণ, সে তীর্থের মায়া এখনো কাটাতে পারলি নে ?"

"না ভাই সে নয়। সেখানে একটা সত্যি তীর্থ আছে।" বলিয়া হাসিয়া সে মাদার ক্রিশ্চিয়ানার পরিচয় দিল।

চাঁপা প্রথমে সে খৃষ্টান মাগী'র কাছে যাইতে অস্বীকার করিল, তার পর শুভার আগ্রহে শেষে রাজী হইল। পরদিন দুপুরবেলায় দু'জনে তাঁর কাছে যাইবে স্থির করিল।

এই সংকল্প করিয়া তার মনটা অনেকটা শান্ত হইল। তাহার মনে স্থির বিশ্বাস হইল যে সেই সৌম্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসিনী তাহাকে সত্যপথ দেখাইয়া দিতে পারিবেন।

সন্ধ্যাবেলায় চাঁপা একবার তাহার নিজের বাড়ীর ভাড়াটিয়াদের কাছে ভাড়ার তাগাদায় গেল, শুভা একা বসিয়া অনেকটা শান্ত চিত্তে Imitation of Christ পড়িতে লাগিল। সে তন্ময় হইয়া পড়িতেছিল, ইতিমধ্যে কখন যে সুরেশবাবু আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন তাহা সে লক্ষ্য করিতে পারিল না।

সুরেশবাবু নিঃশব্দে একখানি চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিলেন, "কি বই পড়ছো সুরো ?"

শুভা চমকিয়া উঠিয়া সুরেশ বাবুর মুখের দিকে চাহিল। তার মুখ দেখিয়া শুভার প্রাণটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। তাঁহার মুখের যে ভাব সে দেখিল, সে ভাবটা শুভার অপরিচিত নয়—কিন্তু সুরেশ বাবুর মুখে ? —তার এভাব যে কল্পনার অতীত !

সুরেশ বাবু সুরসিক। তাঁহার মত হাসাইবার লোক দ্বিতীয় নাই। তার সমস্ত জীবন যেন একটা হাল্কা হাসির অনন্ত প্রবাহ। তাঁর মুখ কেহ কখনও গম্ভীর হইতে দেখে নাই। কিন্তু আজ তিনি গম্ভীর। সুরেশ বাবু যেসব সংসর্গে থাকেন তাহাতে তাঁহার শ্লথ চরিত্র হইবার যথেষ্ট অজুহাত আছে, কিন্তু সুরেশ বাবু কোনও নারীর প্রতি আসক্ত এ অপবাদ তার শত্রুও তাঁহাকে কোনও দিন দিতে পারে নাই। কিন্তু আজ শুভা সুরেশ বাবুর মুখে স্পষ্ট দেখিতে পাইল—প্রেমোন্মাদ!

বিস্মিত হইয়া শুভা বলিল, "আপনি এ সময়? কি মনে করে?"

সুরেশ বাবু মাটির দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তোমাকে একটা বিশেষ কথা বলবার জন্য এসেছি।"

তার পর খানিকক্ষণ উভয়ে নীরব। অনেকক্ষণ পর সুরেশ বাবু বলিলেন, "কথাটা শুনলে তুমি হয় তো আমাকে ঝাঁটাপেটা ক'রে তাড়াবে, কিন্তু তোমাকে না বলে আমি কিছুতেই পারছি নে। কথাটা অতি ছোট—আমি তোমাকে ভালবাসি।"

শুভা। এ কথা আমি অনেক শুনেছি, কিন্তু আপনার মুখে একথা, সুরেশ বাবু? আমি কি বলবো ভেবে পাচ্ছিনে।

সু। আমিই অবাক্ হচ্ছি সুরো। সমস্তটা যৌবন আমি আগুনের ভিতর দিয়ে আনন্দে বেড়িয়ে শেষে পঞ্চাশ বছর বয়সে নাকি পুড়ে ম'লাম। কিন্তু পুড়েছি ঠিক। শুভা, তুমি জান আমি কেমন লোক, আর আমার বয়সটাও ঠিক মেয়েমানুষ দেখেই পাগল হ'বার বয়স নয় আমি ঠিক একটা খেয়াল থেকে একথা বলছি না। আমি যতই তোমায় দেখছি ততই বুঝছি যে তোমার মত মেয়েমানুষ আমি কখনও দেখিনি, আমি জীবনে যত কিছু ভাল কল্পনা ক'রেছি তার সব আমি তোমার মধ্যে

দেখতে পাচ্ছি, আমার প্রাণটা তাই একটা বিষম টানে তোমার দিকে ছুটে চলেছে, একে ফেরাবার সাধ্য আমার নেই।"

শুভা শান্তভাবে বলিল, "শুনে বড় সুখী হ'লাম সুরেশ বাবু। আপনার মত প্রবীণ জ্ঞানী লোকের কাছে এমন প্রশংসা পেলে যে কোনও স্ত্রীলোকই আনন্দ বোধ ক'রবে, আমি তো কোন ছার। আপনার মতন পুরুষ যে আমাকে ভালবাসে একথা জেনে আমার সত্য সত্যই বড় গর্ব্ব হ'চ্ছে। সত্যিকার ভালবাসা পেলে কোনও মেয়েমানুষই সুখী না হ'য়ে পারে না। তাতে আবার আপনার মত লোকের ভালবাসা!"

সুরেশ বাবু উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "তুমি আমার হবে শুভা? আমরা দু'জনে—"

"তাই বলুন সুরেশ বাবু, আসল কথাটা খুলে বলুন। আপনি আমাকে ভালবাসেন কেবল এই খোস খবরটা আমাকে দিয়ে যাবার জন্যে আপনি আমার কাছে আসেন নি? আপনি আমার কাছেও কিছু চান—আমাকে দখল ক'রতে চান, নিজের সম্পত্তি ক'রতে চান। কেমন?"

সুরেশ বাবু ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেলেন, তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আমি তোমার ভালবাসা চাই।"

"সুধু কি তাই? আমি যদি আপনাকে বলি, আমি আপনাকে ভালবাসি তবে কি আপনি খুসী হ'য়ে বাড়ী ফিরে যাবেন? নিশ্চয়ই নয়। আপনি আসলে চান আমার এই সুন্দর শরীরখানা দখল ক'রতে, ভালবাসার ওজুহাত দিয়ে এমন একটা সম্পত্তি আয়ত্ত ক'রতে চান যা দশজনকে দেখিয়ে একটু গর্ব্ব বোধ ক'রতে পারবেন?"

সুরেশ। "এ তোমার—"

"থামুন, আমি আগে আপনার প্রস্তাবটাকে বেশ খোলসা ক'রে আপনাকে দেখাই তার পর আপনার যা' বলবার ব'লবেন। আপনি

আমাকে ভালবাসেন। আচ্ছা, বাস্থন তাতে ক্ষতি কি? আমাকে সে কথা আপনার জানাতে ইচ্ছে করতে পারে। আচ্ছা জানান। আমি আপনাকে ভালবাসি ভাল, না হয় আপনার ভালবাসার তা'তে কম বেশী হ'বে না। এ হ'ল নিছক ভালবাসার কথা। কিন্তু আপনি তো এতে খুসী হবেন না। আপনি হয় তো চাইবেন, যদি সম্ভব হয় আমাকে বিয়ে ক'রতে। বিয়ে করা মানে হ'চ্ছে আমার শরীরটার উপর আপনার নির্ব্ব্যূঢ় স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করা, একে নিয়ে আপনি যা' খুসী তাই ক'রতে পারবেন, আর কারও তাতে কিছু বলবার থাকবে না, আমারও না। আমার স্বাধীন ইচ্ছা ব'লে একটা কোনও কিছু থাকবে না। আপনি আমাকে খাইয়ে পরিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে খুসী রাখবার চেষ্টা ক'রতেও পারেন, নাও ক'রতে পারেন, সে আপনার মরজি। আমি খুসী থাকি লাভ, না খুসী থাকি আপনার ইচ্ছা যা' তাই বহাল থাকবে, আমার খুসী হ'ক বা নাই হ'ক। বিয়ে যদি না করেন তবেও ঠিক তাই। আপনি চাইবেন আমাকে ঠিক স্ত্রীর মতন ক'রেই অন্য সবার থেকে স্বতন্ত্রভাবে দখল ক'রতে; আমার মন যদি অন্য কারো উপর পড়ে, তবে চাই কি আপনি আমায় খুন ক'রতে আসবেন। বিয়ে হ'ক বা নাই হ'ক আপনার দাবী দাওয়াটা আমার উপর সমান হ'বে। তফাৎ এই, যে যদি বিয়ে হয় তবে আপনি আপনার ইচ্ছাটাকে আইনের জোরে আমার ওপর খাটাতে পারবেন, বিয়ে না হ'লে, গায়ের জোরে কিংবা ফুসলিয়ে ফাসলিয়ে যতদূর যা পারেন। এরই নাম আপনাদের ভালবাসা! জিনিসটা আমার চাখা আছে, এতে আমার রুচি নাই।"

সুরেশ বাবুর মুখের উপর কে যেন একরাশ কালি ঢালিয়া দিল। তিনি উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "তোমার মতে তবে ভালবাসা ব'লে কোনও জিনিস নেই।"

"থাকবে না কেন? ভালবাসে মেয়েরা—বেটাছেলেরা কেবল প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে। আপনারা চান আমাদের কাছে সর্ব্বস্ব, কিন্তু তা'র বদলে আমাদের শুধু ফাঁকা কথা ছাড়া কিছুই দেন না। অথচ আমরা আমাদের সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে খুসী হ'য়ে থাকি। যদি আমাদের ভাগ্যে একটু আদর একটু ভালবাসা লাভ হয় সে খুব ভাগ্যের কথা, না হয় তাতে ক্ষতি নাই। একে বলে সত্যিকারের ভালবাসা, কিন্তু এটা কেবল আমাদের সম্পত্তি!"

সু। "কে তোমার মাথার ভিতর এই সব বাজে কথা ঢুকিয়েছে জানি না, কিন্তু তোমার সবগুলো কথা যে আগা গোড়া মিথ্যা সেটার সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে আমি তা' আজ প্রাণের ভিতর অনুভব করছি। দেখ শুভা, আজ পঁচিশ বছর ধরে থিয়েটার ক'রছি, ভাল মন্দ অনেক মানুষ দেখেছি, অনেক লোকচরিত্র শিখেছি। হঠাৎ কাব্যি রোগে আমাকে ধ'রবার সম্ভাবনা নেই, কিন্তু আজ আমি ঠিক প্রাণের ভিতর অনুভব ক'রেছি যে আমি তোমাকে কেবলি ভালবাসি, আর আমি কিছুই চাই না। তোমার জন্য আমি এখন সব ত্যাগ ক'রতে পারি, আর তোমার কাছে আমি এক ফোঁটা ত্যাগ চাই না। আর ওই যে শরীরটা দখল করবার কথা বলছো, আমার সে ইচ্ছা নেই,। তাই যদি তোমার ইচ্ছা হয়, আমি জীবনে কোনও দিন তোমার দেহ স্পর্শ ক'রবো না, আর তা'তে খুব খুসী হ'য়ে থাকবো। আমি কেবলি দিয়ে খুসী, তোমার আমি কিছুই চাইনে। তাতেই জীবন ধন্য বোধ করবো। তুমি আমায় পরীক্ষা ক'রতে চাও কর! আমি সারাজীবন কেবল তোমাকে ভালবেসেই খুসী থাকবো।"

শুভা একটু ভাবিল। শেষে বলিল, "বেশ কথা, তবে আপনি আমায় ভাল বাসুন আমি তা'তে বাধা দেবো না। কিন্তু আমার ভাল-

বাসা যদি চান তবে স্পষ্ট ব'লে দিচ্ছি সে পাবেন না। সর্ব্বস্ব দিয়ে সত্যি সত্যি কেবল একজনকেই এক জীবনে ভালবাসা যায়। আমি তেমনি ক'রে একজনকে ভালবেসেছি, এখনো ভালবাসি। আর কাউকে আমি ভাল বাসতে পারবো না। তা ছাড়া যদি আর কিছু আপনি আমার কাছে চান, তবে তাও কোনও কালে পাবেন না সেটা বলাই বাহুল্য।"

সুরেশ বাবু উঠিলেন, বলিলেন, "বেশ, তবে আমি উঠি। তুমি আমার মেয়ের বয়সী, তোমার উপর আমার এমন টান না হওয়াই খুব উচিত ছিল; কিন্তু কি ক'রবো; ম'রে ব'সছি। আমি যে তোমায় এই কথা ব'লতে পেরেছি তা'তেই আমি সুখী হয়েছি। আর তোমাকে এ বিষয়ে বিরক্ত ক'রবো না। একটা অনুরোধ রাখবে কি? আমার এ বুড়ো বয়সের পাগলামীর কথা দশজনের কাছে না জানালে কোনও ক্ষতি নাই—"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি কাউকে কিছু ব'লবো না। আপনার মনে যদি কষ্ট দিয়ে থাকি মাপ ক'রবেন। কিন্তু আমি দাগা খেয়ে যে শিক্ষা পেয়েছি, সে শিক্ষা সহজে ভুলি কি ক'রে বলুন?"

সুরেশ বাবু বিদায় হইয়া গেলেন। চাঁপা কিছুক্ষণ বাদে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "সুরেশবাবু এসেছিলেন কেন রে শুভা?"

শুভা একটু হাসিয়া বলিল, "সে কথা ব'লতে বারণ আছে।" চাঁপা একটু অভিমান করিল, পরে খানিকক্ষণ শুভার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মরণ আর কি? এই বয়সে? এতকাল পরে?"

শুভা বিস্মিত হইয়া বলিল, "এই বয়সে কি?"

"আর কি? মিন্সে মরেছে, তোর রূপের আগুনে পুড়ে মরেছে। তুই আমার কাছে কথা লুকোবি এমন হিম্মত তোর এখনো হয়নি লো মুখপুড়ি?"

"হার মানলাম। তোর কপালে নিশ্চয় আর একটা চোখ আছে। একদিন তুই ঘুমিয়ে থাকলে কপালটা চিরে দেখবো।"

[১৭]

সত্যেনের মোকদ্দমা দায়রায় সোপরদ্দ হইল। সহরময় একটা হৈ হৈ পড়িয়া গেল। অনেক চেষ্টা করিয়াও সত্যেন্দ্র বা নগেন শুভার কোনও তল্লাস করিতে পারিলেন না। এদিকে যে লাসটা পাওয়া গিয়াছে সব-ইনস্পেক্টার জোগাড় করিয়া শুভার খানসামা ও আয়াকে দিয়া তাহা সেনাক্ত করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। মাদার ক্রিশ্চিয়ানা লাস সেনাক্ত করিতে একেবারেই নারাজ, তিনি কেবল ক্রুশ ও সিল্কের কাপড় শুভার হওয়া সম্ভব, ইহার বেশী কিছুই বলিতে পারেন না। এ সাক্ষীতে মোকদ্দমা নাও টিকিতে পারে। এমন একটা সঙ্গীন মোকদ্দমা হাসিল করিবার জন্ম পাওনা পুরস্কারটা পাছে হাতছাড়া হইয়া যায়, সেই আশঙ্কায় সব-ইনস্পেক্টার লাসের হাতে একটা কাটা দাগ ও পায়ের একটা আঙ্গুলের একটু বক্রতা যে শুভারও ছিল, তাহা আয়া ও খানসামাকে দিয়া প্রমাণ করাইবার বন্দোবস্ত করিল। সত্যেন্দ্রের সঙ্গে জীবন পালকে জড়াইয়া আসামী করা হইয়াছিল।

হাইকোর্টের দায়রার ঘর একেবারে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। যত ব্যারিষ্টার এটর্ণী উকীল ভিড় করিয়া এই মোকদ্দমা শুনিতে বসিয়াছিল, তাহাদের পিছনে ছিল বাহিরের লোক। তা ছাড়া বাহিরের বারান্দায় লোকের অন্ত নাই।

জজ সাহেব লাল রঙ্গের গাউন পরিয়া কোর্টে আসিয়া প্রবেশ করিলেন, একজন কর্ম্মচারী তারস্বরে একটা বাঁধাগৎ আওড়াইয়া বলিয়া গেল যে হাইকোর্টের সেসন বসিয়াছে। তখন ক্লার্ক অব দি ক্রাউন একে একে

জুরীদের নাম ডাকিতে লাগিলেন। এক এক করিয়া নয় জন স্পেশাল জুরর নিযুক্ত হইল, তার মধ্যে পাঁচজন ইংরাজ এবং চারজন বাঙ্গালী। জুররগণ স্থানগ্রহণ করিলে ক্লার্ক অব দি ক্রাউন ডকে দাঁড়ান আসামী সত্যেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের মর্ম্ম শুনাইলেন। অভিযোগের চার দফা ছিল। প্রথম দফা, সত্যেন্দ্র জীবন পালের সহিত যোগে শুভাকে হত্যা করিয়াছেন; দ্বিতীয় দফা, শুভাকে অপহরণ করা, তৃতীয় দফা অপরাধজনক ভাবে তিনি শুভার গৃহে অবৈধ ভাবে প্রবেশ করিয়াছেন; চতুর্থ দফা তিনি শুভার জিনিস পত্র চুরী করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। চার্জ্জ পড়া হইলে ক্লার্ক অব দি ক্রাউন জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি অপরাধী না নিরপরাধ ?"

সত্যেন্দ্র উত্তর দিবার আগেই তাঁহার পক্ষের ব্যারিষ্টার ও ডনেল সাহেব উঠিয়া এই চার্জ্জে দুইটি আপত্তি উপস্থিত করিলেন। প্রথমতঃ অবৈধ প্রবেশের চার্জ্জ, যাহার বাড়ী তাহার নালিশ ছাড়া চলিতে পারে না। শুভা কিংবা তার কোনও ওয়ারিশ যখন নাই তখন এ চার্জ্জ চলিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ কোনও অপরাধ করিবার উদ্দেশ্যে অনধিকার প্রবেশ করিলেই ফৌজদারীতে বিচারযোগ্য অপরাধ হয়। কোনও অপরাধ করিবার উদ্দেশ্য না থাকিলে যখন অনধিকার প্রবেশ হয় না, তখন সে গুলির সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে অনধিকার প্রবেশের চার্জ্জ চলিতে পারে না।

সরকার পক্ষে ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল বলিলেন, "আমরা এ বিষয় সম্পূর্ণ কোর্টের হাতে ছাড়িয়া দিতে চাই। আসামীকে শাস্তি দেওয়া আমাদের লক্ষ্য নয় সে সকল লক্ষ্য প্রমাণ আছে তাহা জুরিগণের বিচারার্থ নিরপেক্ষ ভাবে উপস্থিত করা ছাড়া আমার আর কিছুই করিবার উপদেশ নাই। সুতরাং চার্জ্জ সম্বন্ধে আমি কোনওরূপ পীড়াপীড়ি করিতে চাই না।"

তার পর জজের সঙ্গে খানিকক্ষণ বাদানুবাদের পর অনধিকার প্রবেশের চার্জ্জ কাটিয়া দেওয়া হইল। সত্যেন্দ্রকে তখন ক্লার্ক অব দি ক্রাউন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই সব অপরাধে দোষী কি নির্দ্দোষ?"

সত্যেন্দ্র ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর করিল, "আমি নির্দ্দোষ।"

তখন ক্লার্ক অব দি ক্রাউন জীবন পালকে সম্বোধন করিয়া তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনাইলেন। অভিযোগ দুই দফা, প্রথম সত্যেন্দ্রের সহিত যোগে শুভাকে হত্যা করা, দ্বিতীয় বলপ্রয়োগ ও ভয়প্রদর্শন দ্বারা শুভাকে দিয়া দলিল সম্পাদন করাইয়া লওয়া। জীবন পালের পক্ষে ব্যারিষ্টার দ্বিতীয় দফার আপত্তি করিলেন, শুভার নালিস ভিন্ন এ চার্জ্জ চলিতে পারে না বলিয়া এই দফা জজ পরিত্যাগ করিলেন। জীবন পাল নিজেকে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রকাশ করিলে সরকার পক্ষে ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন।

তিনি বলিলেন, এই মোকদ্দমায় আসামী দুইটি অত্যন্ত গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত। তা ছাড়া এক নম্বর আসামী বিশেষ গণ্যমান্য ও পদস্থ ব্যক্তি এবং এই কোর্টের এটর্ণী; তাহার পক্ষে এইরূপ একটা অপরাধে জড়িত হওয়া অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত। যদি সমুদয় প্রমাণাদি আলোচনায় জুরী মহোদয়গণ তাঁহাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন, তবে এই আদালতের একজন কর্ম্মচারি হিসাবে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইব, কেন না, আমাদেরই মধ্যে একজনের পক্ষে এমন গর্হিত অপরাধে জড়িত হওয়া আমাদের কাহারও পক্ষে বিশেষ শ্লাঘার বিষয় নহে। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, আমার বিবেচনায় আসামীদের দু'জনের বিরুদ্ধেই প্রমাণ অত্যন্ত সঙ্গীন।

আপনাদিগকে আমার প্রথমেই বলা দরকার যে এই মোকদ্দমায়

প্রধান বিচার্য্য যে হত্যার অভিযোগে, তাহার সম্বন্ধে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ নাই। যাহা প্রমাণ আছে তাহা সমস্তই অবস্থা ঘটিত প্রমাণ (Circumstantial evidence). অনেক মোকদ্দমায় জুরীগণ কেবলমাত্র এইরূপ প্রমাণে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ হইলে কেবলমাত্র এইরূপ প্রমাণেও আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিতে আইনে কোনও বাধা নাই।" এই বলিয়া তিনি উভয়পক্ষের নজীর উপস্থিত করিয়া বলিলেন, "সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এ সম্বন্ধে কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। একমাত্র নিয়ম এই যে জুরী যদি সমস্ত সাক্ষী প্রমাণ আলোচনা করিয়া সহজ বুদ্ধিতে বিবেচনা করেন যে এই ব্যক্তি এই অপরাধ করিয়াছে তবেই তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিতে পারেন।"

তাহার পর তিনি জুরীগণকে তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন, "আপনারা মনে রাখিবেন যে কি হইয়াছিল না হইয়াছিল সে বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে আপনারাই অধিকারী। আপনারা সংসারী লোক, বিষয় কর্ম্মে এবং লোকচরিত্রে আপনাদের অভিজ্ঞতা আছে; সেই অভিজ্ঞতা দিয়া আপনাদের বিচার করিতে হইবে ঘটনাটা বাস্তবিক কিরূপ হওয়া সম্ভব। আইনঘটিত যত প্রশ্ন আছে তাহা জজ সাহেব নিষ্পত্তি করিবেন এবং সে বিষয়ে আপনারা হুজুরের নিষ্পত্তি মানিয়া লইয়া ঘটনা সম্বন্ধে আপনাদের অভিমত ব্যক্ত করিবেন।"

তার পর তিনি এই মোকদ্দমার অবস্থা আলোচনা করিয়া তিনি কি কি বিষয় প্রমাণ উপস্থিত করিবেন, সুললিত ভাবে তাহার আলোচনা করিলেন। শুভা একটি বেশ্যা, সে আসামীর ভ্রাতা নগেনের রক্ষিতা হইয়া—নং কিড ষ্ট্রীটে বাস করিতেছিল। সে বাড়ীটি নগেন্দ্র কিনিয়াছিল কিন্তু ঘটনার পূর্ব্বদিন সে বাড়ীটি শুভার নামে দানপত্র করিয়া দিয়াছিল।

সত্যেন্দ্র সেই খবর কোনও উপায়ে জানিয়া ঘটনার তারিখে সকাল বেলায় শুভার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে কি কি ঘটিয়াছিল সে বিষয়ে সাক্ষী শুভার খানসামা এবং আয়া। সত্যেন্দ্র শুভাকে গালাগালি দেয় এবং প্রহার করে। এই দেখিয়া আয়া ও খানসামা ছুটিয়া গিয়া পাশের কনভেণ্টের মাদার ক্রিশ্চিয়ানাকে সংবাদ দেয়। তিনি পুলিশকে টেলিফোন করিয়া সেখানে আসেন। তিনি আসিয়া শুভাকে দেখিতে পান নাই, শুভা কোথায় গিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে সত্যেন্দ্র কোনও সদুত্তর দেয় না। এ সময়ে সেখানে কি হইয়াছিল তাহার সম্বন্ধে সাক্ষী মাদার ক্রিশ্চিয়ানা ও সব ইনস্পেক্টার বসু। এদিকে এই ঘটনার প্রায় একঘণ্টা পর দ্বিতীয় আসামী জীবন পাল শুভাকে এটর্ণীর বাড়ীতে লইয়া যায়। সে এটর্ণীর সাক্ষ্যে প্রকাশ পাইবে যে জীবন পাল তাঁহার সাহায্যে শুভাকে দিয়া এক দানপত্র সম্পাদন করাইয়া লইয়াছিল। তাহার পর জীবন পাল শুভার সঙ্গে একখানা ট্যাক্সিতে চড়িয়া চলিয়া যায়। তাহারা কোথায় গিয়াছিল তাহার কোনও প্রমাণ নাই। তাহার পর আর শুভার কোনও খোঁজ পাওয়া যায় না। জীবন পালের সঙ্গে ১ নং আসামীর সাহচর্য্যের প্রমাণ ইনস্পেক্টার রে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হ্যারিম্যানের আদেশে জীবন পালের বাড়ীতে ইনস্পেক্টার তাহার খোঁজ করিতে যায়। সেখানে গিয়া সে সত্যেন্দ্র ও নগেন্দ্রকে জীবন পালের সঙ্গে আলাপ করিতে দেখে। কি আলাপ হইতেছিল সে সম্বন্ধে ইন্‌স্পেক্টার রে সাক্ষ্য দিবেন।

ইহার প্রায় ১৫ দিন পরে—ষ্ট্রীটে একটি পুষ্করিণী ছাকা হয়, সেখানে একটা পচা লাস পাওয়া যায়। সে লাসের গলায় ক্রুশ এবং গায়ের সঙ্গে লাগা এক টুকরা পচা সিল্কের কাপড় পাওয়া যায়। এই লাসের প্রাপ্তি সম্বন্ধে সব ইন্‌স্পেক্টর খাঁ ও অন্যান্য কয়েকটি নিরপেক্ষ

সাক্ষী উপস্থিত করা হইবে। এই লাস শুভার লাস কি না সে সম্বন্ধে প্রমাণ মাদার ক্রিশ্চিয়ানা, শুভার আয়া এবং খানসামা। তাঁহাদের সাক্ষ্য বিশ্বাস করিলে এটা যে শুভারই লাস একথা স্বীকার করিতে হয়। লাসটি যেখানে পাওয়া গিয়াছে সেই পুকুরের গায় লাগা সত্যেন্দ্রের একখানা ভাড়াটিয়া বাড়ী আছে। সে বাড়ীটা সে সময়ে খালি পড়িয়াছিল। সে বাড়ী সন্ধান করিয়া কোনও কিছুই পাওয়া যায় নাই, তবে বাগানে যেদিকে পুকুর সেই দিককার দেওয়ালে, খানিকটা আস্তর ভাঙ্গিয়া পড়া এবং সেই দিককার ফুলগাছগুলি কতকটা ভাঙ্গাচোরা দেখা যায়। এ সম্বন্ধেও সব ইন্‌স্পেক্টরের সাক্ষ্য উপস্থিত করা হইবে।

এই মর্ম্মে সমুদয় প্রমাণের একটা সাধারণ পরিচয় দিয়া ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল একে একে সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করিলেন। সমস্ত দিন ধরিয়া সকল সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করা হইল। প্রত্যেক সাক্ষীকে ওডনেল সাহেব তন্ন তন্ন করিয়া জেরা করিলেন' তাহাতে বিশেষ কিছু ফল হইল না। সব সাক্ষীর জবানবন্দী শেষ হইয়া গেলে বেলা ৪ টা বাজিল। তখন জজ ওডনেল ও মিত্র সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাঁহারা কোনও সাফাই সাক্ষী দিবেন কি না। ওডনেল উঠিয়া বলিলেন, "ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল মহাশয়ের কথায় দেখা যায় যে যখন কিড ষ্ট্রীটের বাড়ীর ঘটনা ঘটিয়াছিল; যখন সেখানে সত্যেন্দ্রের কোচোয়ান দুইটি সহিস ও দুইজন দরোয়ান উপস্থিত ছিল। আসামী পক্ষের বক্তব্য এই যে শুভা তখন তাহাদের সম্মুখ দিয়া স্বইচ্ছায় গৃহ ছাড়িয়া বাহির হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা শুভাকে একা বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়াছে। সুতরাং এই সাক্ষীদিগকে সরকার পক্ষ হইতে উপস্থিত করা উচিত। ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল যদি তাহা করেন তবে আসামী পক্ষ কোনও সাফাই সাক্ষী

উপস্থিত করিতে চাহেন না। হুজুর ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল মহাশয়কে সেই সাক্ষী উপস্থিত করিতে আজ্ঞা করুন।"

ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল আপত্তি করিলেন যে ইহারা সত্যেন্দ্রের লোক, ইহাদের সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিবার যথেষ্ট হেতু আছে, এ অবস্থায় সরকার পক্ষ এ সাক্ষী উপস্থিত করিতে বাধ্য নহে। এই কথা লইয়া উভয় পক্ষে অনেক বাদানুবাদের পর জজ হুকুম দিলেন যে ঐ সাক্ষীদিগকে কোর্টের পক্ষের সাক্ষীরূপে উপস্থিত করা হউক। তাহা হইলে উভয় পক্ষ হইতেই তাহাদিগকে জেরা করিতে পারিবেন। এই প্রণালীর আর একটি ফল এই হইল যে সরকার পক্ষের সওয়াল জবাবের পর আসামী পক্ষ জুরীকে আপনার বক্তব্য আপনার মত করিয়া বলিতে পারিবেন। ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেলের প্রত্যুত্তর করিবার অধিকার থাকিবে না। আসামী পক্ষ সাক্ষী উপস্থিত করিলে সরকার পক্ষের শেষ উত্তর দিবার অধিকার থাকিত। এই সাক্ষীদের জবানবন্দীর জন্য মোকদ্দমা সে দিনকার মত মুলতবী রহিল। জজ সাহেব জুরীদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন যে ইতিমধ্যে যেন তাঁহারা এই মোকদ্দমার বিষয় লইয়া বাহিরে কোনও আলোচনা না করেন এবং বাহিরের কাহারও কথা না শুনেন।

ওডনেল সাহেব তখন আপনার চেম্বারে গেলেন, সেখানে এই মোকদ্দমার অন্যান্য ব্যারিষ্টার ও এটর্ণীরা এবং সত্যেন ও নগেন গিয়া জুটিল। জজ সাহেবের বিশেষ অনুগ্রহে সত্যেন্দ্র জামিনে খালাস ছিল।

ওডনেল সাহেব বলিলেন, "সাক্ষীর যে অবস্থা, তাতে জুরীকে বোঝান ভয়ানক কঠিন হইবে।" মিঃ মিত্র এ বিষয়ে আপত্তি করিলেন, তাঁহার বিবেচনায় এ প্রমাণে শাস্তি হইতেই পারে না। এই লইয়া অনেক

কাগজ ঘাঁটাঘাঁটি অনেক তর্ক বিতর্ক অনেক নজীর টানাটানি হইল। শেষে ওডনেল বলিলেন, "দেখা যাক, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। নিঃশব্দে বিষণ্ণচিত্তে সত্যেন ও নগেন গিয়া গাড়ীতে উঠিল, সমস্ত রাস্তা তাহারা সম্পূর্ণ নীরব রহিল। কিন্তু মাথার ভিতর তা'দের বিশ্বজোড়া দুশ্চিন্তা। আসন্ন বিপদের ভারে তা'দের বুক ভরিয়া রহিয়াছে, তাই তাহারা কোনও কথা কহিতে পারিল না। নগেনের প্রাণের ভিতর দাবানল জ্বলিতেছিল। সমস্তই যে তা'র দোষ সে বিষয়ে তার সন্দেহ মাত্র ছিল না; তাই সে নিজের মনকে দিন রাত চাবুক মারিতেছিল আর নিরন্তর নীরবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেছিল যে তার পাপের শাস্তি যেন সে নিজেই পায়, নির্দ্দোষ, হিতৈষী মেজদার ঘাড়ে যেন সে বোঝা না চাপে।

[১৭]

পরের দিন ১১টার সময় বিচার আরম্ভ হইল। সত্যেন্দ্রের সহিস, এবং দারোয়ান বলিল যে, তাহারা শুভাকে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় যাইতে দেখিয়াছে। একজন সহিস ও কোচোয়ান বলিল, যে বাহির হইয়া শুভা একখানা ট্যাক্সি ডাকিয়া তাহাতে উঠিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল উঠিয়া তাহাদিগকে জেরা করিলেন। তিনি

কেবল কোচোয়ান ও সহিসকে শুটি দুই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রথম, ট্যাক্সিখানা পূর্ব্ব হইতেই সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল কি না, এবং তাহার ভিতর জীবন পাল বসিয়া ছিল কি না। প্রশ্নে দুইজনেই একটু ঘাবড়াইয়া গেল। দুইজনেই বলিল, ট্যাক্সি সে সময় রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। কিন্তু কোচোয়ান বলিল, তাহা পূর্ব্ব হইতে আসিয়া পশ্চিমদিকে যাইতেছিল, আর সহিস বলিল যে তাহা পশ্চিম হইতে পূর্ব্বের দিকে যাইতেছিল। জীবন পালকে তাহারা গাড়ীতে দেখে নাই। ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেলের আর এক প্রশ্নের উত্তরে প্রকাশ হইল, ট্যাক্সিখানা ঢাকা গাড়ী ছিল, ভিতরে লোক থাকিলে তাহাদের না দেখা অসম্ভব নয়।

ওডনেল সাহেব ও মিত্র সাহেব ইহাদিগকে জেরা করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। তখন পুনরায় সত্যেন্দ্র ও জীবনকে জিজ্ঞাসা করা হইল। তাহাদের পক্ষে কি বলিবার আছে। সত্যেন্দ্র ও জীবন পাল সংক্ষেপে বলিল, তাহারা নির্দ্দোষ, শুভা কোথায় গিয়াছে তাহারা জানে না। তখন ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল তাঁহার শেষ বক্তৃতা করিয়া সমস্ত অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া জুরীদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। ওডনেল সাহেব বক্তৃতা করিতে উঠিবার সময় তাঁহার কাছে একটি জুনিয়ার ব্যারিষ্টার আসিয়া কাণে কাণে কি বলিলেন। ওডনেলের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি জজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হুজুর একটি অপ্রত্যাশিত সাক্ষী আসিয়া হাজির হইয়াছে। আমার বন্ধু বলিতেছেন, যে একটি মোটর চালক এই কোর্টের বাহিরে উপস্থিত হইয়াছে। সে কাল বাঙ্গলা সংবাদপত্রের রিপোর্টে পড়িয়া বুঝিতে পারিয়াছে, যে সেই শুভাকে কিড্ ষ্ট্রীটের বাড়ী হইতে লইয়া গিয়াছিল। আমার পক্ষের সলিসিটার তাহার কাছে সে কি সাক্ষ্য দিতে পারে তাহা জানিতে

গিয়াছেন। হুজুর যদি পাঁচ মিনিটের জন্য আমাকে সময় দেন তবে সম্ভবতঃ আমি সেই সাক্ষী উপস্থিত করিয়া আমার মক্কেলের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে পারিব।"

সমস্ত কোর্টময় একটা বিস্ময়ের ধাক্কা লাগিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে শফার উপস্থিত হইল। ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেলে কোর্টের আদেশে তাহাকে সরকারী সাক্ষী স্বরূপে উপস্থিত করিলেন। সে প্রমাণ করিল যে, ঘটনার তারিখে সে কিড্ ষ্ট্রীট হইতে একটি মহিলাকে উঠাইয়া লইয়া পুলিস কোর্টে গিয়াছিল, সেখান হইতে জীবন পালকে উঠাইয়া লইয়া সে হাইকোর্টের কাছে এটর্ণীর আফিসে, সেখান হইতে রেজেষ্ট্রী আফিসে এবং জেনারেল পোষ্ট আফিস হইয়া শিয়ালদহ গিয়া মহিলাটিকে নামাইয়া দেয়।

ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল এই সাক্ষীকে বিরুদ্ধ বলিয়া ইহার জেরা করিতে অনুমতি চাহিলে, তাহা লইয়া খানিকক্ষণ বাদানুবাদ চলিল। এমন সময় জজ সাহেবের চাপরাসী একখানা পত্র আনিয়া জজকে দিল। জজ পত্র পড়িয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিলেন—চাপরাসীকে কি বলিয়া, ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেলকে বলিলেন, "আর একটি খুব প্রয়োজনীয় সাক্ষী হঠাৎ হাজির হইয়াছে। মাদার ক্রিশ্চিয়ানা লিখিয়াছেন যে শুভাকে পাওয়া গিয়াছে এবং তিনি তাহাকে লইয়া সাক্ষীদের বসিবার ঘরে উপস্থিত আছেন। আমি তাহাকে কোর্টে আসিতে বলিয়াছি।"

সমস্ত ঘরময় একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ বহিয়া গেল। সবাই দ্বারের দিকে চাহিল। তখন মাদার ক্রিশ্চিয়ানা শুভা ও চাঁপা প্রবেশ করিল। "ওঃ শুভা" বলিয়া নগেন চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার এটর্ণী তাহাকে ধরিয়া বসাইলেন। ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল মাদার ক্রিশ্চানের সঙ্গে দুই একটা

কথা বলিয়া তাঁহাকে সাক্ষীর কাটগড়ায় উঠাইয়া দিলেন। তিনি শপথ করিয়া বলিলেন যে উপস্থিত ব্যক্তিই শুভা, ইহারই হত্যার অপরাধে সত্যেন্দ্র ও জীবন পাল অভিযুক্ত।

শুভা তারপর ডকে গিয়া দাঁড়াইল।

ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, "তোমার নাম কি ?"

শুভা ভয়ানক কাঁপিতেছিল, শুষ্ককণ্ঠে সে উত্তর করিল, "শুভসঙ্গিনী দেবী।"

"তুমি বেশ্যা ?"

শুভার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল ; তাহার কান্না পাইতে লাগিল। সে খুব জোর করিয়া বলিল, "না ?"

ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল হাসিয়া বলিলেন, "তবে কি ?"

শুভা একটু ভাবিয়া বলিল, "আমি একট্রেস।"

ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল হাসিয়া বলিলেন, "A difference between Tweedledum aud Twiddledee." সবাই হাসিয়া উঠিল।

জিজ্ঞাসা হইল, "তুমি—তারিখে নগেন্দ্রনাথ রায়ের রক্ষিতা ছিলে ?"

শুভার বুক লজ্জায় ঘৃণায় ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সে একটুখানি ভাবিয়া দেখিল যে নগেনের সঙ্গে তাহার যে সম্বন্ধ তাহাকে এ ছাড়া অন্য কোনও নাম দেওয়া যায় না। কাজেই এ অপমান তার ঘাড় পাতিয়া লইতেই হইবে। সে বলিল, "আমি নগেনবাবুর বাড়ীতে ছিলাম, তিনি আমায় ভালবাসিতেন।"

ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল আবার হাসিলেন, বলিলেন,—Ah yes ! call a spade anythihg but a spade. সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, শুভা দারুণ লজ্জায় মরিয়া গেল, সে কাঁদিয়া ফেলিল। তার

কান্না দেখিয়া নগেনের ইচ্ছা হইল সে উঠিয়া গিয়া ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেলের মুখের উপর একটা পদাঘাত করে। সে লাফাইয়া উঠিয়া তাহার ব্যারিষ্টারকে কি বলিল, ওডনেল তাহাকে থামাইয়া বসাইলেন। তার পর ঘটনা সম্বন্ধে প্রশ্ন হইল। শুভা কাঁদিতে কাঁদিতে, ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে সমস্ত অবস্থা বলিল।

তাহার জবানবন্দী শেষ হইলে ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল বলিলেন, "এ সাক্ষীর পর আমি বলিতে পারি না যে এ মোকদ্দমা আর চলিতে পারে। কিন্তু এ দুইটী সাক্ষী হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এদের কথার সত্য মিথ্যা সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। আসামীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার পূর্ব্বে আমরা সমস্ত অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য একটু সময় চাই। হুজুর যদি অনুগ্রহ করিয়া কালকের জন্য মোকদ্দমাটী মুলতবী রাখেন তবে আমি আমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ঠিক করিতে পারি।"

জজ বলিলেন, "এই যে শুভা সে বিষয় কি আপনার কোন সন্দেহ আছে?"

"আমি কিছুই বলিতে পারি না। আমরা আর একটু অনুসন্ধান না করিয়া এ বিষয়ে হাঁ কি না কিছুই বলিতে পারি না। এই মেয়েটী সত্য সত্য শুভা কি না—"

সরকারী সলিসিটার ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেলকে কি একটা কথা বলিলেন। শুনিয়া তিনি কিছুক্ষণ তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া আবার কোর্টকে বলিলেন, "আমার বন্ধু আমাকে বলিতেছেন যে এ মেয়েটির নাম অন্য ও এ একটি নামজাদা একট্রেস। আমরা এ সম্বন্ধে একটু অনুসন্ধান করিতে চাই। আর হুজুরের অনুমতি লইয়া আমি ইহাকে আর দুই একটা প্রশ্ন করিতে চাই।"

"আপনি কি জিজ্ঞাসা করিতে চান ?"

"হুজুর, সাক্ষী ইংরাজী জানে, আমার প্রশ্নটী আপনাকে জানাইয়া সে সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।"

তখন জজ সাহেব শুভাকে অন্য ঘরে পাঠাইয়া দিয়া ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল এবং অপরপক্ষের ব্যারিষ্টারের মন্তব্য শুনিলেন। তাহার পর শুভাকে পুনরায় ডাকাইয়া ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেলকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অনুমতি দিলেন। ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম সুরবালা নয় ?"

"না, তবে"—

"থাক্। তুমি এলবার্ট থিয়েটারের prima donna ?"

"হাঁ।"

"তুমি সেখানে সুশীলা নাটকে সুশীলার পার্ট অভিনয় কর ?"

"হাঁ।"

"তুমি কি শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে যে এলবার্ট থিয়েটারে যে সুশীলার পার্ট অভিনয় করে তার নাম সুরবালা ?"

"না। সুরবালা নামে আমি ষ্টেজে পরিচিত।"

"তুমি বলিতে চাও এটা তোমার সত্য নাম নয় ?"

"তাই।"

"তুমি নাম ভাঁড়াইয়াছ কেন ?"

জজ এখানে বলিলেন—মিষ্টার ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল, stage-name অনেকেরই অনেক রকম থাকে না কি ?"

"আমাদের দেশে থাকে সত্য। কিন্তু এ দেশে সে রেওয়াজ নাই। হুজুর মনে রাখিবেন, যে [illegible], তারা নাম গোপন করার চেয়ে নামটা জাহির করাই বেশী লাভজনক মনে করে।"

"যাহাই হউক, এ প্রশ্ন অনাবশ্যক।"

ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি—তারিখে এলবার্ট থিয়েটারে অভিনয় আরম্ভ কর?"

"হাঁ।"

"তোমার কথা অনুসারে তুমি তার চার দিন পূর্ব্বে জলপাইগুড়িতে ছিলে?"

"হাঁ।"

"এর আগে তুমি কখনও অভিনয় করনি?"

"কেবল একদিন কমলা থিয়েটারের একটা সীনে এক্ট ক'রে ছিলাম।"

"সুশীলার পার্টটা খুব বড় এবং খুব কঠিন নয় কি?"

"হাঁ।"

"তুমি বলতে চাও যে তোমার মত একজন আনকোরা নূতন লোক তিন দিনের মধ্যে এত বড় একটা পার্ট তৈয়ার করে ফেলতে পারে?"

"আমি ক'রেছি তাই আমি জানি।"

ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল বলিলেন, "আপাততঃ আর আমি কিছুই জিজ্ঞাসা ক'রতে চাই না। এ সাক্ষী যা' বলেছে তা' হ'তে হুজুর এবং জুরী মহোদয়গণ অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে এই সাক্ষীর জবানবন্দী বিষয়ে যেন একটু সন্দেহের অবসর আছে। এ সুরবালা নামে পরিচিত, কিন্তু আমরা চাই শুভার জবানবন্দী। এ বলে এই শুভা এবং—তারিখে এ নগেনের রক্ষিতা রূপে কিড্ ষ্ট্রীটে ছিল। সেখান থেকে তাড়িত হ'য়ে জলপাইগুড়ি ঘুরে এসে তিন দিনে সুশীলার part শিখে নাট্যজগতে একটা মস্ত খ্যাতিলাভ ক'রেছে। এ কথা মিথ্যা তা' এখন আমি জোর ক'রে ব'লতে চাই না। কিন্তু এ কথা বিশ্বাস ক'রতে বেশ একটু কষ্ট

ক[illegible] প্রয়োজন হয় [illegible] এর থেকে বোঝা যায় যে সন্দেহের যথে[illegible]বসর আছে। [illegible] কেবল একদিন মাত্র সময় চাই এ বিষয় বিবেচনা করে' এ সম্বন্ধে [illegible]মার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ ক'রতে।

জজ বলিলেন, [illegible]েন্দ্র এখানে উপস্থিত আছে?"

ওডনেল ব[illegible], "হাঁ হুজুর।" নগেন দাঁড়াইয়া সেলাম করিল।

নগেনকে [illegible]ঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া তাহাকে শুভার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইল। সে শুভার সঙ্গে তার পরিচয়ের সমস্ত বিবরণ অকপটে বলিয়া গেল। তার পর জজ জুরীর ফোরম্যানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কি এ বিষয়ে আর কোনও সাক্ষী প্রমাণ আবশ্যক মনে করেন?"

ফোরম্যান সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বলিলেন "না হুজুর আমরা সকলেই মনে করি এই নারী যে শুভা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেলকে তখন জজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ অবস্থায় আপনি মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া সঙ্গত বোধ করেন না কি?"

ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল তাঁর পক্ষের লোকের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বলিলেন, "হুজুরের এবং জুরীগণের যখন এই মত তখন আমি মোকদ্দমা উঠাইয়া লইলাম।"

সমস্ত আদালতময় একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। সত্যেন্দ্রকে কাঠগড়া হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল, তিনি বাহির হইয়া বারান্দায় একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার চারিদিকে লোক ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

যখন মাদার ক্রিশ্চিয়ানার সঙ্গে শুভা ও চাঁপা বাহির হইয়া আসিল তখন তাহাদিগের পিছু পিছু এক পাল লোক ফিরিতে লাগিল।

শুভা সত্যেন্দ্রের কাছে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল,

"আমার জন্য আপনি এত কষ্ট পেলেন। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি যদি আগে বিন্দুবিসর্গও জানতাম, তবে আপনার কষ্ট পেতে হ'ত না।"

সত্যেন্দ্র কেবলি চক্ষু মুছিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর বলিলেন, "তুমি আমায় ক্ষমা করো বাছা। তোমার উপর যে অত্যাচার ক'রে-ছিলাম ভগবান তার শাস্তি দিয়েছেন।"

শুভা বলিল, "ওকথা ব'লবেন না। আশীর্ব্বাদ করুন আর যেন আপনাদের কষ্ট না দিই।"

নগেনের দিকে শুভা একবার চাহিল, কোনও কথা বলিল না। নগেনও চাহিল, কোনও কথা বলিতে পারিল না।

শুভার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

সেই দিন দ্বিপ্রহরে শুভা চাঁপাকে লইয়া মাদার ক্রিশ্চিয়ানার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল। তাঁর কাছে সংবাদ পাঠাইতেই তিনি ছুটিয়া নীচে আসিলেন, এবং শুভাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, কেবল বলিলেন, "ওঃ শুভা! শুভা! তুমি বেঁচে আছ?"

তার পর তাঁর খেয়াল হইল যে সত্যেন্দ্র রায় শুভাকে হত্যার অপরাধে তখনও বিচারালয়ে।

তাই তিনি তৎক্ষণাৎ শুভাকে লইয়া ছুটিয়া হাইকোর্টে গেলেন এবং সেখানে গিয়া জজকে খবর পাঠাইলেন।

বাড়ী ফিরিবার জন্য গাড়ীতে উঠিয়াই শুভা কাঁদিয়া ফেলিল, সে কান্না যেন থামিতে চাহে না। চাঁপা তাহাকে সস্নেহে জড়াইয়া ধরিল ও যথাসম্ভব সান্ত্বনা দিতে লাগিল। অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদিবার পর শুভা বলিল, "দিদি, কেন আবার দেখলাম?"
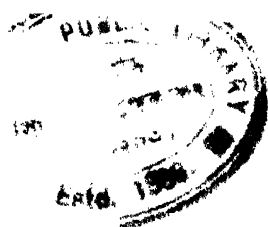
[১৮]

সেদিন আদালত হইতে সবাই উৎফুল্ল হৃদয়ে ফিরিল। নগেনও যে একেবারে খুসী না হইয়াছিল এমন নহে; কেন না, এক দফা, তার দাদা বেকসুর খালাস হইলেন, আর দ্বিতীয়তঃ, শুভা বাঁচিয়া আছে, তাকে সে চোখে দেখিয়াছে। খুব উৎফুল্ল হইবার এই দুইটি বড় রকমের বৈধ হেতু থাকা সত্ত্বেও নগেনের সমস্ত মনটা যেন একটা ভীষণ বেদনায় পীড়িত হইতে লাগিল। তার প্রাণের গোড়া ধরিয়া যেন কে টানিতে লাগিল, হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ একেবারে তোলপাড় হইতে লাগিল। এতদিন সে জানিয়াছিল, শুভা মরিয়াছে—মোকদ্দমার সে লাসটি যে শুভার লাস, পুলিশের কাছে অস্বীকার করিলেও সে নিজে মনে মনে তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছিল। এতদিন তাই সে সুখে না থাকিলেও স্বস্তিতে ছিল। তার পুরাতন প্রেম একটা স্নিগ্ধ-স্মৃতিরূপে তাহার মনের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে গোপনে তাহার অর্ঘ্য যোগাইত, গোপনে হৃদয়ের রক্ত দিয়া সে তাহার পূজা করিত। কিন্তু আজ সে শুভাকে দেখিয়াছে, শুভা বাঁচিয়া আছে—তাহার সমস্ত মন প্রাণ আজ শুভার দিকে প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়া চলিল, প্রাণের ভিতর তুফান তুলিয়া তার প্রেম তা'কে ভাসাইয়া লইয়া চলিল।

এই কয়েক দিনের বেদনায় তার কর্ত্তব্যবুদ্ধির অগ্নিসংস্কার হইয়া গিয়াছিল, তাই এই তীব্র কামনা তাহাকে উৎফুল্ল না করিয়া পীড়িত করিল। সে মনের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাই

সবার মুখ যখন উৎফুল্ল, তার মুখ তখন একেবারে শুষ্ক, একেবারে অন্ধকার হইয়া রহিল।

বাড়ীতে আসিয়াই সে ছুটিয়া আপনার ঘরে গেল। চপলা তার পিছু পিছু আসিয়া জুটিল। খোস খবরটা ইহার আগেই সে পাইয়াছিল। খবর পাইয়াও সে সুখী হয় নাই—তার মনও একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিতেছিল। এখন তো শুভাকে আবার পাওয়া গিয়াছে, এখন তার স্বামী কি করিবে তাই ভাবিয়া তার বুক কাঁপিতেছিল। এ সম্ভাবনা সে অনেক দিন কল্পনা করিয়াছে, অনেক ভাবিয়াছে, কিন্তু এ সম্বন্ধে তার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সে স্থির করিতে পারে নাই। স্বামীর মনের দুঃখ দেখিতে তার বুক ফাটিয়া যায়, কিন্তু আবার স্বামী যে অন্য কাহাকেও ভালবাসিবে ইহাও ত সে সহিতে পারে না। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা তার মনে জাগিয়া উঠিত, কিন্তু পরক্ষণেই সে আবার পিছ-পা হইত। ত্যাগ না হয় সে করিল, কিন্তু স্বামীর তো ইহাতে ভাল হইবে না। অধর্ম্মে কখনও কার ভাল হয় না, একথা অবিশ্বাস করিবার মত শিক্ষা সে কখনও পায় নাই। তা' ছাড়া ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিলেও তার স্বামীর প্রতিষ্ঠা, তার আত্মীয় ও বন্ধুর কাছে তাহার সুনাম ও সমাদর সব ভাসিয়া গেলে সে বাঁচিবে কি করিয়া? চারিদিকে লোকে যদি নগেনকে নিন্দা করে তবে সে তাহা শুনিবে কি করিয়া?

এই রকম আকাশ পাতাল চিন্তা সেও করিতেছিল। স্বামী বাড়ী ফিরিতে তার মুখ দেখিয়া সে বুঝিল—তাঁর মনে কিসের একটা ঝড় বহিতেছে। তার প্রাণের ভিতর হাহাকার করিয়া উঠিল, সে নগেনের পিছু পিছু তাহার ঘরে ঢুকিয়া তাহার সেবায় নিযুক্ত

হইল। নগেন কাপড় ছাড়িয়া মুখ হাত ধুইল। খাবার ঘরেই ঢাকা ছিল, চপলা তাহার সাম্‌নে গিয়া সম্মুখে বসিল। ইলেক্‌ট্রিক পাখা চলিতেছিল, তাই পাখা করিবার ওজুহাত মিলিল না, চপলা শুধু শুধুই বসিল।

অনেকক্ষণ বিশেষ কোনও কথা কেউ বলিল না। দু'জনেরই বুক ফাটিয়া যাইতেছিল একটা কথা তুলিবার জন্য, কিন্তু কেহই ভরসা করিয়া নিজে সে কথা তুলিতে পারিল না। শেষে চপলা বলিল, "ভগবান রক্ষে ক'রেছেন—এ ক'দিন যে ভাবে দিন কেটেছে। বাবা গো! এখন কালীঘাটে একটা ঘটা করে পূজো দিতে হ'বে। মায়ের দয়ায় রক্ষে হ'য়েছেন মেজঠাকুর।"

নগেন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "ভগবান রক্ষে ক'রেছেন না মারতে ব'সেছেন এখনো বুঝতে পারছি না। দাদা খালাস হ'তেনই। ওডনেল সাহেব বল্লে যে ট্যাক্সী ড্রাইভারের সাক্ষীর পর জুরী কখনই মেজদাকে দোষী সাব্যস্ত ক'রতে পারতো না। কিন্তু এখন আমি রক্ষা পেলে হয়?" চপলা পুলকিত হইল। সে বলিল "ধর্ম্ম তোমাকে রক্ষা ক'রবেন, তোমার কোনও ভয় নাই।"

নগেনের মনে হইল যেন এটা একটা দৈববাণী। এই ক্ষুদ্র বালিকার এই সামান্য আশ্বাসে সে এত শান্তি পাইল যে হাজার ধর্ম্ম উপদেশে তাহা পাইত না।

তার পর তাহাদের ভিতর আড়ালটা কাটিয়া গেল, তা'রা মনের আনন্দে আলাপ করিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় নগেন্দ্র কাপড় চোপড় পরিয়া বাহির হইল, শ্যামবাজারে তার মামার কাছে এ খবরটা একবার নিজে দিয়া আসিতে হইবে।

শ্যামবাজারের ট্রামে উঠিয়া সে সটান মামার বাড়ী গেল। সেখান হইতে ফিরিতে প্রায় নয়টা বাজিল। ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে তার মনে হইল খানিকটা হাঁটিয়া যাওয়া যা'ক। খানিকদূর আসিয়া সে এলবার্ট থিয়েটারের ফটকের সামনে থমকিয়া দাঁড়াইল। সেদিন থিয়েটার বন্ধ, কিন্তু রুদ্ধ দুয়ারের ভিতর দিয়া ও কি সঙ্গীতের অমৃতধারা তাহার প্রাণে আসিয়া আঘাত করিল! নগেন নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভিতরে রিহার্সাল হইতেছিল, শুভা তখন তার একটা নামজাদা গান গাহিতেছিল। নগেন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। শুভার সেই চিরপরিচিত অমৃতকণ্ঠ তরঙ্গে তরঙ্গে সঙ্গীতলহরী ছাড়িয়া নগেনের হৃদয় আলোড়িত করিতে লাগিল—নগেন আর কিছুতেই চলিতে পারিল না।

গান থামিয়া গেল। তার পর কেবল থাকিয়া থাকিয়া শুভার কণ্ঠ এক আধবার শুনা যাইতে লাগিল। ক্ষুধাপীড়িত দরিদ্র যেমন চোরের মত সন্তর্পণে ধনীর প্রাসাদ-অঙ্গনে ক্ষুদ কুড়াইয়া বেড়ায়, নগেন তেমনি করিয়া শুভার এই ক্বচিৎশ্রুতকথাগুলি কুড়াইতে লাগিল। তাহার ট্রাম আসিয়া চলিয়া গেল। একটা দুইটা করিয়া চার পাঁচটা ট্রাম চলিয়া গেল, নগেন দেখিতে পাইল না, গ্রাহ্য করিল না। তার সমস্ত সত্তা তখন ওই শব্দের সন্ধানে নিযুক্ত ছিল।

তার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা হইল একবার ষ্টেজের ভিতর কোনওক্রমে ঢুকিয়া পড়ে, অনেক কষ্টে সে ইচ্ছা দমন- করিয়া কেবল অস্থিরভাবে রাস্তায় পায়চারী করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে একখানা গাড়ী আসিয়া ফটকের ভিতর ঢুকিল। নগেন উদ্‌গ্রীব হইয়া সেই গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার অনুমান মিথ্যা নয়, শুভা আসিয়া সেই গাড়ীতে উঠিল। নগেন ফটকের পাশে

গিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী যখন তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল তখন সে ডাকিল "শুভা!"

শুভা গাড়ীতে একা ছিল। সে চমকিয়া উঠিয়া মুখ বাড়াইল। নগেনকে দেখিয়া তা'র বুকের ভিতর ভয়ানক কাঁপিয়া উঠিল। একবার মনে হইল গাড়ী খুলিয়া ছুটিয়া বাহির হয়। কিন্তু তখনই সে মন শক্ত করিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া পড়িল। গাড়ী চলিয়া গেল।

অনেকক্ষণ নগেন্ন সেইদিকে চাহিয়া রহিল। তাহারও মনে হইতেছিল যে সে ছুটিয়া গিয়া গাড়ী ধরে, কিন্তু কেবল লজ্জায় বাধিল। সে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। একটু পরে আর একখানা ট্রাম আসিল, সে তাহাতে উঠিয়া বাড়ী গেল।

নগেনের মনটা দারুণ অন্ধকারে ভরিয়া গেল। আজকার এই দুর্ব্বলতার জন্ম তার হাত পা কামড়াইতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। এই চরিত্রবল লইয়া সে কেমন করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিবে, কেমন করিয়া চপলার প্রতি তাহার কর্ত্তব্য করিবে? শুভা কলিকাতায় থাকিতে তার পক্ষে এই প্রলোভন তো রোজ হইবে। আজই মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প করিবামাত্রই যদি সে এমন করিয়া আত্মহারা হইতে পারিল তবে বারোমাস ত্রিশদ্দিন সে কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিবে। সে মনে মনে নিজেকে এবং নিজের অদৃষ্টকে শাপিতে শাপিতে শুষ্কমুখে বাড়ীতে আসিয়া নামিল।

রাস্তায় সে মনে করিয়াছিল বাড়ীতে আসিয়া সে সব কথা চপলাকে খুলিয়া বলিবে। কিন্তু চপলাকে দেখিয়া সে কি জানি কেন, ভয়ানক সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, সে কিছুই বলিতে পারিল না। চপলা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রাণের ভিতর একটা ধাক্কা খাইল। কিন্তু সেও কি ভাবিয়া কিছু বলিল না। দু'জনের ভিতর আজ একটা আত্মতৃপ্তির পর্দ্দা পড়িয়া গেল।

পরের শনিবার দিন চপলা তার জা'দের ধরিয়া বসিল থিয়েটারে যাইতে হইবে। এলবার্ট থিয়েটারে একটা নূতন নাটকের অভিনয় হইবে এই তাহার ওজুহাত, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে সে দেখিতে চাহিল শুভাকে। সন্ধ্যাবেলায় তাহারা সাজিয়া গুজিয়া তৈয়ার হইল, বাড়ীর সরকার মহাশয় সঙ্গে যাইবেন স্থির হইল। সন্ধ্যার পর নগেন আসিয়া সব আয়োজন দেখিয়া বলিল, "কোথায় যাওয়া হচ্ছে?"

চপলা একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "থিয়েটারে।"

"কোন থিয়েটার?"

"এলবার্ট।"

কথাটায় দু'জনেই একটু চুপ মারিয়া গেল। খানিক পরে নগেন নিজেকে সামলাইয়া বেশ সহজ সুরেই বলিল, "সঙ্গে যাবে কে?"

চপলা, কি জানি কেন, একথায় বড় লজ্জিত বোধ করিল। অপ্রস্তুত ভাবে উত্তর করিল, "সরকার ম'শায়।"

নগেন কোনও কথা বলিল না। তা'র মনে পড়িল, এ পর্য্যন্ত কোনও দিন চপলা তাহাকে ছাড়িয়া থিয়েটারে যায় নাই। আজ যে তাহাকে বাদ দিবার তাৎপর্য্য কি তাই মনে করিয়া তাহার একটু রাগ হইল। তাকে এতটা অবিশ্বাস! তখন রাগের মাথায় তার মনে হইল না যে অবিশ্বাস করিবার হেতু আছে।

চপলা কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "তুমি মানা কর তো যাব না।"

নগেন বলিল, "না, যাও।"

চপলা বলিল, "না, যাব না।" বলিয়া বিষণ্ণ মুখে ব্রুচ খুলিতে লাগিল।

নগেন বাধা দিয়া বলিল, "দেখ পাগলামি করো না। যাবে না কেন? আমি তো তোমায় মানা করছি না। তবে আমাকে আগে বল্লে কোনও দোষ ছিল না।"

চপলা একটু মিথ্যা বলিল, "এইমাত্র আমাদের ঠিক হ'ল তার আগে ব'লবো কখন। তা' আমি কি যেতে চাচ্ছি! তুমি না যেতে বল্লে আমি কবেই বা কোথায় যাই।" তাহার ঠোঁট একটু ফুলিয়া উঠিল।

নগেন বলিল, "আরে পাগল কোথাকার? আমি কি তোমায় মানা ক'রছি? মানা করবোই বা কেন? আমার কথাটা আগে শোনই! আমি ঠিক ক'রেছিলাম তোমাকে নিয়ে বায়স্কোপ দেখতে যাব তাই ব'লছিলাম, আগে বল্লেই হ'ত।"

নগেনের কথাটাও মিথ্যা। এ ওজুহাত সে এখনি সৃষ্টি করিল।

"তবে তাই চল না, আমি না হয় দিদিদের ব'লে আসি।" কিন্তু কথাটা একটু অভিমানের সুরে বলা হইল। বলা বাহুল্য নগেনের ওজু-হাত চপলা বিশ্বাস করিল না।

নগেন তখন অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া চপলাকে থিয়েটারে পাঠাইল এবং সে নিজে বায়স্কোপে গেল।

নগেন ভাবিতে লাগিল। সে কিছু না প্রকাশ করিলেও তাহার ও চপলার মধ্যে আজ যে অন্তরালটার সৃষ্টি হইয়াছে সে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল! এই যে মিথ্যা কথা, এই সন্দেহের পর্দ্দা ইহা তাহাদের মধ্যে এতদিন কখনও ছিল না। শুভা আসিয়া আজ তাহাদের মধ্যখানে দাঁড়াইয়াছে তাই এ অন্তরাল, তাই এ সন্দেহ। নগেনের মনে হইল এটাকে একদম ভাঙ্গিয়া ফেলা দরকার, ঠিক করিল তা'র নিজের মন পরিষ্কার করিতে হইবে এবং স্ত্রীর সঙ্গে ঠিক আগের মত সহজ সরল ব্যবহার করিতে হইবে।

কিন্তু তাহা সে পারিল না। সে কথা পরে হইবে।

[১৯]

চপলা থিয়েটার দেখিয়া সুখী হইল না। সে যতই মনে মনে শুভার প্রতি সহৃদয় হইবার সংকল্প করুক না কেন, তার অন্তরের ভিতর যে অন্তর, সে তাহার সংকল্পে মোটেই সাড়া দিতেছিল না। শুভার প্রতি তা'র একটা মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ জন্মিয়া গিয়াছিল। সেটাকে সে নানা রকমে মোলায়েম করিয়া নরম করিয়া রাখিতে চাহিতেছিল, কিন্তু বিদ্বেষ নানা আকারে ছুটিয়া বাহির হইল।

সেদিন শুভার অভিনয়ে একেবারে ভয়ানক হৈ হৈ পড়িয়া গেল। দর্শকগণ তাহার কথায় কথায় ঘোর করতালি দিয়া উঠিল, প্রত্যেক গানে এন্‌কোর দিতে লাগিল। তাহাকে লইয়া মোটের উপর ভয়ানক একটা মাতামাতি লাগিয়া গেল। অভিনয় চাতুর্য্যে যে সে এই প্রশংসার যোগ্য হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই মাতামাতির গূঢ়তর হেতু সত্যেন্দ্রের মোকদ্দমা। এই মোকদ্দমায় শুভার নাম বেশ দেশান্তরে ছাইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহার প্রতি সকলের হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাই আজকার অভিনয় এতটা অভিনন্দনের বাড়াবাড়ি। অভিনয় শেষ হইলে একজন বলিয়া উঠিল "Three cheers for Subha" সব ঘর শুদ্ধ লোক চীৎকার করিয়া উঠিল "হিপ্ হিপ্ হুরে," "হিপ্ হিপ্ হুরে," "হিপ্ হিপ্ হুরে।"

হঠাৎ আবার ড্রপসিন উঠিয়া গেল, ষ্টেজের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া শুভা সকলকে গভীরভাবে নমস্কার করিল। আবার সীন পড়িয়া গেল।

চপলার প্রাণটা জ্বলিয়া উঠিল। প্রথম দৃষ্টিতেই সে শুভার উপর ভীষণ চটিয়া উঠিয়াছিল। শুভার অলোকসামান্য রূপ, প্রসাধনসৌকর্য্যে একেবারে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, আর ষ্টেজের ভিতর হইতে

তাহার উপর তীব্র আলোকপাত করিয়া তাহার গৌরব আরও বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল। চপলার যেন মনে হইল যে এ রূপের কাছে তার নিজের রূপ কিছুই নয়! যতই সে প্রাণের ভিতর এই কথা অনুভব করিতেছিল, ততই তার মন শুভার উপর একেবারে বিষ হইয়া উঠিতেছিল।

তার পর যখন সে শুভার অভিনয়, তার সুঠাম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অপূর্ব্ব লীলাগতি, তাহার বচনচাতুরী, তাহার কণ্ঠের সুললিত ঝঙ্কার দেখিতে ও শুনিতে লাগিল, ততই তাহার নিজের দীনতা বোধের সঙ্গে সঙ্গে চপলার বিদ্বেষ বাড়িয়া উঠিল। অভিনয়ের এক স্থানে শুভার একটা ইংরাজী বক্তৃতা ছিল—শুভা যেরূপ সুন্দরভাবে সে বক্তৃতা করিল, তাহাতে চপলার আরও রাগ হইল, কেন না চপলা নিজে লেখাপড়া বেশী শিখে নাই। তার পর তার গান—সে গানের অমৃত লহরী চপলার কাণে কেবলই বিষ ঢালিয়া দিতে লাগিল।

চপলা ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। তার মাথা গরম হইয়া উঠিল। অনেকবার সে উঠিয়া গিয়া মুখে ও মাথায় জল দিয়া আসিল। তার চারিদিকে সবাই শুভার অভিনয় ও সঙ্গীতে আহা আহা করিতেছিল, সে প্রশংসা তার বুকে কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল।

ফিরিবার সময় চপলার বড় জা' বলিলেন, "ধন্য মাগী কিন্তু ভাই—কি সুন্দর যে এক্ট করে!"

মেজ জা' বলিলেন, "তা সত্যি।"

"ওই ধন্যি মেয়ে মানুষ হ'য়ে জন্মেছিল।"

চপলার প্রাণটা ছট্‌ ফট্‌ করিতে লাগিল, তার বড় রাগ হইল, সে বলিল, "হাজার হ'ক, কমলার চারুর মত নয়।"

বড় জা' বলিলেন, "শোন মেয়ের কথা। চারু সুরবালার কাছে!

জানিস্ ছোট, অতুল বোস্ সুরবালাকে মাসে দু'হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল, ও যায় নি।"

চপলা অনর্থক চটিয়া উঠিল; সে ভয়ানক উষ্ণভাবে বলিল, "ও সব বাজারের গাঁজাখুরি গুজব। বেটাছেলে গুলো মেয়েছেলেদের এক্টিং বোঝে ছাই। মাগীদের মুখখানা যদি একটু সুন্দর হয় আর ষ্টেজে এসে যদি খুব খানিকটা বেহায়াপণা ক'রতে পারে তবেই সেই ভারী একট্রেস। কতকগুলো বদমায়েস, বেল্লিক মিন্সে এই মাগীকে একবারে মাথায় তুলে দিয়েছে, আমরা তা'দের সঙ্গে সঙ্গে বাহবা দিচ্ছি।"

যখন নগেনের সঙ্গে তার দেখা হইল তখন চট্ করিয়া কেউ থিয়েটারের কথা তুলিতে পারিল না। কেন না, দু'জনেরই মনে থিয়েটারের কথায় সবার উপর মনে হইতেছিল শুভার কথা, সে কথা দু'জনে আর নিঃসঙ্কোচে আলাপ করিতে পারে না। অনেকক্ষণ পরে চপলা আর থাকিতে পারিল না, তার কতকটা মনের জ্বালা বাহির করিতে না পারিলে আর চলিতেছিল না। তাই কথার ভিতর অনেকটা ঝাঁজ দিয়া সে বলিল, "দেখে এলাম তোমার শুভাকে। ধন্য বেহায়া মাগী যা' হ'ক।"

নগেন একবার চপলার মুখের দিকে চাহিল, আর কোনও কথা বলিল না। চপলার মুখে শুভার প্রশংসা শুনিবার জন্যই সে ব্যাকুল হইয়াছিল, কিন্তু শুনিল নিন্দা, আর বুঝিতে পারিল যে সে নিন্দার আড়ালে কতখানি বিদ্বেষ আছে। মনের বেদনা সে মনেই চাপিয়া রাখিল। চপলা রাগের মাথায় সেটা লক্ষ্য করিল না। সে বলিল, "লোকে এ মাগীকে নিয়ে এত ক্ষেপেছে কেন তা জানি না। এমন কি ভাল এক্ট করে? আমার তো মনে হয় চারু এর চেয়ে ঢের ভাল আর চাঁপা যে এর চেয়ে অনেক ভাল গায় সে বিষয়ে তো সন্দেহই নাই।"

নগেন স্থধু বলিল, "তাই নাকি ?"

চপলা মন খুলিয়া শুভার নিন্দা করিয়া মনের আশ মিটাইল। সে যে ইহাতে নিজের কতকটা অনিষ্ট করিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তাহার প্রত্যেক কথায় সে নগেনের মন হইতে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। নগেন এসব কথার মধ্যে লক্ষ্য করিল কেবল মাত্র চপলার অমুদার সঙ্কীর্ণতা। তাহার উপর নগেনের যে একটা সহজ শ্রদ্ধা ছিল তাহা ইহাতে অনেকটা কমিয়া গেল।

শুভার সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে যে একটা সঙ্কোচ, একটা লুকোচুরী জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা বাড়িয়া চলিল। আর সঙ্গে সঙ্গে নগেনের মনে শুভার প্রতি আকর্ষণ নানা কারণে বাড়িয়া চলিল। সে এমন শুভার সঙ্গে তুলনায় চপলার সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিল, বলা বাহুল্য সে সমালোচনায় চপলার জিত হইল না। একেই তো শুভার তুলনায় চপলার বিশেষ প্রশংসার কোনও কথাই ছিল না, তাহাতে আবার নগেনের চোখে শুভার গুণগুলি অনেকটা বড় হইয়াই দেখা দিল। তা ছাড়া শুভার প্রতি চপলার বিদ্বেষই চপলাকে আরও খাটো করিয়া দিল। এতদিন নগেন চপলার প্রেমের মোহের ঘোরে ছিল, শুভার প্রভায় সে মোহটা কাটিয়া গিয়াছিল। এখন সে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চপলার প্রত্যেক কাজকর্ম্মের সমালোচনা করিতে শিখিল, নিরপেক্ষের চেয়ে বরং একটু বেশী—সে এখন সমালোচকের আসন গ্রহণ করিয়া চপলার প্রতি সম্পূর্ণ স্থবিচার করিতে পারিতেছিল না। চপলার প্রত্যেকটি কাজে সে সৌষ্ঠবের অভাব দেখিতে পাইল। শুভা যে কাজটী করিত. তাহা এমন স্থন্দর ভাবে করিত যে দেখিলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। চপলার, সে কর্ম্মসৌষ্ঠব ছিল না। শুভার সঙ্গে কথা বলিতে গেলেই তার' অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইত,

মুখের কথা বাহির না হইতেই সে বুঝিয়া ফেলিত, আর তা' ছাড়া তার নিজের কথাগুলি প্রতিভার আলোকে ঝক্ মক্ করিত। চপলাকে সব কথা বুঝাইতে পারা যায় না, সাধারণ কথাও বুঝাইতে সময় লাগে, আর তার কথাবার্ত্তা নিতান্ত সাধারণ রকমের। দু'দিন আগে এমন মনে হয় নাই, আজ নগেনের এই কথা মনে হইল। তা' ছাড়া শুভা লেখাপড়া ঢের বেশী জানে, গান বাজনায় তো সে বিশ্ববিখ্যাত, আর যে কাজে সে হাত দেয় সে তাই পারে। নগেনের এ চিন্তাটা কিছুতেই মন হইতে যাইত না, যে শুভার মত মেয়ের সাহচর্য্য সে অনায়াসে পাইতে পারে, অথচ কেবল চপলাকে বিবাহ করিয়া বসিয়াছে বলিয়াই সে সে সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত। নারী সাহচর্য্যের তার জীবনের যত কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা তাহা তার এই একটা অল্প বুদ্ধি সাধারণ মেয়েকে দিয়াই পূরাইতে হইবে।

চপলাও নগেনকে বেশ একটু সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল। নগেন যখন তার কাছে প্রথম স্বীকার করিয়াছিল যে, সে শুভাকে ভালবাসে তখন চপলার মনে একটা উদার ত্যাগের ভাব আসিয়াছিল এবং সে সেই ভাবেই কথা বলিয়াছিল। এখনো মাঝে মাঝে সে সেই ভাব বোধ করিত, কিন্তু তাহাতে তাহার বড় বেদনা বোধ হইত। তার অন্তরের ভিতর যে নারীর প্রাণ অধিষ্ঠিত ছিল, তাহা এ উদারতায় সম্পূর্ণ সায় দিতে পারিত না। শুভা মনে মনে পুরুষ জাতির উপর চটিয়াছিল, তার কারণ যে পুরুষ জাতি স্ত্রীকে একটা সম্পত্তির মত করিয়া রাখিতে চায়। তার যদি চপলার মত অবস্থা হইত, তবে সে বুঝিতে পারিত যে নারীরও স্বামীতে এই সম্পত্তি বোধ ষোল আনা জাগ্রত আছে। তবে প্রভেদ এই যে, পুরুষে এই বুদ্ধি তার শক্তির আশ্রয়ে প্রকাশিত হয়, নারীর ভিতর ইহা অশক্তির উপর

প্রতিষ্ঠিত। তাই চপলা তার অধিকার দাবী করিতে পারিত না, এই অধিকার হারাইয়া কেবল সে কাঁদিত।

চপলা ত্যাগের সংকল্পই করুক আর রাগই করুক—পর পর এই দুই ভাবই তার মনে খেলিত—সে নগেনকে সর্ব্বদাই সন্দেহের চক্ষে দেখিত। নগেন যে এখন তাহাকে আর আগের মত ভাল বাসে না, তার আদরে তার কথাবার্ত্তায় তা'র কাজে কর্ম্মে একেবারে গলিয়া যায় না, তাহা সে স্পষ্ট লক্ষ্য করিল। বরং যতটা নগেন করিত তার চেয়ে সে অনেকটা বেশী অনাদর দেখিত। আর এই ভাব পরিবর্ত্তনের সঙ্গে কথায় কথায় শুভাকে হেতুরূপে জুড়িয়া দিতে তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা হইত না। কাজেই সে শুভার উপর আরও জ্বলিয়া উঠিত। কি এমন শুভা, যার তুলনায় সে এতই খাট? সে আরসীর কাছে দাঁড়াইয়া দেখিত যে তার রূপও সামান্য নয়। তেমনি করিয়া সাজিয়া গুজিয়া যদি ষ্টেজের আলোয় সে অমনি করিয়া বেহায়ার মত দাঁড়াইতে পারিত তবে তাকে শুভার চেয়ে কিছু মন্দ দেখাইত না। শুভার মত সে লেখাপড়া শিখে নাই, সে তেমনি গাহিতে পারে না—সে কার দোষ? কে তাকে কবে শিখাইয়াছে? নগেন যদি তাকে সত্য সত্য ভাল বাসিত, তবে সে তাকে অনায়াসে শিখাইয়া পড়াইয়া ঠিক করিয়া লইতে পারিত। তার বুদ্ধি তো কম নয়? এই সব দিন রাত ভাবিত।

ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একটা প্রচণ্ড ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়া গেল। স্বামী ও স্ত্রী যদি পরস্পরের প্রতি প্রাণভরা প্রেম ও সহানুভূতি সর্ব্বদা জাগাইয়া রাখিতে না পারে তবে বেশীর ভাগ দম্পতীরই এই দশা হইবে। স্নেহের সম্পর্ক ছাড়িয়া যদি পরস্পর পরস্পরের সমালোচকের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া বসে তবে তাহাদের চোখেও পরস্পরের দোষ ত্রুটি ঝুড়ি ঝুড়ি বাহির হইয়া পড়িবেই। কেননা স্বামী স্ত্রীর জীবনে

যেমন একেবারে সম্পূর্ণ মাখামাখি তেমন আর কেনও সম্বন্ধেই হয় না। স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই সম্পূর্ণ সত্তাটা পরস্পরের কাছে একেবারে সম্পূর্ণ আবরণশূন্য হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। এ অবস্থায় দোষ এবং গুণ দুই সমান ভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, কেন না সব মানুষের মধ্যেই দোষ গুণ আছে। প্রেম যতক্ষণ দৃষ্টি রঞ্জিত করিয়া রাখে ততক্ষণ দম্পতী দোষটুকু দেখিতে পায় না, গুণগুলি সযত্নে সঞ্চয় করিয়া রাখে। আর যখন সমালোচকের চক্ষু দিয়া তাহারা পরস্পরকে দেখে তখন গুণগুলি ধুইয়া পুঁছিয়া দোষ গুলিই বড় বড় হইয়া দেখা দেয়। কেননা, প্রত্যেকেই নিজের অর্দ্ধাঙ্গ বা অর্দ্ধাঙ্গিনীর ভিতর একটা নির্দ্দোষ সম্পূর্ণতার আশা করে। মনে মনে মানস প্রতিমা গড়িয়া লইয়া তবে লোকে প্রকৃত জীবনের প্রেমাস্পদের কাছে যায়। চোখের নেশা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ যা কিছু দেখা যায় সবই সেই মানস প্রতিমার সঙ্গে মিলিয়া যায়, নেশা কাটিয়া গেলে প্রতি পদে পদে বাস্তবের খর্ব্বতা অপূর্ণতা ও অসৌষ্ঠব ধরা পড়ে।

অতএব স্বামী-স্ত্রী সাবধান! যদি সুখী হইতে চাও প্রেমে ভাঁটি পড়িতে দিও না; চোখের নেশা ভাঙ্গিতে দিও না। নিত্য সাধনায় প্রাণের ভিতর প্রেম নিত্য নবীন করিয়া জাগাইয়া রাখিবে। আহিতা-গ্নিকের মত ঐকান্তিক নিষ্ঠা লইয়া হৃদয়ের অগ্নিতে নিত্য ইন্ধন ও হব্য যোগাইবে—ভুলিও না যে এই আগুন জ্বালাইয়া রাখার উপর তোমার জীবন মরণ নির্ভর করে। তোমার জীবন সুখের অফুরন্ত ফোয়ারা হইবে, না দুঃখের অপার সাগর হইবে সেটা অনেকখানি নির্ভর করে তোমার ভিতর প্রেম কতখানি তাজা থাকে তার উপর। এ কথাও ভুলিও না যে প্রেমটা সাধনার বিষয়—সাধনা করিয়া ইহাকে চিরনবীন করিয়া রাখা যায়। আপনি ইহাকে না খোয়াইলে ইহা বড় খোয়া যায় না। যদি তোমার সাধনার জোর না থাকে, একান্তভাবে

যদি প্রেমকে কামনা না কর তবে প্রেম বেশীদিন বাঁচিয়া থাকে না। ছোট-খাট খুঁটি-নাটি উপলক্ষ্য করিয়া প্রেমের দুর্গে বিনাশের বীজ প্রবেশ করে—অতএব এই ছোট-খাট খুঁটি-নাটি বিষয়ে বিশেষ সাবধান!

নগেন ও চপলার প্রেমের ভিতর যে ঘুণ ধরিয়াছিল তাহা বিষাক্ত জীবাণুর মত তাহাকে ওতপ্রোত ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। যে প্রেম দু'দিন আগে তাহাদের সমস্ত হৃদয়কে সরস ও সজীব করিয়া রাখিয়াছিল তাহা একেবারে উপিয়া গিয়া তাহাদের হৃদয়কে মরুভূমি করিয়া ফেলিল। এখন কেবল কর্ত্তব্যের বন্ধন ছাড়া তাহাদের ভিতর অন্য কোনও বন্ধনই প্রায় রহিল না। দিন তা'দের যেমন চলিতেছিল প্রায় তেমনি চলিতে লাগিল, তেমনি পরস্পরের আদর সোহাগের লীলা, হাস্য, পরিহাস সকলই ঠিক পূর্ব্বের মতনই চলিতে লাগিল। কিন্তু দু'জনেই বুঝিতে পারিল এ সকলই ফাঁকা। প্রেমে যে কথা ও যে কাজ স্বচ্ছন্দে আত্মনিবেদন মাত্র হয় সেই কথা ও সেই কাজ এখন তাদের কাছে কর্ত্তব্যের কঠোর শাসনের ফল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেখানে ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীনতাবোধ সেখানে এখন বন্ধন আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে।

শুভার স্বার্থত্যাগ নিষ্ফল হইল। চপলার স্পর্দ্ধাও মিথ্যা হইল। কর্ত্তব্যের জগতে নগেন চপলারই রহিল কিন্তু সত্যের জগতে সে তার পর হইয়া গেল।

[২০]

আরও তিন মাস কাটিয়া গেল। শুভার প্রাণটা কেবলি ছটফট্ করিতে লাগিল। একমাস আগে সেই পার্টির দিন শুভা যে অস্বস্তি বোধ করিয়াছিল, তখন সত্যেন্দ্রের মোকদ্দমা লইয়া তার প্রাণে যে উত্তেজনা উপস্থিত হইল তাহাতে সেটা কিছুদিনের জন্য চাপা পড়িয়া

গেল। কিন্তু দুই চার দিনের মধ্যেই সে অস্বস্তি আরও বেশী প্রবল হইয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে থিয়েটারে রিহার্স্যাল হইতে ফিরিবার সময় যে কাণ্ডটা হইল তাহাতে তার মনটা আরও অস্থির করিয়া দিল। প্রথম এক চোট সে খুব ভীষণ রকম উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং যতই সে আপনার উদ্দাম কল্পনা দমন করিতে চেষ্টা করুক না কেন, কিছুতেই সে তার মনকে আকাশ-কুসুম রচনা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিতেছিল না। নগেন যে এ পৃথিবীতে আছে, তার অতি নিকটে আছে এবং সে তাহাকে আগেরই মত ভালবাসে একথা সে আজ যতটা নিবিড়ভাবে অনুভব করিল, এতদিন তাহা সে করে নাই। সে যে ইচ্ছা করিলেই নগেনকে গাড়ীতে উঠাইয়া আনিয়া আবার তার স্বর্গ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিত তাহা সে অনুভব করিল, এবং সেই লোভ ত্যাগ করিয়া যে নগেনকে বিমুখ করিতে পারিয়াছে তাহাতে সে একটা অপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদ লাভ করিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বঞ্চিত জীবন তার ভিতর হাহাকার করিয়া উঠিল, সে কাঁদিল—বেদনায় কাঁদিল, আনন্দে কাঁদিল। তার পর তার রাগ হইল। নগেনের উপর রাগ হইল, নিজের উপর রাগ হইল। এই না সেদিন সে সুরেশ বাবুকে কত কথা শুনাইয়া দিয়াছে, পুরুষের প্রেম যে কত নগণ্য হেয় বস্তু তাহা বুঝাইয়াছে; আর এই প্রেমের কাছে আত্মসমর্পণ করা যে নারীর পক্ষে কত বড় অপমানের কথা সেটা সে অনুভব করিয়াছে। এই কি তার মনুষ্যত্ব, যে আজই এই দু' দিনের মধ্যে সে সব ভুলিয়া গেল, নগেনের মুখ দেখিয়া তার সব প্রতিজ্ঞা সব আত্মসম্মান ভাসিয়া গেল। সে মনকে কশাঘাত করিয়া ফিরাইল, কিন্তু বেদনায় প্রাণ চুরচুর হইয়া গেল।

যখন তার মনের ভিতর দ্বন্দ্ব অনেকটা শান্ত হইয়া আসিল তখন পড়িয়া

রহিল সারাচিত্ত ভরিয়া একটা দারুণ অবসাদ, অস্বস্তি। তার জীবনটা তার কাছে একটা অর্থশূন্য পরিহাস বলিয়া মনে হইল। মনটা একটা প্রকাণ্ড বিস্তীর্ণ কালো ছায়ায় ঢাকিয়া গেল, তার কিছুই ভাল লাগিল না। তার যশ ও কীর্ত্তি, তার অর্থ, সৌভাগ্য সব যেন তাকে পরিহাস করিতে লাগিল, সকলই তার বিষাক্ত, সকলই মিথ্যা বলিয়া তার মনে হইল।

চাঁপা শুভার এই ভাবটা বুঝিতে পারিত না। জীবনে লোকে যাহা কিছু কামনা করিতে পারে চাঁপার বিবেচনায় শুভা তার সকলই পাইয়াছিল। এক নম্বর, খ্যাতি—একেবারে দেশজোড়া এমন খ্যাতি কোনও নটীর কখনও হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, টাকা—শুভা যে পয়সা রোজগার করিতেছে এতদিনের পুরাতন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হইয়া সেও তার সমান রোজগার করিতে পারে না। আর শুভার যে রকম খ্যাতি দাঁড়াইয়াছে তাহাতে সে ইচ্ছা করিলেই তার প্রাপ্তি আরও বাড়াইয়া লইতে পারে, কেন না এলবার্ট থিয়েটারের এখনকার পশার শুভা মুখ ফিরাইলে একদিনও থাকিবে না। তা'ছাড়া চাঁপার অজানা ছিল না সুরেশবাবু কি রকম অন্ধভাবে শুভার পক্ষপাতী। তৃতীয়তঃ তার রূপ যৌবন ও অটুট স্বাস্থ্য আছে। এ ছাড়া আর যা কিছু জগতে বাঞ্ছনীয় আছে, তার সকলি টাকায় পাওয়া যায়, টাকার তো শুভার খাঁক্তি নাই। এক নগেন, সেও তো সম্পূর্ণই শুভার হাত' ইচ্ছা করিলেই তো সে তাহাকে একবারে আয়ত্তে আনিতে পারে। তবে সে চায় কি? কিসের জন্য থাকিয়া থাকিয়া তার প্রাণের এই হাহাকার, এই "নাকে কান্না।"

সে একদিন শুভাকে চাপিয়া ধরিল, বলিল, "তুই আমাকে স্পষ্ট করে বল দিকিন তুই চাস কি?"

শুভা বলিল, "আমি চাই আমার জীবন সার্থক ক'রতে।"

"ও তো একটা ফাঁকা কথা, জীবন সার্থক তো হরেক রকমে হয়, সবার তো এক রকমে সার্থক হয় না। তুই কি রকমে জীবন সার্থক করবি ঠাউরেছিস বল তো?"

"সে আমি ব'লতে পারি না। কি ক'রলে যে আমার জীবন সার্থক হ'বে সে আমি নিজেই জানি না। শুধু জানি এই যে এই যে যা ক'রছি আমি, এতে আমার জীবনটা বৃথাই যাচ্ছে। যখন ঘরে ছিলাম তখন মনে ক'রেছিলাম বুঝি স্বাধীন হ'তে পারলেই জীবন সার্থক হ'বে। আজ বুঝছি স্বাধীন হওয়া না হওয়া কিছুই যায় আসে না, যদি সে স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার না ক'রতে পারি। আমি করেছি কি? কেবল গিয়ে সং সেজে থিয়েটারে নাচছি গাইছি, ঘরে টাকা আনছি খাচ্ছি দাচ্ছি ফুর্ত্তি করছি। এমন একটা জীবন থাকলেই বা কি, গেলেই বা কি? এমনি যদি চিরদিন যায়, তবে আমি না জন্মালেও পৃথিবীর কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না।"

"তার মানে তুই এমন একটা লোক হ'তে চাস যে তুই মরে গেলে লোকে একটা ক্ষতি বোধ ক'রবে। তা ক'রবে লো ক'রবে। এই যে হাজার হাজার লোক রোজ এলবার্ট থিয়েটারে এসে যাচ্ছে, শুভা ম'লে তারা বুঝবে তাদের অনেকটা লোকসান হ'য়েচে।"

"ওঃ, শুভা যাবে আরও কত আসবে, এমন কাজের জন্য লোকের অভাব হবে না। কতই তো নামজাদা একট্রেস মরে গেছে তাতে তো লোক কই কেঁদে ভাসায়নি। তা'দের জন্ত তো পৃথিবী থমকে থাকেনি।"

"কার জন্তেই বা থেমে রয়েছে পৃথিবী? এই ঈশ্বর বিদ্যাসাগরই বল, আকবর বাদশাই বল, কালিদাসই বল, কার জন্তে পৃথিবী চির দিন

বসে কেঁদেছে? কারও অভাবই চিরদিন থাকে না, যত বড় লোকই যাক না কেন পৃথিবীর দিনরাত সমান চলে' যায়।"

শুভা ভাবিয়া বলিল, "তা' ঠিক, কিন্তু কাঁরা গেছেন, তাঁদের নাম রয়েছে, তাঁরা পৃথিবীকে এমন একটা কিছু দিয়ে গেছেন যা কোনও জন্মে কেউ ভুলতে পারবে না। এই ধর কালিদাস, তিনি সেই হাজার দু-হাজার বছর আগে পৃথিবীকে যে দান দিয়ে গেছেন আজও আমরা তা' মাথায় তুলে রেখেছি।"

"তা বেশ তো, তোর মন তাই চায় তো তুইও লেখ না। বরাতে থাকে, তোর নামও তেমনি জন্ম জন্মান্তর ধরে লোক মনে রাখবে। তুই তো আর আমাদের মত মুখ্খু ন'স—এত লেখাপড়া জানিস্, বই লেখ না, জীবন সার্থক হ'য়ে যাবে।"

শুভা মনে মনে হাসিল। চাঁপার চোখে তার বিদ্যাটা যত প্রকাণ্ডই হউক না কেন, সে জানিত তার বিদ্যা কত সামান্য। যেমন জিনিসটা তা'র জগতে রাখিয়া যাইবার ইচ্ছা তেমন জিনিস রচনা করিতে তার না আছে বিদ্যা, না আছে সাধ্য। কিন্তু চাঁপার সঙ্গে কথা কহিয়া তার উপকার হইল। তার মনের যে অনির্দ্দিষ্ট ব্যাকুলতা ছিল, সেটা যেন এই কথায় হাড়ে মাংসে গঠিত একটা মূর্ত্তি ধারণ করিল। এই তো একটা পথ আছে তার জীবনে সার্থকতা লাভ করিবার। সে নিজে জীবনে কিছু করিতে পারিবে এমন ভরসা তার হইল না, কিন্তু প্রাণে যে সব কথা জাগিয়া উঠিয়াছে, যে সব ভাব তার ভিতর আকুলি বিকুলি করিতেছে, সে তো সেগুলি পৃথিবীকে সম্প্রদান করিতে পারে। চাই কি কারো না কারো প্রাণে গিয়া তার আত্মার এই ক্রন্দন একদিন নূতন ভাব সৃষ্টি করিয়া কর্ম্মে সার্থকতা লাভ করিবে। সে ভাবিতে লাগিল,

যতই ভাবিল ততই কথাটা তার মনে বসিয়া গেল। সে বুঝিল যে তার লিখিবার শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। লোককে দিবার মত কিছু লিখিতে হইলে তার শিক্ষা সম্পূর্ণ করা দরকার। চিরদিনই তার পড়িবার আকাঙ্ক্ষা খুব প্রবল হইয়া ছিল, আজ সে পড়া-শুনার একটা উদ্দেশ্য পাইয়া পড়িয়া জ্ঞান বৃদ্ধি করিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিল। কি পড়িবে, কোন্ পথে সে অগ্রসর হইবে, কোথায় বই পাইবে এই সব ভাবিতে লাগিল।

সুরেশ বাবুর কাছে সে কথা পাড়িল। সুরেশ বাবু প্রায় রোজই আসিয়া শুভার সঙ্গে এক আধ ঘণ্টা গল্প সল্প করিয়া যাইতেন। শুভা জানিত কিসের জন্য তিনি আসেন, কিন্তু সে তাঁহাকে বাধা দিত না। কারণ সুরেশ বাবু উন্মত্ত প্রেমিক নন, তিনি অত্যন্ত সংযত এবং ভদ্র। এমন কি সেদিনকার সেই বোঝা পড়ার পর তিনি আর প্রেমের কথা একবারও শুভার কাছে পাড়েন নাই। শুভা তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিল না বটে, কিন্তু তাঁহার উপর তাহার রাগ হইল না। বরং সে তাঁহাকে বেশ একটু পছন্দ করিত। সুরেশ বাবু সুরসিক, সদ্বক্তা এবং সুপণ্ডিত। শুভার সঙ্গে তাঁর যে সকল কথাবার্ত্তা হইত তাহা মোটেই অন্তঃসারশূন্য ফাঁপা কথা নয়, তিনি যাহা বলিতেন তার প্রত্যেকটী শুনিবার মত কথা— তাহা শুনিয়া শুভা সত্য সত্যই আনন্দলাভ করিত। নগেনের কথা শুনিয়া শুভার ভাল লাগিত, সে কেবল বক্তার গুণে, কিন্তু সুরেশ বাবুর কথা তা'র ভাল লাগিত কথাগুলি অত্যন্ত ভাল বলিয়া।

সুরেশ বাবুর কাছে সে তার জীবনের আকাঙ্ক্ষার কথা পাড়িল। সুরেশ বাবু বলিলেন, "তোমার জীবনটাকে তুমি এতটা ব্যর্থ মনে করছো কেন? চাঁপা ঠিক কথা ব'লেছে, সবার জীবন এক রকমে সার্থক হয়

না। সবাই যে কিছু সেক্সপিয়ার বা নিউটন বা বিদ্যাসাগর হবার মত শক্তি বা সাধনা নিয়ে জন্মায় তা নয়, কিন্তু তাই ব'লে কি বাকী লোকের জীবনটাকে একেবারে ব্যর্থ বলতে হবে। লোকের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেওয়া ছাড়াও জীবনে অন্য রকমের সার্থকতা আছে। প্রত্যেক মানুষ তার বিশিষ্ট শক্তি নিয়ে একটা বিশিষ্ট আবেষ্টনের মধ্যে জন্মায় ও থাকে। সেই শক্তি ও সেই আবেষ্টন তার কর্ত্তব্য ও কর্ম্মক্ষেত্র ঠিক ক'রে দেয়, সে কর্ত্তব্য ক'রেও লোকে জীবন সার্থক করে। রাস্তার মুটে, অফিসের কেরাণী বা লাটসাহেবের কাউন্সিলের মেম্বর সবাই এক একটা বিশিষ্ট কাজ ক'রছে, সেই কাজ করাতেই তা'দের জীবনের সার্থকতা। সমস্ত সমাজের জীবনটা যদি দেখ তবে দেখতে পাবে, অল্পবিস্তর সবাই এ জীবনেব জন্য দরকারী, সবার কাজ মিলে তবে সমাজকে বাঁচিয়ে রাখছে, চালাচ্ছে, ক্রমশঃই বেশী উন্নত ক'রছে। প্রত্যেকেই কোনও না কোনও Social service ক'রছে আর এই সমাজের সেবা ক'রে তারা জীবন সার্থক ক'রছে।"

শুভা। মানলাম, কিন্তু আমরা সমাজের কি হিতসাধন করছি? রাতের পর রাত খুব খানিকটা নাচানাচি কুঁদাকুঁদি ক'রে লোক ঠকিয়ে নিজের পেট ভরান ছাড়া কি ক'রছি?

সু। আমি যদি থিয়েটার জিনিসটাকে এতটা অপদার্থ মনে ক'রতাম তবে আমি এতে থাকতাম না। আমরা আর কিছু করি না করি থিয়েটারে এসে লোকে আমোদ তো পায়। এতগুলো লোকের খানিকটা আনন্দ পাবার আয়োজন ক'রে আমরা সমাজের একটা উপকার করছি বই কি? জীবনে লোকের খাওয়া দাওয়া, ঘুমোন, কাজ করা এ সবের যেমন দরকার আছে, তেমনি আনন্দেরও তো দরকার আছে—সেটা জোগাবে কে? সবাই যদি হাঁড়িপানা মুখ ক'রে ভারী

ভারী কর্ত্তব্যই দিনরাত ক'রতে থাকে তবে দুনিয়াটা একেবারে বাসের অযোগ্য হ'য়ে উঠ্‌বে।

শুভা। এ কেবল মন ভুলাবার কথা সুরেশ বাবু। আনন্দটা জীবনের খাঁটি দরকার নয়, একটা অলঙ্কার বলা যেতে পারে। এটারও দরকার থাকতে পারে কিন্তু রাত জেগে খুব খানিকটা হৈ হৈ না ক'রেও আরও দু'শো রকম আনন্দের আয়োজন আছে, তা' ছেড়ে লোকগুলোকে থিয়েটারে ভিড় করে টেনে আনায় এমনি কি লাভ হচ্ছে তা আমি বুঝি না।

সু। দু'শো কেন, দু'হাজার রকমের আনন্দ আছে, কিন্তু সবাই তো এক জিনিসে এক রকম আনন্দ পায় না। কেউ কেউ বা একটা ভাল গান শুনলে মশগুল হ'য়ে যায়। কেউ বা গান সুরু হ'লে মজলিস ছেড়ে পালাতে পথ পায় না—তা' সে গান যতই ভাল হ'ক না কেন। এমন কতকগুলি লোক আছে যাদের এই থিয়েটারে যেমন আনন্দ দেয় তেমন আর কিছুতেই দেয় না। থিয়েটার তাদের একটা অভাব দূর ক'রেছে বলেই এ টিকে আছে।

শু। আবার কত লোক এই থিয়েটারের নেশায় প'ড়ে, চাই কি আমাদের মোহে পড়ে একেবারে সর্ব্বনাশের মধ্যে এসে পড়েছে।

সু। তা' হ'তে পারে, কিন্তু তা'র জন্যে থিয়েটার তত দায়ী নয়, যতটা তারা নিজে। মানুষে নিজের অপদার্থতাটা সর্ব্বদাই পরের ঘাড়ে চাপাতে চায়, তাই লোকে বিপথে গিয়ে থিয়েটারের ঘাড়ে দোষ চাপায়। আর যেটুকু দোষ আছে সেটা থিয়েটারের নয়, থিয়েটার যারা করে তা'দের। সব একট্রেস যদি তোমার মত কি চাঁপার মত হ'ত তবে আর এমনটি হ'তে পারতো না।

শু। আর তা' ছাড়া আনন্দ দেওয়ার ওজুহাতটা যে বাজে তা' আর

একদিক দিয়ে দেখা যেতে পারে। ঠিক আমাদেরই মত শুঁড়ি বা বেশ্যারাও ব'লতে পারে, কতকগুলি লোকের আনন্দের জন্য তাদের দরকার আছে। পারে না কি?

সু। আনন্দের মধ্যে নানারকম আছে। ভালও আছে মন্দও' আছে। মদ খাওয়া বা বেশ্যাবাড়ী যাওয়াটা সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর সেটা মন্দ। কিন্তু থিয়েটারের আনন্দ তেমন নয়। বরঞ্চ, থিয়েটারে লোক শিক্ষার সহায়তা করে। যদি ভাল ভাল নাটক ভাল ক'রে অভিনয় করা যায় তাতে যে লোক শিক্ষার অনেকটা সহায়তা করে তা' অস্বীকার ক'রবার যো নাই। গিরীশ ঘোষের 'বিল্বমঙ্গল' কি 'বলিদান যে লোক শিক্ষার পক্ষে একটা মস্ত সহায় এ কথা কি তুমি অস্বীকার ক'রতে চাও? আমরা, অর্থাৎ থিয়েটারের ম্যানেজারেরা যদি নিজের কাজ ভাল ক'রে বুঝি তবে আমরা বড় দরের লোকশিক্ষকের পদ দাবী ক'রতে পারি, আর তোমার মত একট্রেসরাও সেই লোকশিক্ষার সহায়তা ক'রে জীবন সার্থক ক'রতে পারে।

শু। দেখুন, আপনার সঙ্গে তর্ক করি এমন ক্ষমতা আমার নাই কিন্তু আমি মনে মনে বুঝছি আপনার যুক্তি ঠিক নয়, অন্ততঃ এটা আমার মনে ধ'রছে না। আমি এমন একটা কিছু ক'রতে চাই যাতে করে আমি সহজেই মনে ক'রতে পারি আমি একটা কাজের মত কাজ ক'রছি। মাইক্রস্কোপ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সে কাজের উপকারিতা দেখতে হ'বে না।

সু। তবে তুমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলে কেন, সেখানে তো একটা প্রকাণ্ড কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। স্বামীর সেবা করে, ছেলেপিলে মানুষ করে——

শু। থাক সুরেশ বাবু, সে কথা তুলবেন না। সেখানে আমার

জীবনে কত বড় প্রকাণ্ড ব্যর্থতা ছিল সেটা আপনারা বুঝবেন না। সে কথা আলোচনা না করাই ভাল। যা' হ'য়ে গেছে তার তো চারা নেই। এখন কি ক'রতে পারি তাই নিয়ে কথা হ'চ্ছে। আমি স্পষ্টই বলছি ছোট খাট কিছুতে সুখী হ'তে পারবই না। আমার মনটা চায় খুব একটা বড় কিছু ক'রতে। খুব একটা প্রকাণ্ড কাজ করে চিরদিনের মত জগতে একটা কাজ রেখে যেতে না পারলে আমি জীবন সার্থক বলে মনে ক'রতে পারি না।

সু। তোমার কথা শুনে আমার গ্যর্কির একখানা বইয়ের কথা মনে পড়লো। সেখানেও একটা লোক ঠিক তোমারই মত খুব বড় একটা কিছু ক'রবার জন্য অস্থির হ'য়েছিল—তার ফলটা বড় ভাল হয় নি। বইখানার নাম The Orloff Couple. সেখানা তোমাকে পড়তে হবে।

শু। আচ্ছা তা' আমি পড়বো। শুধু তাই নয় আপনি আমাকে আরও সব বই বেছে দেবেন আমি পড়বো। আপনি আমাকে শিক্ষা দিন। আমি রীতিমত ভাবে লেখাপড়া শিখতে চাই, নিজের কর্ত্তব্যটা বেছে নেবার জন্য, নিজের জীবনের লক্ষ্যটা ঠিক করবার জন্য আমার যা কিছু পড়বার প্রয়োজন সেই সব বই আমাকে দেবেন। আমি খুব প'ড়তে চাই, সব কথা জানতে চাই। আমি আপনাকে গুরু করে বরণ ক'রে নিলাম।

সেই দিন হইতে সুরেশবাবু শুভার শিক্ষার ভার নিলেন। শুভা তাঁর কাছে প্রথমে নানা রকম উপন্যাসের বই পড়িল। গ্যর্কির Orloff Couple, জেরোমের Paul Kelver, Wellsএর Ann Veronica, Sir Isaac Herman's wife প্রভৃতি আধুনিক উপন্যাস প্রথমে সে পড়িল, ঐ সব বই পড়িয়া তার আগ্রহ বাড়িয়া গেল। Wellsএর বই

পড়িয়া তার বিলাতের নারীসমস্যা ও শ্রমজীবি সমস্যা বিষয়ক নানা গ্রন্থ পড়িবার আগ্রহ হইল, সুরেশ বাবু তাহাকে সেই সব বই আনিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে Tolstoy এর Resurrection, War and Peace, Ibsenএর নাটকাবলী, Bernard Shawর গ্রন্থনিচয় পড়িতে দিলেন, আর নিজে তাহাকে সেকস্‌পীয়ার পড়াইতে লাগিলেন! আর তিনি তাহাকে এক সেট রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী উপহার দিলেন।

[২১]

শুভার নবজীবন আরম্ভ হইল। যে সব বই সুরেশ বাবু তাহাকে পড়িতে দিয়াছিলেন, সে সব গুলিই নূতন নূতন আদর্শ—সমাজের অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ, সমাজের আমূল সংস্কারের আলোচনায় ভরপূর। এই সব পুস্তকে সে জ্ঞানরাজ্যের এক অপূর্ব্ব ভাণ্ডারে গিয়া উপস্থিত হইল। তা'র তীক্ষ্ণ মেধার বলে সে যেমন দ্রুতভাবে এই সব নূতন তথ্য আয়ত্ত করিতে লাগিল, তেমনি প্রত্যেকটি নূতন ভাব তা'র মনে একটা সম্পূর্ণ মৌলিক চিন্তার ধারা সৃষ্টি করিতে লাগিল। তার মাথার ভিতর নূতন ভাব গুলি টগ্‌-বগ্‌ করিয়া ফুটিতে লাগিল।

সুরেশ বাবুর সঙ্গে সে রোজ অনেকটা সময় তার পঠিত বিষয় লইয়া আলোচনা করিত। সে আলোচনায় তার চিন্তার অনেকটা সহায়তা হইত। কিন্তু যতই সে পড়িতে লাগিল ততই সে সুরেশ বাবুর শিক্ষার অসম্পূর্ণতা অনুভব করিতে লাগিল। সুরেশ বাবু ছিলেন বার্ণার্ড-শ'র অন্ধ উপাসক, ইবসেনের পরম ভক্ত। এই গ্রন্থকারদের খুব অগ্রসর মতামতের পাশে সুরেশ বাবুর ভিতর অনেক গুলি রক্ষণশীল মতের অপূর্ব্ব সমাবেশ ছিল। সেগুলিকে শুভা কিছুতেই তাঁর শিক্ষার সঙ্গে মিলাইতে পারিতেছিল না।

একদিন একখানি উপন্যাস লইয়া আলোচনা হইতেছিল, শুভা বলিল, "এ বই খানার ভিতর এত ভাল কথা আছে, কিন্তু গ্রন্থকার একটা পুরাতন সংস্কার কিছুতেই ছাড়িয়ে উঠতে পারেন নি। তাঁর মনের বিশ্বাস, যে বিবাহিত জীবনেই মেয়ে মানুষেব জীবনের একমাত্র গতি—মেয়ে মানুষের দায়ে পড়ে অন্য কিছু ক'রতে হ'তে পারে, কিন্তু তার শেষ পরিণতি বিবাহে।"

সু। কথাটা ঠিক। মেয়ে মানুষের প্রধান কাজ হচ্ছে, সন্তান পালন, সব স্ত্রীলোকেরই সম্ভব হ'লে সেটা করা উচিত, তার জন্যে বিবাহ দরকার।

শু। দরকার কি না সে সম্বন্ধে বার্ণার্ডশ'র মত অন্যরকম তা তো জানেন। আমি তো তার যুক্তির ভিতর কোনও ফাঁক পাইনে।

সুরেশ বাবু তখন নানা যুক্তি দিয়া Shawর মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিলেন। বিবাহ সম্বন্ধের দ্বারা নারীর জীবিকার্জ্জনের চেষ্টা হইতে মুক্তিলাভ হয় এবং সে স্বচ্ছন্দ ভাবে সমস্ত শক্তি সন্তানপালনে নিয়োজিত করিতে পারে, এই হিসাবে বিবাহের ব্যবস্থা সব চেয়ে ভাল ব্যবস্থা। Eugenics এর দোহাই দিয়া, নানা সমাজতত্ত্ববেত্তার নানা অভিমত দিয়া সুরেশ বাবু এই মত প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

শুভা বলিল, "আপনার সব কথাই না হয় মানলাম। এখনকার সমাজ যেমন ভাবে গড়া হ'য়েছে তাতে সন্তান প্রসব ও পালন করাই যদি মেয়েদের এক ধর্ম্ম হয় তবে বিয়ে করাটাই- সব চেয়ে সুবিধাজনক। কিন্তু সমাজের এখনকার ব্যবস্থাই যে একমাত্র সম্ভব, ব্যবস্থা, একথা মেনে নিচ্ছেন কেন ? সমাজের অনেক ভাঙ্গন গড়ন হ'য়েছে, ভবিষ্যতে কি এমন কোনও ব্যবস্থা হ'তে পারে না যাতে করে বিয়ে ছাড়াও সন্তান পালনের সম্পূর্ণ সুব্যবস্থা, চাই কি, এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা হ'তে পারে

ধরুন Endowment of Motherhood এর যে প্রস্তাব বিলাতের সাফ্রেজেটরা করেছেন।

সুরেশ বাবু নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া এ প্রস্তাবের অসারতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন। শুভা তাহাতে সন্তুষ্ট হইল না। সুরেশ বাবুর যুক্তিগুলির মধ্যে কোথাও ধর্ম্ম বা নীতির ছিটা ফোঁটাও ছিল না। তিনি কেবল সমাজের হিতাহিতের হিসাব ধরিয়া তর্ক করিতেছিলেন। শুভা তা'র প্রত্যেকটি যুক্তির বিরুদ্ধে যে তর্ক উপস্থিত করিতেছিল তার এই হিসাবে কোনও উত্তরই তার কাছে সঙ্গত মনে হইল না। কিন্তু সব কথারই তার মনে "কিন্তু" থাকিয়া যাইতেছিল। সে তর্ক করিতেছিল বটে, কিন্তু তার মনের তলায় মনে হইতেছিল কথাটা ঠিক নয়। যীশুখৃষ্টের উপদেশ, মাদার ক্রিশ্চিয়ানার বক্তৃতা ও মেরী মডলিনের জীবন অত্যন্ত এলো মেলো ভাবে তার মনের ভিতর আসিয়া তর্কে বাধা উপস্থিত করিতেছিল।

শেষে সে বলিল, "আচ্ছা ধরলাম আপনার কথা ঠিক। কিন্তু গোড়ার কথাটায়ই আমার আপত্তি আছে। ছেলে পেটে ধরা অবশ্য মেয়ে মানুষের কাজ, কিন্তু সব মেয়ে মানুষকেই যে তাই ক'রতে হ'বে তার কি মানে আছে। আর যদিই বা তার একটি কি দু'টি ছেলে হয় তবে তাদের মানুষ করলেই তার জীবনের সব শেষ হ'য়ে যাবে, তার কি মানে আছে। বেটা ছেলেরও তো ছেলে মানুষ করবার কতকটা দায়িত্ব আছে, তাই বলে কি তারা শুধু তাই করে? আর মেয়ে ছেলের মধ্যেই বা কে কবে শুনেছে যে, একটা কি দু'টো ছেলে মেয়ে মানুষ ক'রতে তার সমস্ত জীবনের সব সময় লেগে গেছে। অবশ্য যাদের বছর বছর ছেলেপিলে হয় তাদের কথা স্বতন্ত্র। তা' আপনিই তো বলেন তা হ'তে দেওয়া উচিত নয়।"

"নিশ্চয়ই নয়।"

"আমি বলি কেবল ছেলে মানুষ করেই মেয়েদের জীবনের সব ফুরিয়ে যায় না, আর সবারুই যে ছেলে মানুষ ক'রতেই হ'বে তারও কোন মানে নেই। এ ছাড়াও নারীর বিস্তীর্ণ কর্ত্তব্যের ক্ষেত্র আছে। পুরুষও যেমন মানুষ, স্ত্রীও তেমনি মানুষ, দু'জনের মন এক, আত্মা এক। পুরুষেরও যা' জীবনের শেষ লক্ষ্য স্ত্রীলোকেরও তাই। পুরুষ কেবল গায়ের জোরে সেটাকে পুরুষার্থ বলে, কিন্তু সেটা. সুধু পুরুষের সম্পত্তি নয়।"

কথাটা তার মনে সর্ব্বদাই জাগিয়া ছিল, এক দিনের তরেও সে ইহা ভুলিতে পারে নাই। কিন্তু এই সার্থকতার পথ লইয়া তার মনে এখন নানা সংশয় নানা তর্ক উপস্থিত হইতে লাগিল, যা আগে কখনও সে উপলব্ধি করে নাই। ধর্ম্মে জীবনের সার্থকতা এ কথা সে মাদার ক্রিশ্চিয়ানার উপদেশ এবং বাইবেল, Imitation of Christ প্রভৃতি দেখিয়া এক রকম সাব্যস্ত করিয়াছিল—অন্য সব কাজ সেই ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বলিয়া সে মনে করিতে শিখিয়াছিল। কিন্তু সুরেশ বাবু যে নূতন চিন্তার জগতের সহিত তার পরিচয় করিয়া দিয়াছেন তাহাতে তার এই বিশ্বাস ওলট পালট হইয়া গিয়াছিল। এই সব লেখকদের উপদেশে ধর্ম্মের মোটেই স্থান নাই; থাকিলেও তাহা অতি গৌণ। প্রচলিত ধর্ম্ম ও সংস্কার ইঁহারা নির্ম্মম ভাবে সমালোচনা করিয়া তার সব লুকান পাপ বাহির করিয়া দিয়াছেন আর তার স্থানে তাঁহারা বসাইয়াছেন একটা নূতন আদর্শ, তার দুইটি প্রধান মূলসূত্র—মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা ও লোকহিত। মনুষ্যত্বের যে নূতন আদর্শ ইব্‌সেন বা বার্ণার্ড-শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহা হয় ধর্ম্মবিরোধী না হয় ধর্ম্মনিরপেক্ষ—ইহার সঙ্গে বাইবেলের উপদেশের কোনও সম্পর্কই নাই। Thomas a Kempis এর গ্রন্থের

অনেক কথাই শুভা অত্যন্ত সমাদরের সহিত কণ্ঠস্থ করিয়াছিল এবং সরল বিশ্বাসের সহিত তাহার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু এই নূতন শিক্ষার ধাক্কায় সেই উপদেশের বিনীত শান্ত ত্যাগ ও আত্মবিলোপনের আদর্শ একেবারে চূরমার হইয়া গেল। আত্মবিলোপন নয়, আত্মপ্রতিষ্ঠাই ধর্ম্ম, এই শিক্ষা যেন তার মনে বসিয়া যাইতে লাগিল। নিয়েটুশের সঙ্গে সঙ্গে তারও মন বলিতে চাহিল, যে জানিয়া শুনিয়া অসত্যকে জয়ী হইতে দেয়, অন্যায়ের কাছে মাথা পাতিয়া দেয়, সে সাধু নয় কাপুরুষ; সে সংসার সংগ্রামে বিলুপ্ত হইয়া যাইবার যোগ্য।

নানা সমস্যায় পীড়িত হইয়া সে মাদার ক্রিশ্চিয়ানার সঙ্গে একবার দেখা করিতে যাইবে স্থির করিল। তাহার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না, যে তার সকল সংশয় দূর করিয়া দিয়া সত্যের পথ দেখাইয়া দিতে পারিবেন।

যতখানি আশা করিয়া শুভা মাদার ক্রিশ্চিয়ানার কাছে গিয়াছিল ততখানি সে পাইল না। এখন তাঁহার উপদেশের যুক্তির ভিতর সে অনেকটা ফাঁক দেখিতে পাইল, আর তার অনেক জায়গায়ই মনে হইল যে অহেতুক ভক্তি ও বিশ্বাস এই সন্ন্যাসিনীর মনের ভিতর যুক্তির অনেকটা স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে। কিন্তু তবু সে পরিতৃপ্ত হইল। তাঁহার কথায় যেন তার প্রাণে শক্তির ধারা ঢালিয়া দিল। কেন না মাদার ক্রিশ্চিয়ানা যখন ঈশ্বরের কথা, যীশুখৃষ্টের কথা, তাঁর প্রেমের কথা, ত্রাণ-কর্ত্তার অপূর্ব্ব আশার বার্ত্তার কথা বলিতেন তখন সে কথাগুলির ভিতর তিনি এমন একটা জীবন্ত শক্তি ঢালিয়া দিতেন যে তাহা শুভাকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া দিত। তাঁহার মুখ চোখ দিয়া অপূর্ব্ব দীপ্তি বাহির হইত, তাহা একটা আশ্চর্য্য উৎসাহ ও শান্তিতে শুভার হৃদয় ভরিয়া দিত। শুভা মুগ্ধ শান্তচিত্তে নূতন কিছু লইয়া ফিরিয়া আসিল।

অনেক দিন সে ভাবিল। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই মাদার ক্রিশ্চিয়ানার কথার মোহটা কাটিয়া গিয়া তার যুক্তির ফাঁকগুলি শুভার কাছে বড় হইয়া দেখা দিল। তাঁহার অপূর্ব্ব মধুর কথাগুলি যে যুক্তি হিসাবে খুব টেঁকসই নয় একথা আবিষ্কার করিয়া কিন্তু সে সুখী হইতে পারিতেছিল না। তার মন খুব আকুল ভাবে তাঁহারই কথা, তাঁর বর্ণিত ঈশ্বরের প্রেমের কথা, যীশুখৃষ্টের আশার বাণীর কথা বিশ্বাস করিতে চাহিতেছিল, কিন্তু তাহার তীক্ষ্ণ মেধা কিছুতেই তাহার মন স্থির হইতে দিতেছিল না। সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বময় ঈশ্বরের ত্রিত্ব, মানবের রক্ষার নিমিত্ত ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা, অথচ সেই ইচ্ছায় পরিপূর্ণ করিবার জন্য তাঁহার শক্তির অভাব—তাঁহার পুত্রের দ্বারা সেই অভাব পূরণ, আবার সেই ত্রাণ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য ঈশ্বরের শরীর ধারণ ও ত্যাগ এ সমস্তই তার কাছে সর্ব্বশক্তিমান, প্রেমময় ভগবানের সত্তার সঙ্গে অসঙ্গত বলিয়া মনে হইল। কিন্তু কাহিনীটি কি সুন্দর। যদি ইহা সত্য হয় তবে ইহার ভিতর কতবড় একটা আশার কথা, কত বড় একটা শক্তির প্রেরণা পাওয়া যায়। সে নিজের বুদ্ধিকে খর্ব্ব করিয়া বিশ্বাস করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। এই রূপে সে তার মনের সকল সন্দেহ সকল উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষার শান্তি করিতে চেষ্টা করিল। এই কথা যদি সত্য হয় তবে সকল বিরোধ, সকল দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায়, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মবিলোপনের দুই আদর্শের মধ্যে তার টানাটানি ফুরাইয়া যায়, যীশুখ্রীষ্টের অমর বাণী একান্ত সত্য বলিয়া আশ্রয় করিয়া সে তাহাতেই সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত লাভ করিতে পারে।

মাদার ক্রিশ্চিয়ানার জীবন, তাঁর বিশ্বাসী প্রেম, তাঁর উদার চরিত্র তাহাকে আকৃষ্ট করিত। তাহার মনে হইত যে এই রমণীর চরিত্রের মহত্বের ও জীবনের সার্থকতার প্রধান আশ্রয় ও উপাদান তাঁহার ধর্ম্ম।

সেও যদি সেই ধর্ম্ম পাইতে পারে, তার অতলস্পর্শ বিশ্বাস ও ভক্তি যদি সে তাহার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে তবে সেও অমনি ধন্য হইতে পারিবে। কিন্তু সে বিশ্বাস হয় কই? সে অনেক চেষ্টা করিত; যখনই সে নির্জ্জনে থাকিত তখনি সে আকুল ভাবে জগদীশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিত—"আমাকে ভক্তি দাও, আমাকে বিশ্বাস দাও।" কিন্তু কিছুতেই সে তা'র সন্দেহ দমন করিতে পারিত না।

তখন তার মনে পড়িত মাদার ক্রিশ্চিয়ানার কথা, মানুষের হৃদয়ে ঈশ্বর ও সয়তানের দ্বন্দ্ব চিরদিন চলিতেছে। একদিকে ঈশ্বরের বাণী আমাদের বিবেক বুদ্ধির ভিতর দিয়া সতত আমাদিগকে সত্য ও ধর্ম্মের পথ দেখাইতেছে, অপরদিকে সয়তান নানা প্রলোভনে আমাদিগকে সে পথ হইতে নিবৃত্ত করিতেছে। সয়তানের চেহারা চেনা কঠিন। সে সর্ব্বদাই বন্ধুরূপে দেখা দেয় এবং প্রায়ই সে ধর্ম্ম ও সত্যের নামে আমাদিগকে অধর্ম্মের পথ দেখায়। শুভা মনে করিল যে সত্য সত্যই সয়তান তাহাকে বিপথে লইবার জন্য ব্যবহার মনে এই যুক্তি তর্কের সৃষ্টি করিতেছে। শেষে সে স্থির করিল যে এ বিরোধ ও দ্বন্দ্বের শেষ করিয়া ধর্ম্মের আলোকে সত্যের পথ দেখিয়া সে কাজ করিতে লাগিয়া যাইবে, তবেই সে সত্য সত্য জীবনে সার্থকতা লাভ করিতে পারিবে। না হইলে যুক্তি তর্কের কখনও শেষ হইবে না, কাজ তাহার করা হইবে না। সমস্ত জীবন একটা তর্কের ভিতর দিয়া কাটিয়া যাইবে। সে স্থির করিল বিশ্বাস লাভ করিবার এক উপায় সাধনা। সে মাদার ক্রিশ্চিয়ানার নিকট দীক্ষা লইয়া তাঁর অনুমত সাধনা করিবে, তবেই সে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।

এই স্থির করিয়া সে একদিন কনভেণ্টে গেল। মাদার স্মিত মুখে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। শুভার সমস্ত জীবন যেন সে আলিঙ্গনে

ধন্য হইয়া গেল। সে তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া মাথায় তাঁর পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল, "মা আপনি আমাকে আলো দেখান, আমি আর সংসারে থাকতে পারি না. আমি যীশুখ্রীষ্টের চরণে আশ্রয় লইব। আপনি আমাকে দীক্ষা দিন।"

সন্ন্যাসিনীর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি গভীর দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যীশুখ্রীষ্টের নাম ধন্য হউক, তিনি তোমাকে উদ্ধার করিবেন। আমি তোমাকে দীক্ষা দিব কিন্তু তার আগে আমার কয়েকটা কথা বলিবার আছে। তুমি কি সয়তানকে একেবারে ত্যাগ করিতে পারিয়াছ ?"

শুভা। পারি নি। আমার মনে এখনো সন্দেহ আছে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে দীক্ষা ও সাধনার বলে আমি বিশ্বাস লাভ ক'রতে পারবো।

"শুনে সুখী হ'লাম, কিন্তু একবার ভেবে দেখ তোমার কি ক'রতে হ'বে। তোমার সমস্ত অতীত জীবন তোমার পেছনে ফেলে এসে অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা তোমার আত্মাকে শুদ্ধ ক'রতে হবে। মেরী মডলিনের মত একান্ত ভাবে তোমাকে প্রভু যীশুর কাছে আত্ম-সমর্পণ ক'রতে হবে।"

"আমি তা'তে প্রস্তুত। যাতে আমার মনুষ্য-জীবন সার্থক হবে তা'র জন্য আমি কোনও ত্যাগ স্বীকার করতে বিমুখ হব না।"

"তোমাকে বেশ্যাবৃত্তি ত্যাগ ক'রতে হ'বে।"

"আমি কখনও বেশ্যাবৃত্তি করি নি। জীবনে এক পাপ ক'রেছি, নগেন্দ্রকে ভালবেসে, তা'কে আমি এখনো ভাল বাসি, কিন্তু আমি তা'কে স্বেচ্ছায় ত্যাগ ক'রেছি।"

"তুমি এখন তবে কি করে খাও ?"

"আমি একট্রেস।"

"থিয়েটার তোমার পরিত্যাগ ক'রতে হ'বে।"

"করবো। আমি আপনার কাছে এসে আপনার আশ্রয়ে থাক্‌বো, আপনি আমাকে যা' করতে বলবেন তাই করবো। শুধু তাই নয়, আমার তিন হাজার টাকা সঞ্চয় আছে তা' সমস্তই আমি প্রভুর সেবার জন্য আপনার হাতে তুলে দেব। আপনি আমাকে দীক্ষা দিন।"

মাদার কিছু চিন্তান্বিতা হইলেন। তিনি বলিলেন, "দেখ শুভা, দীক্ষা আমি তোমাকে দেব, কিন্তু ঠিক তুমি যা' চাও তা' আমি দিতে পারবো না। আমি তোমাকে আমাদের এই কনভেণ্টে রাখ্‌তে পারবো না, আমাদের নিয়ম অনুসারে তা' অসম্ভব; কিন্তু আমাদের দেশীয় খৃষ্টানের মিশন হাউসে কিংবা উদ্ধারাশ্রমে তোমাকে আমি রেখে দেব, আর বলা বাহুল্য আমি তোমাকে সর্ব্বদাই উপদেশ ও শিক্ষা দেব। ঠিক এই কনভেণ্টে তোমাকে রাখবার অধিকার আমার নেই।"

শুভার মন অনেকটা দমিয়া গেল। সে মাদার ক্রিশ্চিয়ানাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার নিয়ত সাহচর্য্যে তার ধর্ম্মজীবন গঠিত করিবার সংকল্প করিয়াছিল, কোন্ এক অজ্ঞাত মিশন হাউসে যাইবার প্রস্তাবে তার উৎসাহ অনেকটা বাধা পাইল। কিন্তু সে কথা বলিল না। সে বাড়ী ফিরিবার পথে ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল যে, সে তাঁর উপদেশই মানিয়া চলিবে, যেখানেই তিনি তা'কে রাখুন, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই সে চলিবে।

আপাততঃ পনের দিন পরে সে দীক্ষা লইতে আসিবে স্থির করিয়া গেল।

[২২]

সুরেশবাবু ও চাঁপার কাছে কথাটা কেমন করিয়া পাড়িবে, শুভা স্থির করিতে পারিল না। তার মনের এই সব গভীরতর প্রশ্নের কথা সে তাহাদের সঙ্গে কখনও আলোচনা করে নাই, তাই তাহার সংকল্পের কথা তাহাদের কাছে ভাঙ্গিতে তা'র কেমন বাধ বাধ ঠেকিতেছিল। কেমন করিয়া কথাটা পাড়িবে সেই কথা সে সাতদিন ধরিয়া ভাবিল।

ইতিমধ্যে সুরেশবাবুর সঙ্গে তার সাহিত্যালোচনা রীতিমত চলিতে লাগিল। অনেকদিন আগেই সে একখানা নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেখানা ইতিমধ্যে শেষ করিয়া সে সুরেশবাবুকে দেখাইল। সুরেশবাবু খাতাখানা বাড়ী লইয়া গেলেন। দুই দিন পরে তিনি দুই খানা খাতা আনিয়া শুভাকে ও চাঁপাকে দিয়া বলিলেন "তোমাদের দু'জনের পার্ট আমি লিখে এনেছি, তোমরা ত'য়ের করে ফেল। আমি সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক ক'রেছি, ১৫ দিনের মধ্যে শুভার নাটকখানা প্লে করাব।"

শুভার বুক গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিল। তার প্রথম রচনা একেবারে এলবার্ট থিয়েটারে মহাসমারোহে অভিনীত হইবে—ইহাতে গর্ব্ব হইবারই কথা। নিজের ছেলেকে ভাল বলিলে যত আনন্দ হয় নিজের লেখাকে কেউ ভাল বলিলে তার চেয়ে বুঝি বা বেশী আনন্দ হয়। পুরাতন লেখকের এ আনন্দ কতকটা গা-সওয়া হইয়া আসে, কিন্তু প্রথম রচনার সমাদর দেখিয়া যে আনন্দ তার বুঝি জোড়া এ জগতে নাই। আজ শুভা সেই আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। তার খুব ইচ্ছা হইল সে তার নাটক-খানা সম্বন্ধে সুরেশবাবুর মতামত জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু লজ্জায় তাহা পারিল না।

চাঁপা বলিল, "সে কি সুরেশবাবু? আপনি ক্ষেপলেন না কি? আমি আপনার থিয়েটারে প্লে ক'রলে যে জেলে যাব।"

সু। আরে খেলে যা! শুভার নাটক নিয়ে আমি এতটা মেতে গেছি যে আসল কথাটাই তোমায় ব'লতে ভুলে গেছি। কাল আপীলের রায় বেরিয়েছে, আমরা অতুলের উপর মায় খরচা ডিক্রী পেয়েছি।

শুভা শুনিয়া খুসী হইল। এখন আর তার কোনও চিন্তা নাই। সে যখন থিয়েটার ছাড়িয়া যাইবে তখন চাঁপা তাহার স্থান লইতে পারিবে—এলবার্ট থিয়েটারের যে একেবারে সর্ব্বনাশ হইবে না, এই ভাবিয়া সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল।

তার পর সুরেশবাবু শুভার নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে মহা উৎসাহে নানারকম আলোচনা করিতে লাগিলেন। কোন্ পার্ট কাহাকে দেওয়া হইয়াছে, কোন্ সীনের জন্য কি কি নূতন রকমের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে তাহা বিস্তারিত করিয়া বলিলেন। শুভা বুঝিল যে খুব ঘটা করিয়া অভিনয় হইবে। সুরেশবাবু বলিলেন, "তোমার নাটকখানা যেমন সম্পূর্ণ নূতন ধরণের তেমনি অভিনয়ের আয়োজনটাও এমন ধরণের হ'বে যে কখনো তেমন কিছু এ দেশে হয় নি।"

শুভা শেষে কথাটা না পাড়িয়া পারিল না, সে বলিল, "এতটা হৈ চৈ ক'রছেন সুরেশ বাবু, শেষে অপদস্থ হ'বেন না তো, নাটক চলবে তো?"

"চলবে? দু'শোবার চলবে। এমন নাটক কি এ পর্য্যন্ত এ দেশে হ'য়েছে কখনো। যারা সমজদার তারা বুঝে যাবে যে এতদিন পরে বাঙ্গালা থিয়েটারে একখানা নাটকের মত নাটক অভিনয় হচ্ছে। আর যারা সমজদার নয়, তাদেরকে ভুলাবার জন্য এই সব বাইরের চটক্, যা'তে করে তারা একেবারে থ' হয়ে' যাবে।"

শুভা তৃপ্তির হাসি হাসিল। তাহার এখনকার আনন্দের মধ্যে

কোনও ক্লেদ ছিল না, কোনও তুষ্ট সংশয় তার এই প্রথম লেখার গর্ব্বের আনন্দকে কুণ্ঠিত করিতে পারিল না।

সে বলিল, "কিন্তু সুরেশ বাবু আমার ইচ্ছা যে এ নাটকে আমি না নামি। চাঁপা যখন নামতে পারবে তখন আমার নামবার কোনও দরকার নেই। আমি বরং একটু বাইরে থেকে একবার দেখবো।"

"পাগল! সে কি হয়? তোমার নাম শুনে লোকে ছুটে আসবে, আর প্লের বার আনা success তোমার নামের উপর নির্ভর করে। আর তা ছাড়া তোমাদের দু'জন ছাড়া হবেই না। সুচন্দ্রার পার্ট যদি চাঁপা নেয় তবে ভদ্রার পার্ট কে নেবে। দু'টোই খুব শক্ত পার্ট আর্টিষ্ট না হ'লে এ পার্ট উৎরাবে না। ওসব বাজে কথা রাখ, আমি এখন চল্লুম।" বলিয়া সুরেশবাবু চলিয়া গেলেন।

শুভা কিছুক্ষণ তার আনন্দটা নীরবে উপভোগ করিল। তারপর তা'র ত্যাগের প্রস্তাবের কথা মনে হইল। সে স্থির করিল, আজ কথাটা চাঁপার কাছে পাড়িতেই হইবে। তাই সে চাঁপাকে বলিল, "ভাই আমাকে তোমার শীগ্‌গিরই বিদায় দিতে হবে।"

চাঁপা চমকিয়া উঠিল, "কেন, আবার কি খেয়াল চাপলো মাথায়? নগেনের কাছে গিয়েছিলি বুঝি?"

"না ভাই, আমি ঠিক ক'রেছি এ সব আর করবো না। ধর্ম্মের পথ আশ্রয় করে যদি জীবন সার্থক হয় সেই চেষ্টা দেখবো।"

ধর্ম্মে কি ঘরে থেকে মন দেওয়া যায় না। রাস্তায় না বেরিয়ে পড়লে বুঝি ধর্ম্ম হয় না। মরণ আর কি? জীবন সার্থক, জীবন সার্থক করে তুই যে ক্ষেপে বসলি লো শুভা! আর কি চা'স্ তুই? এই এমন একখানা বই লিখে ফেল্‌লি যাতে সুরেশবাবু পাগল হ'য়ে গেছে।"

"ওঃ সুরেশবাবু পাগল না হয় কিসে? আমি যা' করি না কেন ও তাতেই পাগল হবে।"

"তা কতকটা ঠিক বটে, তবে সুরেশ রায় তেমন লোক নয় যে একটা যা' তা দিয়ে তাকে ভুলান যাবে। তুই তো জানিস্ না, ওঁর কাছে নাটক লিখে এনে কত লোক ঝুলাঝুলি ক'রেছে, কিন্তু তিনি এমন খুঁতখুঁতে যে কত নামজাদা লেখককে পর্য্যন্ত ফিরিয়ে দিয়েছেন। আর তা' ছাড়া সুরেশবাবু যাই ভাবুন, দু'দিন বাদে তোর বই বেরুচ্ছে, লোকে কি বলে তা' শুনতেই পাবি।"

"তা' ছাড়া ভাই, এতে আমার মন ভরছে না। আমার মন বলছে এই যে পথ এ কেবল ভোগের পথ। এতে এখনকার মত সুখ আছে শেষের কিছু লাভ নেই। আমি ত্যাগের পথ নিতে চাই। সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে ভগবানের পায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে মানুষের সেবায় সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দেব।"

"তা' বলি মানুষের সেবা কি থিয়েটারে থেকে করা যায় না? তা' নয় থিয়েটার নাই করলি, ঘরে বসে বই লেখ, মানুষকে তত্ত্বকথা শেখা, আর যত খুসী লোকের সেবা কর। আমাদের এ পাড়ার ভিতর গরীব দুঃখীর অভাব নেই, তাদের অন্ন বস্ত্র দে, পাপীর শেষ নেই, তাদের ধর্ম্মে মতি দে, ছোট ছোট ছেলে মেয়ে রয়েছে তা'দের লেখাপড়া শেখা, মানুষ করে তোল, কত রোগী ভোগী রয়েছে যা'দের দিকে ফিরে কেউ চায় না; যা'দের ওষুধ-পথ্যি মুখে উঠে না, তাদের চিকিৎসা কর'; শুশ্রূষা কর'; মানুষের সেবা করতে চাস্ তো এইখানেই তো তোর কাজ। বেশ্যাদের মত দুঃখী লোক জগতে নেই। যতদিন রূপ আছে, যৌবন আছে, স্বাস্থ্য আছে, ততদিন তারা কেবল ফুর্ত্তির উপর থাকে, সে ফুর্ত্তি যে কেমন তা' তো তুই জানিস। তারপর ব্যারাম হ'য়ে যদি পড়লো, তবে আর

তাকে দেখবার কেউ নেই, আর বয়স হ'লেও সেই কথা। তারপর দেখ এই ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলোর কথা। এই নরকের মধ্যে থেকে তারা কেবল গুণ্ডা আর বদমায়েস না হয়ে যায় না। এদের উদ্ধার করে মানুষ করাটাও তো একটা মস্ত কাজ। তোর বুদ্ধি আছে কাজ করবার ইচ্ছা আছে, টাকা কড়িও আছে, তুই কর না এই কাজ! কাজ কাজ করে হা হুতাশ করে কি দরকার। কাজ যদি চাস তো হাতের গোড়ায় যেটা আছে সেইটা কর না।"

শুভা ভাবিল। এই কাজটা তার সত্য সত্য মনে ধরিল। সে বুঝিল যে এখানে তার একটা কাজের প্রকাণ্ড ক্ষেত্র আছে। কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিল যে তার প্রথম কাজ মনটাকে শান্ত করা, বিশ্বাস লাভ করা। এই শান্তি লাভ করিতে পারিলে তবেই সে এ কাজে লাগিতে পারিবে। তা' ছাড়া মাদার ক্রিশ্চিয়ানার সাহায্য ও উপদেশে এ কাজ যত সহজ হইবে তার একার চেষ্টায় তত হইবে না। তাই সে অনেক ভাবিয়া শেষে বলিল, "করবো ভাই আমি এই কাজই ক'রব। কিন্তু আগে, যাঁকে আশ্রয় ক'রে এ কাজ ক'রব তাঁকে পেতে চাই, ভগবানকে মনের ভিতর প্রতিষ্ঠা না করলে কিছুতেই কিছু হবে না। তাই আগে চাই সাধনা আমি কিছু দিন সাধনা ক'রে তবে এ কাজের ভিতর ফিরবো।"

সাধনা এখানে বসে কর না। ঘরে দোর বন্ধ করে কুম্ভক প্রাণায়াম কি সব আছে কর না। আমি কি তোর হাত পা বন্ধ ক'রে রাখছি।"

শুভা হাসিয়া বলিল, "ও সব বুজরুকীতে কি ভগবানকে পাওয়া যায়?"

"না হয় তো তুই মন্ত্র নে, আমাদের গোঁসাই-ঠাকুরকে ডেকে মন্ত্র নিয়ে দিন রাত বসে হরিনাম কর। তোর মিঠে গলায় হরিনাম শুনলে হরিরও আসন টলবে লো।"

"না ভাই গোঁসাই-ঠাকুরের ধর্ম্মে আমার মন ওঠে না। আমার ভগবানকে আমি লম্পট বলে কল্পনাও ক'রতে পারি না।"

চাঁপা কাণে হাত দিয়া বলিল, "ছি ছি, যা নয় তাই বলিস না শুভা, হরির প্রেমের তত্ত্ব তুই কি জানিস। আমিই যে জানি তা' বলছি না, কিন্তু তবু না জেনে বুঝে ধর্ম্মের নামে আমি কুচ্ছো ক'রতে চাই নে।"

"কুচ্ছো আমি করছি নে ভাই, যেটা মনে সত্য বলে বুঝছি তাই বলছি। ভগবান বলতে আমি বুঝি এই সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা; শুধু সৃষ্টিকর্ত্তা নন, তিনি এর শাসনকর্ত্তা। তাঁর আইনে বিশ্বচরাচর চলছে, মানুষও চলছে। আমাদের কাছে সে আইন ব'লে দিচ্ছে আমাদের অন্তরাত্মা। সেই অন্তরাত্মা আমাদের ব'লে দিচ্ছে শুদ্ধ হও, শুচি হও, সে আমাদের জানাচ্ছে যে ভগবান পবিত্র, শুদ্ধ। আর এই বৈষ্ণব ধর্ম্ম শেখাচ্ছে কি না সেই ভগবান লম্পট। মানুষের কাছে যেটা অপবিত্র সেটা তাঁর ভিতর কল্পনা কেমন করে করি বল।"

"ভগবান আবার লম্পট কি রে! শুদ্ধ অশুদ্ধ, পাপ পুণ্য এতো মানুষের জন্য—যিনি সমস্ত জগতের আত্মা, তিনি পাপ পুণ্যের অতীত, শুদ্ধ অশুদ্ধের অতীত, আমাদের ছোট থাট ভাল মন্দর মাপে তার ওজন হবে কি রে?"

"আমাদের ছোটখাট ভাল মন্দর মাপ নয় ভাই, এ যে ভগবানের নিজের তৈরী ওজন, তিনি আমাদের এই বাটখারা দিয়েছেন ভাল মন্দ বেছে নেওয়ার জন্য।"

"আচ্ছা তাই যদি হবে তবে এ সব জগতে আছে কেন? ভগবান তো দুনিয়াটাকে একেবারে নিষ্পাপ, একেবারে শুদ্ধ, একেবারে স্বর্গ ক'রে গড়লেও পারতেন, তিনি কতকগুলো খারাপ জিনিস জগতে ঢোকালেন কেন?"

"তিনি তো ঢোকান নি, মানুষ আপনার দোষে আপনি পাপকে জগতে এনেছে।"

"তবে তো মানুষ বড় সহজ বস্তু নয়, ভগবানের চেয়ে কম সৃষ্টিকর্ত্তা নয়। ভগবান গড়লেন ধর্ম্ম, মানুষ গড়লেন পাপ, আর পাপটাই জগতে বড় হ'য়ে রইল। তোমার ভগবান তো বড় অক্ষম শুভা, তিনি মানুষের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারলেন না।"

কথাটায় শুভার মনে খট্‌কা লাগিল। এই পাপ পুণ্যের সঙ্গে ভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তা ও তাঁহার পুণ্যময়তার সমন্বয় করিবার চেষ্টায় তার মন বার বার এমনি প্রশ্নে বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। সে ইহার সদুত্তর দিতে পারে নাই। এখনও সে পারিল না। সয়তানের কথা, ঈশ্বরের শেষ মঙ্গলময় ইচ্ছার কথা, মেসায়ার কথা, মানবেব পরিত্রাণের কথা তার কাছে এখনও এতটা সত্য হইয়া দাঁড়ায় নাই যে এই সব প্রশ্নের উত্তরে সে সে সব কথা বলিতে পারে। তার নিজেরই মনে হইত যে এ সব কথা একটা সুন্দর কবি-কল্পনার চেয়ে বেশী কিছু নয়। তাই চাঁপাকে সে সব উত্তর দিল না।

সে বলিল, "কে জানে ভাই ভগবানের কি ইচ্ছা। আমরা ছোট্ট জীব এ সব বড় বড় কথার উত্তর আমরা জানি না, এ সবের ভিতর তাঁর কোন গূঢ় মঙ্গলের ইচ্ছা রয়েছে, কিসের জন্য তিনি এমন ক'রে ভালয় মন্দয় জগৎ গড়েছেন তা' তিনিই জানেন।"

"তা তো বটেই, কিন্তু তবু আমরা তো যা' বুঝবো তাই না মেনে পারি নে। আমাকে যদি তুমি না বোঝাতে পার যে কাকের রঙ লাল, তবে যতক্ষণ আমি চোখে তাকে কাল দেখছি ততক্ষণ তাকে কালো দেখবই। তোমার উপর আমার যত বড় বিশ্বাসই থাকুক না কেন, যতই আমি মনে মনে জপ করি না কেন যে কাক লাল, তবু কাককে লাল বলে

বিশ্বাস ক'রতে কিছুতেই পারব না। তাই মানতে হ'লে কথাটা বোঝবার মত হওয়া চাই।"

"কিন্তু এ সব যে বুদ্ধির অতীত কথা, এখানে বিশ্বাস ছাড়া কি উপায় আছে?"

"বুদ্ধির অতীত এই হিসাবে যে আমরা নিজে বসে এর একটা উত্তর বের না ক'রতে পারি। কিন্তু যদি আর কেউ এসে আমাদের জানায় যে এর সত্যি উত্তর অমুক, তখন যেটা সত্যি কি মিথ্যে তার বাছাই হবে আমাদের বুদ্ধি দিয়ে। আমার মন সেটাকে যদি মিথ্যে বলে বুঝতে পারে তবে সে বক্তা হাজার বড়লোক হোন না কেন তাঁর কথা আমার কাণে পৌঁছাবে না। ধর না এই গোঁসাই-ঠাকুর সেদিন এই কথাটা যে ব্যাখ্যা করলেন সেটা আমার মনে হ'ল খাঁটি সত্য, তার ভিতর তো আমি কোনও গোঁজামিল পেলুম না। তিনি বল্লেন, ভগবানের কাছে ভাল মন্দ তফাৎ নেই, চিরকালই সব অবস্থায় মন্দ কিছু জগতে নেই। ভগবানের জগতে এমন কিছু আছে যার স্বরূপ মন্দ এ কথা মনে করলেও পাপ আছে। সব জিনিসই ভাল, তাকে কে কেমন ভাবে নেয় তাই দিয়ে হয় পাপ পুণ্য। গোবর খুব একটা খারাপ জিনিস যদি সেটা তোমার খাবারের থালার উপর থাকে, কিন্তু ঘর নিকোতে কি জমীতে সার দিতে গেলে সেটা খুব ভাল জিনিস। এমনি সব। কোনও কিছু ভাল বা মন্দ নেই, যে ভাবে তাকে তুমি নেও তাতেই ভাল বা মন্দ হয়। তোমার চিত্ত যদি শুদ্ধ থাকে তবে যেটা ভাল কাজ, তার ভিতর যদি চিত্তশুদ্ধি না থাকে তবে সেটা ভাল নয় মন্দ। ভগবানের প্রেমলীলায় এই কথাই বুঝিয়েছেন—তিনি এ কথা বলে দেন নি যে তুমি লম্পট হও—তিনি দেখিয়েছেন যে তোমার চিত্ত যদি পাপ পুণ্যের অতীত হয়, তবে তোমার শরীরের কোনও কাজে তোমায় পাপ স্পর্শ ক'রবে না।"

শুভা একটু হাসিল, বলিল, "তাই জন্তেই তো আমাদের দেশে ধর্ম্মের নামে যত পাপের আচরণ হচ্ছে। সেদিন কল্কি অবতারটা কি না ভীষণ কাণ্ড ক'র্‌লে। বামাচারী তান্ত্রিকেরা কি সব বীভৎস কাজ ক'রে বেড়াত, ধর্ম্ম ব'লে। আজও তাদের বংশধরেরা কি না পাপ ক'রে বেড়াচ্ছে। আমার শ্বশুরের গুরুঠাকুর—যাক্ সে পাপিষ্ঠের কথা আর নাই বল্লাম।"

"কথাটা মনে ধরলো না। আচ্ছা, তোর কথা দিয়ে কথাটা হিসাব ক'রে দেখ। তুই স্বামী ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে এসেছিস। এটা পাপ—সব শাস্ত্রে, সব সমাজে বলে যে এটা পাপ। ঠিক তোর মত মীরাবাইও স্বামীকে ছেড়ে দিয়েছিল। তুই কি পাপ করেছিস স্বামীর ঘর ছেড়ে এসে, না মীরাবাই পাপ ক'রেছিল?"

শুভা ভাবিল। বলিল, "পাপ করিনি, সাহস ক'রে ব'লতে পারি না। আমি আমার কর্ত্তব্য করি নি বোধ হয়!"

"সে কি লো, এই না সেদিন তুই সুরেশ বাবুর সঙ্গে তর্ক কর্‌লি। মেয়েমানুষও তো মানুষ, তার ভিতর মনুষ্যত্ব ফুটিয়ে তুল্‌তে সে বাধ্য, আর স্বামী যদি তাতে অন্তরায় হয়, তবে তাকে ত্যাগ করা তার ধর্ম্ম! আজ আবার এ কি কথা?"

"জানি না ভাই, বুঝতে পারি না কিছু। আমি নিজের মনের ভিতর এটা কিছু অন্যায় ব'লে বুঝি নি। কিন্তু ভেবেছি যে অন্ত একটা স্ত্রীলোক যদি এমনি করে, বিশ্বশুদ্ধ সবাই যদি এমনি বিবাহ-বন্ধনটাকে আপনার ইচ্ছায় ঘুচিয়ে দিতে চায় তবে—" বলিয়া সে ভাবিল—পরে বলিল, "তাই বা কি? সমাজের শাসনটাকে সব সময় ন্যায় বলে যদি মানা যায়, তবে সমাজের পাপ যাবে কি ক'রে। না আমি ঠিক ক'রেছি। অন্যায় করি নি।"

"স্ত্রীর উচিত স্বামীসেবা করা, না করলে পাপ হয় এটা সাধারণ নিয়ম তুই মানিস্ ?"

"ব'লতে পারি না, স্বামীসেবা ঠিক নয়, স্বামীর সাহচর্য্য হ'তে পারে।"

"তাই না হয় হ'ল, তুই স্বামীত্যাগ করে এসে অধর্ম্ম করিস নি বরং ধর্ম্মই করেছিস্ বলতে চাস। কেন, না তোর মনে ছিল একটা বড় আদর্শ। তবেই তো হ'ল ভাল মন্দ, কাজটা দিয়ে হয় না, কাজের ভিতর চিত্তশুদ্ধি আছে কি নেই তাই দিতে হয়। তুই যদি পাপবুদ্ধিতে বাড়ী ছেড়ে আস্তিস্ তবে তাতে পাপ হ'ত, ধর্ম্মবুদ্ধিতে ছেড়ে এসেছিস বলে পাপ হয় নি।"

শুভা কোনও কথা বলিল না। কথাটা একেবারে উড়াইয়া দিবার মত নয়। কিন্তু মাদার ক্রিশ্চিয়ানার উপদেশের সঙ্গে ইহার মিল নাই। তিনি বলিলেন যে পাপ পুণ্যের প্রভেদকে এমনি করিয়া উড়াইয়া দিলে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারে কোনও নিশ্চয়তা থাকে না, ঈশ্বরের বাক্যকে অসত্য বলিতে হয়, পবিত্রতার কোনও মূল্য থাকে না। এমনি মনোরম যুক্তি দিয়াই শয়তান জিজ্ঞাসুদেরকে পথভ্রান্ত করিতে চায়। সংশয় বাড়িয়া চলিল। আর যতই তার সন্দেহ বাড়িতে লাগিল, ততই সে দীক্ষা লইয়া সকল সন্দেহের মুখ বন্ধ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

কিন্তু তাঁর নিজের নাটকখানা অভিনয় না করিয়া যাইতে কিছুতেই মনকে রাজী করিতে পারিল না। নিজের নাটক অভিনয় করিয়া মুগ্ধ দর্শকদের কাছে ঘন করতালি লাভ করিবার আনন্দের কল্পনায় তার রক্ত নাচিয়া উঠিল। সুরেশ বাবু যখন বলিয়াছেন নাটক ভাল হইয়াছে তখন প্রশংসা যে মিলিবেই তাহাতে তার

বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না—আর সন্দেহ করিতে মন চাহিতেছিল না। আর তার মনে বিশ্বাস হইয়াছিল যে সে এই নাটকের দ্বারা সাহিত্য-জগতে একটা স্থায়ী নাম করিবার অধিকার পাইয়াছে। ইহাতে লোকশিক্ষার সহায়তা করিবে সে বিষয়েও তাহার সন্দেহ ছিল না। সে অনেকটা ইবসেনের ধাঁচে লিখিয়াছিল এবং ইবসেনের নাটকে যে মহত্ত্ব ও গৌরবের আদর্শ কল্পিত হইয়াছে ঠিক সেই শ্রেণীর চরিত্র-গৌরবই সে তাহার নায়িকার ভিতর ফুটাইয়া তুলিতে, চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার ভিতর সঙ্গে সঙ্গে সে মাদার ক্রিশ্চিয়ানায় শিক্ষার কতকটা ঢুকাইয়া দিয়াছিল।

[২৩]

চাঁপা একটা কীর্ত্তন গাইতেছিল। সে আজকাল খুব কীর্ত্তন গাহিত। অধিকারী আসিয়া রোজ তাহাকে শিখাইত, আর সে প্রায়ই গোঁসাই-ঠাকুরের কাছে যাইত। আজ স্নানের পর শুভা চাঁপার কপালে তিলক ছাপ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল, জামার তলা দিয়া একটা তুলসীর মালাও দেখা গেল।

শুভা বলিল, "কি ভাই দেখছি একেবারে ভেক নেবার পথে।"

চাঁপা বলিল, "রাম বল, ও সব বুজরুকী। বয়স হ'তে চল্ল, একটা কিছু ক'রে খেতে হবে তো। রূপ যৌবন গেলে থিয়েটারে কেউ পুছবে না। তাই মনে করেছি কীর্ত্তনওয়ালী হ'ব, তাই এ সব বুজরুকী।"

শুভা বলিল, "তুই আমার কাছেও লুকোবি, এত বড় তোর হিম্মৎ। তুমি যে মরেছ তা' আমি দেখতে পাচ্ছি।"

চাঁপা হাসিয়া বলিল, "মিথ্যে নয়। আমি একটা কীর্ত্তনের বায়না নিয়েছি, এই মঙ্গলবারে যাব।"

শুভা লক্ষ্য করিল এখন চাঁপা দিন রাত কীর্ত্তন গায় আর মাঝে মাঝে দুয়ার বন্ধ করিয়া বোধ হয় মালা জপ করে। দেখিয়া শুভা ভাবিতে লাগিল, কি অপদার্থ সে! চাঁপার যখন ধর্ম্মে মতি হইল সে চট্ করিয়া একটা করিয়া বসিল, আর সে কেবল মনে মনে জল্পনা কল্পনাই করিতেছে। অবশ্য চাঁপা যে পথে গিয়াছে সে পথের উপর তার শ্রদ্ধা নাই, এবং চাঁপার বুদ্ধি বিবেচনার চেয়ে তার এ বিষয়ে বুদ্ধি বিবেচনা অনেক বেশী তাহাও সে বুঝিল। কিন্তু এই চিন্তাটাই তাকে পীড়া দিতে লাগিল যে চাঁপার মনে কতটা জোর বেশী। সে একটা কিছু করিবার পথ কত সহজে ঠিক করিয়া লইয়া তাহা করিতে পারে। শুভা যতক্ষণ জল্পনা কল্পনা করিয়া খুব একটা বড়, খুব একটা অসাধারণ কিছু করিবার জন্য পায়তাড়া করিতেছে, ততক্ষণ চাঁপা কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। আর সে আরম্ভের মধ্যে কোনও আড়ম্বর নাই, পাড়ার লোক ডাকিয়া আন্দোলন আলোচনা নাই, কোনও শোর গোল কিছু নাই। নিজের মনে বুঝিয়া চট করিয়া সে সিদ্ধান্ত করিয়া বসিল আর কাজে লাগিয়া গেল।

শুভা তখনও জানিত না যে চাঁপা কতখানি কাজে লাগিয়া গিয়াছে। চাঁপা চিরকালই দয়াবতী, পাড়ার কোনও লোকের অসুখ হইলে শুশ্রূষা করিতে টাকা পয়সা দিয়া সাহায্য করিতে সে বরাবরই প্রস্তুত ছিল। কিন্তু শুভার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবার পর তার মনে বড় বড় কথা জাগিয়া উঠিয়াছে, সেও একটা বড় রকমের কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু যেমন তার অভ্যাস, সে বড় জিনিসটাকে খুব ছোট ও সাধারণ বলিয়া চালাইতে ব্যস্ত। সে তার বাড়ীর ভাড়াটিয়াদের সব উঠাইয়া দিয়াছে। আর পাড়ায় যেখানে যে নিরাশ্রয় পীড়িত নারী আছে তাহাকে আদর করিয়া সেই বাড়ীতে লইয়া আশ্রয় দিয়াছে। নীচের তলায় সে একটা ওষুধের দোকান করিয়াছে, সেখানে একজন

ডাক্তার সর্ব্বদা উপস্থিত থাকেন, সব রকম ঔষধ পত্র ও যন্ত্রপাতি সেখানে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে। তার বাড়ীতে যত সব আর্ত্ত ও পীড়িত লোক থাকে ডাক্তার বাবু তাদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেন—চাঁপা তাহার জন্য তাঁহাকে মাসিক কিছু পারিশ্রমিক দেয়। আর এই সব রোগীদের শুশ্রূষার জন্য সে কয়েকটি ঝি রাখিয়াছে, তারা পাড়ার বাছা বাছা মেয়ে, শুশ্রূষার কাজে অদ্বিতীয়া। চাঁপা অবসর সময় প্রায়ই সেখানে কাটায়। ফলে চাঁপা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল একটা হাঁসপাতাল, কিন্তু কোনও দিন সে মুখ ফুটিয়া সে কথা বলে নাই, লোকেও কেউ সে কথা জানে না। ডাক্তার বাবুর দয়ার কথা লোকে খুব জানিত এবং তা'তে সে পাড়ায় তাঁর পসার জমিয়া গেল। কিন্তু এ দয়ার যে উৎস কোথায় তাহা কেহ জানিল না।

চাঁপা যখন গোঁসাই-ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিল, তখন তাহার হাঁসপাতাল প্রায় ভরিয়া উঠিয়াছে। ইহার খরচ জোগাইতেই হইত অনেক, অথচ ইনজাংসনের ফলে চাঁপার রোজগারের পথও বন্ধ, তাই সে কীর্ত্তন গাহিবার বায়না লইতে আরম্ভ করিল। তার পর তার এক খেয়াল হইল সে তার বাড়ীর উঠানে পাড়ার লোক ডাকিয়া গোঁসাই-ঠাকুরের কথকতার আয়োজন করিল—সঙ্গে সঙ্গে তা'র নিজের কীর্ত্তন চলিল।

চাঁপার এই সব কাজে ডাক্তার বাবুর খুব উৎসাহ। তিনি অনেক দিন দেখিয়া দেখিয়া শেষে প্রস্তাব করিলেন, "আমি কয়েকদিন কথকতা করিতে চাই, তবে সে একটু অন্য ধরণের।" চাঁপা সম্মত হইল, ডাক্তার বাবু ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সহায়তায় স্বাস্থ্য-রক্ষা, শরীরতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। চাঁপার কাণ্ডকারখানায় পাড়ায় একটা সম্পূর্ণ নূতন রকমের সাড়া পড়িয়া গেল।

একদিন সুরেশবাবু আসিয়া বলিলেন, "চাঁপা, তুমি এত বড় একটা হাঁসপাতাল করেছ, আমাদের একটিবার বল নি।"

শুভা অবাক্ হইয়া চাঁপার দিকে চাহিল। চাঁপা হাসিয়া বলিল, "আহা! শোন কথা, আমি আবার হাঁসপাতাল ক'রতে গেলুম কবে? ঐ একরত্তি বাড়ীতে দু'টো রুগী মানুষকে থাকতে দিয়েছি, তা'র নাম হ'ল হাঁসপাতাল।"

"তা তো বটেই! একরত্তি বাড়ীতে তুমি সত্তর আশিজন লোক ঢুকিয়েছ, আর তাদের ওষুধ পথ্যি জোগাচ্ছ, আর ডাক্তার—"

চাঁপা। সুরেশবাবু কি যে বলে? আমি কেন ওষুধ দিতে যাব, জগৎ-ডাক্তার নিজে বিনা পয়সায় এদের দেখে ওষুধ দেয়—"

সুরেশ। চাঁপা তুমি বুঝি জন্মে এমন পাপ কার্য্য কখনও করনি?

চাঁপা অবাক হইয়া চাহিল। সুরেশবাবু বলিলেন, "তা নইলে এই কাজটাকেই এত করে গোপন করবার চেষ্টা করছো কেন? আমাদের কাছে বল্লে কি আমরা তোমার পুণ্যি কেড়ে নিতাম? কি বল শুভা?"

শুভার মুখে কথা ছিল না। সে অবাক্ হইয়া ভাবিতেছিল এই কর্ম্মপটু রমণীর আশ্চর্য্য নীরব সাধনা। সে ধরিয়া বসিল, তখনই হাঁস-পাতাল দেখিতে যাইবে। কাজেই চাঁপার যাইতে হইল। যাহা দেখিল তাহাতে সে অবাক্ হইয়া গেল। তাহার মনে মনে নিজকে চাপার চেয়ে কোনও বিষয় শ্রেষ্ঠ বলিয়া যে একটা প্রচ্ছন্ন গর্ব্ব বরাবর ছিল, সেটা যে মিথ্যা তার চোখে আজ প্রথম ধরা পড়িল। সে নীরবে চাঁপার আশ্চর্য্য চরিত্রের কথা ভাবিতে লাগিল। চাঁপার কাছে তার নিজেকে আজ অত্যন্ত হীন ও অপদার্থ বলিয়া মনে হইল। সে কোনও কথা বলিল না।

সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় সুরেশ বাবু আসিয়া চাঁপাকে একটা গান গাহিতে বলিলেন, সুরেশ বাবু হারমোনিয়ামে গিয়া বসিলেন। চাঁপা নীরবে গিয়া খোলটি আনিয়া তাঁহার হাতে দিল। সুরেশ বাবু হাসিয়া হারমোনিয়াম ছাড়িয়া খোল ধরিলেন, চাঁপা একটা কীর্ত্তন গাহিল। সেটা রাধার আত্মনিবেদনের গান, যেমন বেদনা করুণ, তেমনি প্রেমরসে ভরপূর। চাঁপা সমস্ত হৃদয় দিয়া গাহিয়া গেল, গাহিতে গাহিতে তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। শুভাও চক্ষু মুছিয়া শেষ পাইল না।

সুরেশ বাবু খোল ফেলিয়া চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "খুব কাঁদালে খানিক চাঁপা। এমন কায়দায় পেয়ে কাঁদিয়ে নেবার তোমার কি দরকার ছিল বল দিকিনি? আচ্ছা শুভা এখন একটা গান গাও, তোমার নিজেরই একখানা গাও—সেই ভদ্রার গানখানা গাও তো,

"আনন্দে মেল গো আঁখি
মাথা তুলে আজ দাঁড়াও মর্ত্ত্যে
নারী ব'লে গায় অপমান মাখি
রহিও না পড়ি অতল গর্ত্তে।"

"খুব spirited গানটা তোমার—"

শুভা বলিল, "না থাক, ওটা নয় আমার আর একটা গান মনে আসছে," বলিয়া সে গাহিল,

"আমার মাথা নত করে দাওহে তোমার
চরণ ধূলার তলে।"

সুরেশ বাবু হারমোনিয়াম ছাড়িয়া উঠিলেন—বলিলেন, "থাক্, আজ তোমাদের মেজাজ ভাল নেই, এই সব নাকি কান্নার গান গেয়ে আমারও

মেজাজটা খারাপ করে দিলে। আমার মনটা আজ ভারি হাল্কা লাগছিল কিন্তু তোমরা আমায় মাটি ক'রে ফেল্লে। যাক্, একটা কথা আমার মনে হচ্ছিল, সেটা তোমাদের ব'লে ফেলি। চাঁপা যে কাজ আরম্ভ করেছে এটাকে পূর্ণাঙ্গ করবার জন্য আরও কয়েকটা জিনিস চাই। একটা স্কুল ক'রতে হবে, সেখানে এই বেশ্যাপাড়ার ছেলেপিলে-গুলো যাতে মানুষ হ'য়ে উঠতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে। সে স্কুলটা একটু নতুন ধরণের হ'বে। ছাত্র ও ছাত্রীরা সব সেই স্কুলে থাকবে, বাড়ীতে যেতে পাবে, কিন্তু রাত্রে থাকতে পারবে না। আর এখানে তারা লেখাপড়া ছাড়া এমন কোনও কাজ শিখবে, যাতে তারা স্কুল থেকে বেরিয়েই একটা সাধু উপায়ে রোজগার ক'রে খেতে পারে। এমনি একটা স্কুলের কথা অনেকদিন থেকেই আমার মনের ভিতর গজ্ গজ্ ক'রছে, কিন্তু আমি মনে ভাবিনি কখনও যে সে রকম কোনও অনুষ্ঠান সম্ভব হ'বে। কিন্তু চাঁপা যা ক'রেছে তা দেখলে মনে হয় যে ও সেটা দাঁড় করাতে পারবে। আমি যেটা কল্পনা করেছি সেটা মস্ত বড় ব্যাপার, তাতে লাখখানেক টাকার কম কোন কাজই হবে না। সে আশায় বসে থাকলে কোনও দিন এটা হ'বে না। আমি আমার স্কীমটা বলে যাই, তোমরা দু'জনে ব'সে সেটাকে ছেঁটে কেটে ছোট করে কি রকম কি করা যায় তার ব্যবস্থা ক'রো।"

বলিয়া সুরেশ বাবু জার্ম্মাণীর Realschulenএর আদর্শে এক প্রকাণ্ড কারখানা ও বিদ্যালয়ের আঁচ দিয়া গেলেন। চাঁপা বলিল, "দেখুন সুরেশ বাবু, আমি মুখ্খু সুখ্খু মানুষ, আমার মাথায় কি এসব খেলে, এ কাজ শুভার।"

শুভা বলিল, "আর লজ্জা দিওনা ভাই, আমি কি জানি? আমি গোড়ায়ও তোমার শিষ্যা ছিলাম এখনও তোমারই শিষ্যা, আমাকে

শিখিয়ে পড়িয়ে দেও, যদি কোনও কাজ আমার দ্বারা হয় তবে আমি তা' করতে চেষ্টা করবো।"

চাঁপা তার গালে ঠোনা মারিয়া বলিল, "নেকী, বিনয় হ'চ্ছে। আমি এসব শিখলুম কোত্থেকে রে? এ বাড়ী তো আমার চিরদিন আছে, কিন্তু এসব আমার মাথায় ঢোকালে কে? তোর কথায়ই না আমার মনে এই সব খেয়াল ঢুকেছে। তোর মুখে শুনেই আমার মনে হ'য়েছে যে সত্যি সত্যিই আমার জন্মটা মিথ্যেই যাচ্ছে, কেবল খেয়ে পরে, নেচে গেয়ে দিন কাটালে যে জীবন সার্থক হয় না, সে তোরই শিক্ষা।"

"তাই আমি যতদিন আকাশের দিকে চেয়ে ভাবছি, ততদিন তুই এই বিরাট যজ্ঞি হাসিল করেছিস। তোর কথা শুনে আমার লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে ক'রছে।"

কথায় কথায় শুভার নাটকের কথা উঠিল। তার প্রথম অভিনয় হইতে আর দুই দিন মাত্র বাকী আছে। কাল রাত্রে পুরাপুরী ড্রেস রিহার্সাল হইয়া গিয়াছে। রিহার্সালে কয়েকজন নামজাদা সাহিত্যিক ও নাট্যরথী উপস্থিত ছিলেন। সুরেশ বাবু বলিলেন তাঁরা পাঁচমুখে সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন। এ কথায় শুভার মনটা কতকটা চাঙ্গা হইল কিন্তু আজকার কাণ্ডে তার প্রাণটা যেমন দমিয়া গিয়াছিল এবং নিজের উপর যেমন অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল তাহা একেবারে সারিল না।

সে সংকল্প করিল চাঁপার মত সেও দ্বিধা না করিয়া তাহার অভীষ্টপথে নামিয়া পড়িবে। সংকল্প স্থির করিয়া রাত্রে শুইবার আগে সে একান্ত মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিল। তার পর শান্তচিত্তে সে শুইতে গেল।

পরের দিন সকাল বেলায় উঠিয়া তাহার হঠাৎ গা বমি বমি করিয়া উঠিল। সে আবার শুইয়া পড়িল। সমস্ত সকালটা তার এমনি করিতে

লাগিল, সে চাঁপাকে কিছু বলিল না। সেই দিন শেষ হইবার পূর্ব্বেই সে বুঝিল তাহার সংকল্প সাধনের পথে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। কয়েকদিন বাদে সে চাঁপাকে বলিল। চাঁপাও দেখিয়া শুনিয়া সাব্যস্ত করিল তাহার অনুমান ঠিক—শুভা অন্তঃসত্ত্বা।

শুভা প্রথম একচোট খুব কাঁদিল। সে ভাবিল এই পাপ লইয়া সে মাদার ক্রিশ্চিয়ানার কাছে কেমন করিয়া দাঁড়াইবে। আর তিনিই বা তাহাকে এই অবস্থায় গ্রহণ করিবেন কিনা, কে জানে? যে পাপ একেবারে চুকিয়া গিয়াছে বলিয়া সে মন হইতে দূর করিয়াছিল তাহা যে এতদিন এমনি করিয়া তাহাকে বেড়িয়া রাখিয়াছিল তাহা তো সে জানিত না। সে দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইল ইহাতে তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ অন্ধকার করিয়া দিয়াছে। ছেলেটা না হওয়া পর্য্যন্ত তো সে একেবারে বদ্ধ, আর তার পরেও যে কতদিনে যে সে মুক্তি পাইবে তা' কে জানে। তার ছেলে তো তারই মানুষ করিতে হইবে, তাতেই তো তার সমস্ত জীবন কাটিয়া যাইবে।

আর মানুষই বা করিবে কি ছাই! এই ছেলে সংসারে যে একটা বোঝা লইয়া জন্মিবে তাতে তার পক্ষে লোকসমাজে মাথা তুলিয়া দাঁড়ানই অসম্ভব হইবে। তাকে একটা লোকের মত লোক করিয়া দাঁড় করাইবার আশা দুরাশা মাত্র। জারজ পুত্র বেশ্যাপল্লীতে জন্মিয়া খুব সম্ভবতঃ একটা গুণ্ডা বা বদমাইস হইবে—তাহা হইলেই তার জীবনের খুব চরম রকমের সার্থকতা লাভ হইবে।

মনে হইল, এক উপায় হইতে পারে, সেটা নগেনের হাত। নগেন যদি নিজের দায়িত্ব গ্রহণ করে, যদি এই আবেষ্টন হইতে তার পুত্রকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যায় তবেই সে ছেলে মানুষ হইবার একমাত্র সম্ভাবনা। তা' কি সে করিবে না? নিশ্চয় করিবে। এখনো তো

নগেন তার জন্ত অস্থির, তার খাতিরেও কি সে ছেলেটার যত্ন করিবে না।

এই কথায় তাহার চিন্তার ধারা যে পথে প্রবাহিত হইল তাহা ঠিক তীব্র বেদনাদায়ক নয়! এই ভ্রূণকে লক্ষ্য করিয়া যে তার নগেনের সঙ্গে পরিচয় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এ কল্পনায় তাহার বিবেক তাহাকে পীড়া দিল, কিন্তু সমস্ত শরীর পুলকিত হইয়া উঠিল। নগেনের সঙ্গে আবার দেখা হইলে কি কথাবার্ত্তা হইবে তাহা লইয়া মনে মনে নানা-রকম ভাঙ্গাগড়া করিয়া সে খানিকক্ষণ বেশ আনন্দেই সময় কাটাইল। পরমুহূর্ত্তে তার কর্ত্তব্যবুদ্ধি তাহাকে কশাঘাত করিল, চপলার চিন্তা ভাসিয়া উঠিল। সে হাসিয়া কাঁদিয়া রাত কাটাইল।

[২৪]

শুভার বালির প্রাসাদ ফুৎকারে উড়িয়া গেল।

বিশ্বজোড়া চিন্তা আসিয়া তার ঘাড়ে চাপিল। এতদিন সে একলা ছিল, তার নিজেকে লইয়া সে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিত—কিন্তু এখন সে তা পারে কই? যে প্রকাণ্ড ত্যাগের সংকল্প সে করিয়াছিল সে তো আর এখন তাহা করিতে পারে না। যে হতভাগ্য জীবটি সমস্ত জগতের ধিক্কার ও অভিশাপের বোঝা লইয়া জগতে আসিতেছে সেই, তার একমাত্র আশ্রয় ও সম্বল। যাহাতে তাহার পক্ষে জীবন সহনীয় হয় যাহাতে সে মানুষ হইতে পারে সে ব্যবস্থা করিতে সে বাধ্য। কাজেই টাকার দরকার। তার যশ ও সৌভাগ্য সে যতটা টাকায় পরিণত করিতে পারে ততই

মঙ্গল। কাজেই থিয়েটার তার ছাড়া হইতে পারে না, দীক্ষা সে লইতে পারিবে না, তার জীবনে যত কিছু মহৎ আশা ও আকাঙ্ক্ষা সব বিসর্জ্জন দিয়া তাহাকে এই ভবিষ্য শিশুর সেবায় আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। এই সার্থকতাই কি ভগবান তাহার অদৃষ্টে লিখিয়াছিলেন ?

আর একদিক হইতে আর একটা ধাক্কা আসিয়া তাহার আশার প্রাসাদের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহাও উড়াইয়া লইয়া গেল। তার নাটক চলিল না। প্রথম অভিনয় রজনীতে বিজ্ঞাপনের প্রভাবে থিয়েটার লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল, অনেক লোক স্থানাভাবে ফিরিয়া গেল। কিন্তু খবরের কাগজে ইহা লইয়া একটা ভীষণ হৈ চৈ পড়িয়া গেল। কোনও কোনও সম্পাদক ইহাকে এক কথায় 'রাবিশ' বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। কেহ বা সুরেশ বাবুর লম্বা লম্বা বিজ্ঞাপনের আশায় মামুলী দু'কথা সুখ্যাতি করিয়া দিলেন, কেউ বা মৃদুভাবে নিন্দা করিলেন। কিন্তু পত্রপ্রেরকের নাম দিয়া প্রায় সব কাগজেই শুভা ও তাহার নাটককে গালি দিল। একজন লিখিলেন "এই নাটক হিন্দু সমাজের গোড়ার গাঁথুনিটা একেবারে মুচ্‌ড়াইয়া ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছে। এই দেব-প্রতিষ্ঠিত সমাজের উপর দিয়া এমন লক্ষ লক্ষ ঝড় বহিয়া গিয়াছে, সমাজ ভাঙ্গে নাই। তাই সমাজের জন্য আমরা ভয় করি না। কিন্তু সমাজের ভিতর যে সব উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি আছে তাদের উপর এই নাটকের প্রভাব অতি ভীষণ হইবে। এমন একটা নীতি-বিগর্হিত অশ্লীলতাপূর্ণ সৃষ্টি ছাড়া নাটক যে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় হইতে পারে সে কেবল রাজশক্তির সঙ্গে সমাজের কোনও সংযোগ নাই বলিয়া। আমাদের আশা আছে যে গবর্ণমেণ্ট এই দুর্নীতিপূর্ণ গ্রন্থের পুনরভিনয় বন্ধ করিবেন। যদি তাহা না করেন তবে আশা করি আমাদের দেশবাসীরা আপনি ইহার প্রতিবিধান করিবেন।"

অপরাপর লেখক ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের অভিশাপ শুভার মস্তকে বর্ষণ করিল।

ইহার পর আর দুই দিন অভিনয় চলিল। তৃতীয় দিনে কতকগুলি লোক দল বাঁধিয়া থিয়েটারে উৎপাত আরম্ভ করিল। শুভা আসিলেই তাহাকে "দুয়ো দুয়ো" বলিয়া আর কেহ বা অকথ্য গালিবর্ষণ করিয়া সম্ভাষণ করিতে লাগিল আর চেঁচামেচি, হট্টগোল করিয়া অভিনয় অসম্ভব করিয়া তুলিল। শেষে সুরেশ বাবু অভিনয় বন্ধ করিয়া দিলেন। শুভা কাঁদিয়া লুটাপুটী খাইতে লাগিল।

তার এত আশার, এত আদরের প্রথম লেখার এই লাঞ্ছনায় তার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু এতো শুধু তার প্রথম লেখা নয়, এ যে তার আশার প্রাসাদের প্রথম ভিত্তি। সে যে সব ছাড়িয়াও সাহিত্যসেবা করিয়া জীবন সার্থক করিবে বলিয়া বড় আশা করিয়াছিল! এবং এ ক্ষেত্রে যে তার শক্তি আছে এবং সফলতা লাভ করিতে পারিবে সে বিষয়ে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। এই লাঞ্ছনায় তাহার সে আশা সে সাহস একেবারে চূরমার হইয়া গেল। তাহার নিজের উপর শ্রদ্ধা এবং নিজের শক্তিতে আস্থা একদম উপিয়া গেল, তাহার মনে হইল যে সে কেবল কতকগুলি ধার করা কথা সৌষ্ঠবশূন্য ভাষায় লিখিতে পারিয়াছে মাত্র, তার বেশী কিছুই সে করে নাই। সে তার নাটকের পাণ্ডুলিপি-খানি আবার আদ্যোপান্ত পড়িল। তার দোষ এবং ত্রুটিগুলি তা'র চক্ষের সম্মুখে জ্বল জ্বল করিতে লাগিল, মোটের উপর তার মনে হইল তার বইখানি কোনই কাজের হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের খুব আধুনিক গল্পগুলি লইয়া সে পড়িল, যতই সে বইগুলির অননুকরণীয় সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে লাগিল, ততই সে নিজের ভিতর নিজে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সে

ভাবিল, একেই বলে প্রতিভা, এমনি শক্তি যাদের আছে তাদেরই কেবল জগৎকে নূতন কথা শুনাইবার স্পর্দ্ধা সাজে। রবীন্দ্রনাথের যুগপ্রবর্ত্তক সাহিত্যের তীব্র আলোকের পাশে তার চেষ্টা ও শক্তি এত মলিন ও তুচ্ছ মনে হইল যে সে তার স্পর্দ্ধায় একেবারে লজ্জায় মরিয়া গেল।

সুরেশ বাবু দমিয়া যান নাই; তাঁর হইয়াছিল ভীষণ রাগ। শুভার নাটক যে উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য এবং সে নাটকের অভিনয় যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল, সে বিষয়ে তাঁহার কোনও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কতকগুলি অজ্ঞ অপদার্থ লোক বইখানার অপূর্ব্ব গৌরব বুঝিতে না পারিয়া যে ইহাকে কেবল চাপিয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছে ইহাতে তাঁহার মনে দারুণ আক্রোশ উপস্থিত হইল। প্রকৃত রসজ্ঞ লোকের কাছে যে এ নাটকের সম্মান হইবে তাহাতে তাঁহার সন্দেহ ছিল না, এবং তাঁর মনে কোনও সংশয়ই ছিল না যে একদিন বাঙ্গালী পাঠক এই অজ্ঞ সমালোচকদের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও শুভার লেখার সমাদর করিতে শিখিবে। তাই তিনি শুভাকে বইখানা ছাপাইতে উপদেশ দিলেন।

শুভা তাহাতে একেবারে নারাজ। সে যে এখন নিজের চক্ষে বইয়ের অসংখ্য দোষ ত্রুটি দেখিতে পাইতেছে। তার নিজের বিবেচনায় যে তার বইয়ের উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত হইবার কোনও দাবীই নাই। রবিবাবুর বইগুলির পাশে দাঁড় করাইয়া সে যে তার চেষ্টার হাস্যকর খর্ব্বতা মর্ম্মে মরিয়া অনুভব করিতেছিল। যাকে সে নিজেই সমাদর করিতে পারে না, তাকে সে লোকসমাজে আদরের জন্য দাঁড় করাইবে কোন্ লজ্জায়? সে কিছুতেই হইবে না। সে তার নিজের ওজন বুঝিয়াছে, তার সাহিত্য সেবার প্রকৃত শক্তি নাই, সে সেজন্য ব্যর্থ

চেষ্টাও করিবে না। লোককে নূতন কোনও বার্ত্তা জানাইবার শক্তি যার নাই, তার পক্ষে সাহিত্যের আসরে নামাটা নিতান্ত ধাষ্টামো। পঞ্চম শ্রেণীর সাহিত্যসেবী বলিয়া নাম ছাপার হরফে বাহির করিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার নাই।

সুরেশ বাবু বলিলেন, "এ যে তোমার বেয়াড়া আবদার শুভা! রবি বাবুর শক্তি না থাকলে কেউ লিখবে না এই সংকল্প করে যদি সবাই বসে' থাকতো, তবে বাঙ্গলা সাহিত্য আজ পাঁদাড়ে পড়ে থাকতো।"

"তা নয়, বাঙ্গলা সাহিত্য তা' হ'লে এর চেয়ে ঢের বেশী উন্নতি লাভ করতো। কতকগুলো ছাপাকরা আবর্জ্জনার বোঝায় যদি বাঙ্গলার সরস্বতীর ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে না হ'ত তবে আজ আমরা সত্যি-কারের একটা সাহিত্য পেতাম।"

"তুমি রবিবাবুর আগের বইগুলো পড়েছ কি? "ভগ্ন-হৃদয়", কি "বউ ঠাকুরাণীর হাট," কি "কড়ি ও কোমল" তাঁর সব লেখাই কি "গীতাঞ্জলি" কি "নৈবেদ্য" কি "ঘরে বাইরের" সঙ্গে তুলনা করা চলে? তিনি যদি সংকল্প করে বসতেন যে আমি শেলী কি ডিকেন্স, কি জর্জ্জ মেরেডিথের মত না লিখতে পারলে লিখবোই না তবে কি আজকার রবীন্দ্রনাথের রচনা আমরা কোনও দিন পেতাম? সেক্সপীয়ারকেই ধর কেন। সেক্সপীয়ারের প্রকৃত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নাটক কয়খানা? অনেক গুলি কি আবর্জ্জনায় বোঝাই নয়? Cymbeline All's well That Ends well, Two Gentlemen of Verona, প্রভৃতি কি হ্যামলেটের লেখক কিম্বা Falstaffএর সৃষ্টিকর্ত্তার যোগ্য?"

কিছুতেই তিনি শুভাকে বুঝাইতে পারিলেন না। শুভার আশার মন্দির ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, উৎসাহ নিঃশেষরূপে ঝরিয়া গিয়াছে, আর সঙ্গে

সঙ্গে তার নিজের উপর একটা দারুণ অশ্রদ্ধা ও দীনতার ভাব আসিয়া তাহার সকল সত্তা জুড়িয়া বসিয়াছে। সে কিছুতেই আর নিজের কোনও স্পর্দ্ধার প্রশ্রয় দিতে সম্মত নয়। তার মন কেবল গাহিত, রজনীকান্তের আকুল ভাষায়—

"আমায় সকল রকমে করেছ খর্ব্ব,
গর্ব্ব করিয়া চুর,
ওগো নির্ম্মম নিষ্ঠুর—"

সুরেশ বাবু মনের দুঃখে একদিন বলিলেন, "শুভা তুমি মিছামিছি একটা অসম্ভব আশা করে নিজকে দুঃখ দিচ্ছ। উচ্চাকাঙ্ক্ষা জিনিসটা ভাল, কিন্তু তাই বলে খুব বড় একটা অসম্ভব আদর্শ মনে এঁকে নিয়ে, তার চেয়ে ছোট কিছুই তুমি করবে না যদি সাব্যস্ত ক'রে থাক তবে তাতে কেবল এই ফল হ'বে যে তোমার কিছুই করা হ'বে না। আমি একটা ছোট ছেলেকে জানি, তাকে কিছুতেই প্রথম ভাগ প'ড়তে বসান যায় না। তার দাদা এম, এ, পড়ে, সেই সব বড় বড় মোটা মোটা বই সে পড়তে চায়। সে বলে, আমি প্রথম ভাগ পড়বো কি, আমি এম, এ, পড়বো। তার সংকল্প যদি সে ঠিক রাখে তবে তার লেখাপড়া শেখাটা কি রকমে হবে বল দেখি।"

শুভার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল ; সে বলিল,—"কি হ'বে আমার তা' আমি বেশ বুঝতে পারছি, সুরেশবাবু ; আমার হাড় ক'খানা যখন আগুনে পুড়ে ছাই হ'বে, তখন আমার বলে মনে করে রাখবার কোনও কিছুই জগতে থাকবে না। এই অদৃষ্ট নিয়েই আমি জন্মেছিলাম !"

"তা' ঠিক বলতে পারি না। কোন্ মানুষের অদৃষ্টে কি আছে, আগে থেকে কেউ ব'লতে পারে না। আমরা নিজেরা নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে ধারণা করি তাও যেমন সব সময় ঠিক হয় না, অন্য লোকের ধারণাও

তেমনি অনেক সময় ভুল হয়। এর কারণ এই যে আমাদের জীবনটা একটা কল নয়, একটা জ্যান্ত জিনিস। এর একটা বৃদ্ধি ও পরিণতি আছে; সেই পরিণতি এর ভিতরকার চেষ্টা এবং বাহিরের আবেষ্টনের নিরন্তর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল। সেই জন্যই জীবনের শেষ ফল যে কি হ'বে তা আগে থেকে স্বয়ং ভগবানও নিশ্চয় করে বলতে পারেন না। সেকস্‌পীয়ার যদি হঠাৎ থিয়েটারে না ঢুকে ড্রেকের সঙ্গে নাবিক হ'য়ে বেরিয়ে পড়তেন তবে তাঁর জীবনটা সম্পূর্ণ অন্য রকমের হ'য়ে যেত। রবিবাবু যখন প্রথম বিলেত যান তখন যদি তিনি ব্যারিষ্টার হ'য়ে ফিরতেন, আর যদি তাঁর রীতিমত পসার জমে যেত, তবে তাঁর কবিতার বই কোথায় থাকতো তা বলা যায় না।"

তিনি শুভাকে বুঝাইলেন, "কার কি শক্তি আছে আগে থেকে তা কেউ জানে না। যে যে আবেষ্টনের মধ্যে পড়েছে, সেখানে তার যে কর্ত্তব্য উপস্থিত থাকে, যথাসাধ্য সে যদি সেই কর্ত্তব্য করে যায় তবেই ক্রমে তা'র ভিতরকার শক্তিটা ফুটে ওঠে, সে তার জীবনের Missionটা ঠিক ধ'রে নিয়ে সার্থকতা লাভ ক'রতে পারে। আমি হ'লাম থিয়েটারের ম্যানেজার, আমার যদি মনে হয় আমার এড্‌মিরাল টোগোর মত হ'বার ক্ষমতা আছে এবং তেমন-একটা কিছু না হ'তে পারলে আমার জীবনই বৃথা, আর তাই মনে করে যদি আমি হাত পা গুটিয়ে বসে থাকি, তাতে লাভ হ'বে কি? থিয়েটারের ম্যানেজার হিসাবে আমার যে শক্তি সামর্থ্য আছে তারও স্ফুরণ হ'বে না, সেদিকে আমার জীবনে যেটুকু সার্থকতা, যে তৃপ্তির আনন্দ লাভ সম্ভব তাও পাব না—এড্‌মিরাল হওয়া তো হবেই না। এই রকম অসম্ভব আশার সৃষ্টি করে আমরা কেবল না হক কতকগুলো দুঃখ টেনে আনি বই তো নয়।"

শুভা হাসিয়া বলিল, "আপনার কথা যদি ঠিক হয় তবে আমার সেই

স্বামীর ঘরে হাত পা গুটিয়ে বসে বাসন মাজা ও রান্না করবার পরাকাষ্ঠা লাভ করাই একান্ত কর্ত্তব্য ছিল।"

সুরেশবাবু বলিলেন, "তা যদি তুমি ক'রতে থাকতে তবে তুমি খুব অন্যায় ক'রছো একথা কেউ ব'লতে পারতো না। আর সে কাজেও যে একটা সার্থকতা আছে তারও যে একটা পরাকাষ্ঠা আছে তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এখন যে করেই হ'ক তুমি একটা অন্য আবেষ্টনের মধ্যে এসে পড়েছ। এখন গত জীবনে কি ক'রলে কি হ'তে পারতো তা নিয়ে জল্পনা কল্পনা মিথ্যে। এখনকার ক্ষেত্রে তোমার যা কাজ তা করে যাও, উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাক, তা' থেকে তোমার কাজে উৎসাহ হ'বে; কিন্তু সেটাকে এমন ভাবে বাড়িয়ে তুলো না, যাতে তোমার বর্ত্তমান কাজের উপর অশ্রদ্ধার সৃষ্টি ক'রে কাজে বাধা দেয়।"

শুভা বলিল, "আমি কি তাই ক'রছি না? দু'দিন একটা অহঙ্কারের নেশায় মেতে আমি ধরাকে সরা জ্ঞান করেছিলাম। এখন নেশা কেটে গেছে, আমি নিজের ওজন বুঝে এখন ঠিক আমার যা' কাজ তাই তো করছি আমি নটিত্বে পূর্ণ পরিণতি লাভ করবো।"

একদিন চাঁপা এ কথায় বলিল, "আমাদের রাধা এখন মানিনী হ'য়েছেন। রাধা চিরদিনই জানেন যে তিনি কৃষ্ণের বুকের ধন। যেদিন দেখলেন যে তিনি ছাড়া তার কালাচাঁদের আরও প্রেয়সী আছে সেদিন তিনি এমনি কেঁদে মানিনী হ'য়েছিলেন। বলেছিলেন, ছাই আমার রূপ? তাই কৃষ্ণ এসে তাকে সাধলেন। আহা সে কি প্রেম গো, ভক্তের কাছে দায়ে পড়ে গিয়ে সাধলেন, পায় ধরে সাধলেন," বলিয়া গাহিল,

"স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।"

"বল্লেন কিনা,

"বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতি ঘোরম্।"

"আমি বলি ওগো রাধে, মান কর, যদি তোর সাধনার জোর থাকে, ভক্তির জোর থাকে তবে ভগবান আজ যে একটু মুখ ফিরিয়েছেন তার শাস্তি পাবেন, আপনি এসে তোর পায় ধরে মান যেচে নেবেন। এমন দিন থাক্‌বে না সুন্দরী! ভক্তের মান যে ভগবানের বুকে কাঁটা হ'য়ে বেঁধে।"

শুভার কথাটা বড় ভাল লাগিল। এই যে মধুর রস, ভক্ত ও ভগবানের প্রেমের সম্বন্ধ এটা তার কাছে বড় মনোরম কল্পনা বলিয়া মনে হইল। আজ চাঁপার মুখে সে দেখিতে পাইল, যে চাঁপা এ রসে মজিয়াছে, মাদার ক্রিশ্চিয়ানার মুখেও একদিন সে এই ভাব দেখিয়াছিল, এমনি কথা শুনিয়াছিল। সে যদি এমনি মজিতে পারিত! সে একটা খুব লম্বা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

শুভা সে প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া চাঁপাকে বলিল, "দেখ্ ভাই সে ইস্কুলটার কি করবি ঠিক করেছিস্। নাকি এটাও অমনি চুপচাপ্ হাসিল করবি।"

"আ মর, আমি ও ইস্কুল ফিস্কুলের কি জানি, আমি মুখ্‌খু সুখ্‌খু মানুষ আমার কি ও কাজ? এটা তুই করবি।"

"আমি কি ছাই ক'রতে জানি কিছু যে করবো। কি করতে হ'বে আমায় বলে দে আমি ক'রছি। সুরেশবাবু যা' বল্লেন তা' আমাদের সাধ্য নয়।"

"তা' কি হয়; অতবড় একটা কাজ কি দু'টো মেয়েমান্‌সে পারে। তবে সুরেশবাবুর মোদ্দা কথাটা এই যে ছেলে মেয়ে গুলো যাতে একটা

কিছু করে উপায় করতে পারে তাই শেখাতে হবে। আমি ভাবছিলাম যে, ধর যদি কয়েকটা মেয়েকে নিয়ে শেলাই শিখিয়ে ত'দের দিয়ে জামা কাপড় ত'য়ের করে বিক্রী করান যায়, তা সে একটা উপায় হয়। আর একটা, তা'দের ভাল ক'রে লেখাপড়া শিখিয়ে থিয়েটারে এক্ট ক'রতে শেখান যায়, এতেও তো সৎ উপায়ে বেশ দু'পয়সা রোজগার হয়। এ দু'টো কাজ আমরা নিজেরাই পারি। সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়াও খানিক শিখবে।"

কথাটা শুভার ভাল লাগিল না। সুরেশ বাবুর উচ্চ আদর্শের কাছে একটা দর্জ্জিখানা আর নাট্য-বিদ্যালয় অত্যন্ত খাটো বলিয়া মনে হইল। কিন্তু সে সুরেশবাবুর কথা স্মরণ করিল, যে অসম্ভব উচ্চ আদর্শ দিয়া গোড়ার ছোটখাট কাজ গুলির পথ আটকাইয়া রাখা কোনও কাজের কথা নয়। সে চাঁপার কথায় রাজী হইল, দু'জনে সেই দিনই চাঁপার বাড়ীতে গেল। সেখানে ডাক্তার জগৎবাবুর সঙ্গে আলাপ ও পরামর্শ হইল। ডাক্তারবাবু এ প্রস্তাবে উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "আরও একটা খুব ভাল ব্যবসা শেখান যেতে পারে, আমি তা'র ভার নিতে রাজী আছি; সেটা হ'চ্ছে নার্সিং। ভাল নার্সদের রোজগার সামান্য নয়, আদরও কম নয়। এ পাড়ার ভিতর কতকদূর লেখাপড়া শিখেছে এমন ঢের মেয়ে আছে, তা'দের দিয়ে নার্সিংক্লাস এখনি খোলা যেতে পারে। আপনারা ছাত্রী জুটীয়ে দিন, বাকী ভার আমার।" সাতদিনের মধ্যে চাঁপার বাড়ীর নীচের তলায় বিদ্যালয় বসিয়া গেল। ছাত্র ও ছাত্রীরা নিজের নিজের বাড়ীতেই থাকিত, কিন্তু ক্রমেই বেশী ছাত্র ও ছাত্রী জুটিতে লাগিল, এবং ক্রমেই তাহারা প্রায় সমস্ত দিনই বিদ্যালয়ে কাটাইতে লাগিল। "শুভার অনেক কাজ জুটিয়া গেল।

[২৫]

শুভা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নগেনকে একখানা চিঠি লিখিল। লিখিয়া সেখানা ছিঁড়িয়া ফেলিল। দু'দিন বাদে আর একখানা লিখিল। সেখানা খামে পুরিয়া রাখিয়াছিল। সাতদিন বাদে সেখানা আবার খুলিয়া পড়িল, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া চিঠি খানা ডাকে দিল।

চিঠিখানার জবাব দিল চপলা। চপলার হাতে গিয়া চিঠিখানা পড়িয়াছিল, সে তাহা স্বামীর নিকট গোপন করিয়া আপনি উত্তর লিখিল।

"তোমার চিঠি পাইয়াছি, আমার স্বামীকে এত বিপদে ফেলিয়াও আশা মেটে নাই, এখন আবার একটা মিথ্যা অপবাদ দিয়া তাকে জড়াইবার চেষ্টা করিতেছ। লোকে বলে, যে হিন্দু মুসলমান হয় সে হয় গরু খাওয়ার যম। তুমি ঘরের বউ বেশ্যা হইয়াছ, তাই লজ্জা সরমের মাথা চিবাইয়া খাইয়াছ। মেয়ে মানুষ এত বেহায়া কেমন করিয়া হইতে পারে ভাবিয়া অবাক্ হই।

আমার স্বামীর জবাব এই যে তোমার ছেলের জন্য কোনও দায়িত্ব তাঁর নিবার কোনও হেতু নাই। তুমি টাকা দিতে চাহিয়াছ—তোমার টাকা তিনি স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করেন না। যদি ছেলের প্রতি তোমার কোনও মমতা থাকে তবে আঁতুড়ে তাহার মুখে খানিকটা নুন ভরিয়া দিও।"

চিঠিখানা পড়িয়া অপমানে, লজ্জায়, ঘৃণায় শুভার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। চারিদিক হইতে সে দুঃখ পাইয়াছে, পদে পদে সে আশায় নিরাশ হইয়াছে, তার উপর এই অপমানটা তার দুঃখের ভরা যেন ভরিয়া দিল। চপলার এই তিরস্কারে তার যেন সর্ব্বাঙ্গে একটা জ্বালা ধরিয়া

উঠিল। এই চপলা, যার জন্য সে তার সর্ব্বস্ব স্বেচ্ছায় ছাড়িয়াছে! সে ইচ্ছা করিলেই তার সর্ব্বনাশ করিতে পারিত; কিন্তু তার প্রতি সে উদারতা দেখাইয়াছে, এই তার প্রতিদান। নগেনকে যে শুভা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছে সে কথা এ পৃথিবীতে কেউ জানে না, চপলা জানিবে কেমন করিয়া? কিন্তু নগেনের দেওয়া বাড়ীখানা যে সে স্বেচ্ছায় দিয়াছে সে কথা তো চপলা না জানিয়া পারে না। তাহার দয়ার দান গ্রহণ করিয়া চপলা আজ তাহাকে এই অপমানটা করিতে সাহস করিল কিরূপে। আর নগেন—তা'র এই কাজ! ভাবিতে শুভার বুক ফাটিয়া গেল।

শুভার দারুণ রাগ হইল। কিন্তু ক্রোধ শেষে দুঃখের বন্যায় ভাসিয়া গেল। সে এমন কি অপরাধ করিয়াছে যে জীবনে কোনও দিন দুঃখ বই সুখের মুখ দেখিবে না, যাতে সে নিরন্তর এমনি দুঃখ জ্বালা ও অপমানে দিন কাটাইবে? তার চোখ ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল, সমস্ত হৃদয় বেদনার বন্যায় ভাসিয়া গেল।

সুরেশ বাবু যখন আসিয়া পৌঁছিলেন তখন শুভা কাঁদিতেছে। সে তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া আসিয়া সুরেশবাবুর কাছে বসিল। সুরেশবাবু তাকে একখানা পাঁচশত টাকার চেক ও এক খানা বই দিলেন। শুভা অবাক হইয়া দেখিল যে বই খানা তাহারই নাটক। তার নিষেধ স্বত্বেও সুরেশবাবু নিজে বই খানা ছাপাইয়া বিক্রী করিয়াছেন। প্রথম সংস্করণে অল্পই ছাপাইয়াছিলেন, দুই মাসেই বই একদম নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ৫০০৲ টাকা লাভ হইয়াছে। সংবাদপত্রে বইয়ের দুর্নীতি-ঘটিত যে নিন্দা প্রচার হইয়াছিল তাহাতেই বিক্রয়ের সুবিধা হইয়াছিল।

শুভা একটু হাসিল। চেকখানা সে যত্ন করিয়া উঠাইয়া রাখিল। সুরেশবাবু তখন শুভাকে ভাল করিয়া বইখানা সংস্কার করিয়া দ্বিতীয়

সংস্করণ ছাপাইবার আয়োজন করিতে বলিলেন। শুভা সম্মত হইল।

সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্রে শুভার বই খানার নানারকম সমালোচনা হইল। দুই একজন মোটের উপর সুখ্যাতি করিলেন, কিন্তু বেশীর ভাগ সমালোচনাই বিরুদ্ধ। অনেকে প্রচলিত সমাজ ও নীতিবিরুদ্ধতার তীব্র সমালোচনা করিলেন। কেহ কেহ তাহার ভাষার ত্রুটি কেহ বা আর্টের অভাব লক্ষ্য করিয়া দু'চার কথা বলিলেন। একজন সুধু লিখিলেন, "সস্তা ছাপাখানার দৌলতে অনেক বই বাহির হইতেছে, কিন্তু এমনটি আর দেখিয়াছি মনে হয় না। লেখিকার হস্তকণ্ডুতির নিবৃত্তি হইয়াছে, এখন আমরা বলি শান্তিরস্তু। ইহার সমালোচনা করিয়া ইহার অযথা সম্মান করিব না।" দুই একজন বেশ স্পষ্ট ভাবেই বলিলেন, যে, বেশ্যার কাছে এর চেয়ে ভাল জিনিস প্রত্যাশা করাই বৃথা। একজন লিখিলেন, "এতদিন সমাজ গণিকাকে কোণঠেসা করিয়া রাখিয়াছে। লেখিকার এই রচনাকে গণিকা সমাজের বিদ্রোহের অভিযান বলিলেই চলে। তিতুমীর ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া অমর হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী শুভসঙ্গিনীর এই অভিযান তিতুমীরের যুদ্ধের পাশে বসাইবার যোগ্য বলিয়া গণিত হইবে সন্দেহ নাই।"

সমালোচনা দেখিয়া শুভা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। এরা কি মূর্খ না অন্ধ, না ইচ্ছা করিয়াই এরা মিথ্যা বলে তাই ভাবিয়া সে অবাক হইল। তার নাটকে সে নীতিবিরুদ্ধ কোনও কথাই বলে নাই, কেবল সে নারীত্বের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছে। ভাদ্রা স্বামীর অত্যাচার ও অবহেলা মাথা পাতিয়া লয় নাই, জোর করিয়া তাহার কাছে সম্মান ও সমাদর আদায় করিয়াছে, তাহাকে বিধিমতে লাঞ্ছিত করিতেও ত্রুটী করে নাই। তার মুখ দিয়া শুভা বলাইয়াছে

"স্বামী প্রভু এ কথা সেকেলে কথা। স্ত্রী স্বামীর সহধর্ম্মিণী সহচারিণী। যতদিন স্বামী তাহাকে সহচারিণী সহধর্ম্মিণীর যোগ্য সম্মান ও অধিকার দিতে পারেন ততদিনই স্ত্রীর তাঁর প্রতি কর্ত্তব্য! যদি স্বামী সে কর্ত্তব্যের অবহেলা করিতে পারেন তবে তখন স্ত্রীরও কর্ত্তব্যের শেষ।" এই সামান্য সত্য কথাটা যদি কোনও পুরুষ বা কুলনারী লিখিতেন তবে সমালোচকেরা নীরব থাকিতেন, কিন্তু শুভা নাকি তাঁদের চক্ষে বারাঙ্গনা, তাই তারা মনের খুসীতে যা নয় তা লিখিয়া গিয়াছেন। সে খুব চটিয়া এই সব সমালোচনার এক তীব্র প্রতিবাদ লিখিয়া কাগজে পাঠাইল। সম্পাদক সে প্রতিবাদ ছাপাইতে সাহস করিলেন না। তখন শুভা বার্ণার্ড শ'র দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া তার দ্বিতীয় সংস্করণের প্রারম্ভে খুব ঝাঁঝাল একটা মুখবন্ধ জুড়িয়া দিল।

ক্রমে শুভার শরীর ভয়ানক ভাঙ্গিয়া পড়িল। দশবার দিনের মধ্যে সে একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িল। জগৎ ডাক্তার প্রথম প্রথম বড় একটা গা' লাগাইলেন না, কিন্তু শেষে তিনি চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। একদিন তিনি বড় ডাক্তার ডাকিতে বলিলেন। স্ত্রীরোগের বিশেষজ্ঞ একজন মস্ত বড় চিকিৎসক আসিয়া দেখিলেন। তিনি কয়দিন দেখিয়া বলিলেন, শুভার গর্ভ মিথ্যা (false pregnancy) জরায়ুর গুরুতর পীড়া হইয়াছে। তখন সম্পূর্ণ নূতন রকম চিকিৎসা আরম্ভ হইল। প্রায় একমাস চিকিৎসা ও শুশ্রূষার পর শুভা আরোগ্য লাভ করিল, ডাক্তার বায়ু পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা দিলেন।

[২৫]

ব্যাধিত শুভার বেদনা-কাতর চিত্তকে আরও ভয়ানক দুর্ব্বল করিয়া দিয়াছিল। সে ঠিক করিল যে তার মৃত্যু নিকট। সে চিন্তায় সে বিশেষ

কষ্ট বোধ করিল না। এমন নিরর্থক জীবন থাকিলেই বা কি, না থাকিলেই বা কি? কিন্তু কতকগুলি নূতন কাজের কল্পনা সে করিয়াছিল, সে গুলি অনারব্ধ বা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল, সেজন্য মাঝে মাঝে তার কষ্ট হইয়া তাহার দুর্ব্বল চিত্ত আরও পীড়িত হইত।

সে দার্জ্জিলিঙ্গে একখানা ছোট বাড়ী লইল। তার সঙ্গে গেল কেবল চাঁপার হাঁসপাতালের একটি শুশ্রূষাকারিণী। দার্জ্জিলিঙ্গে আসিয়া সে একটি পাহাড়িণী বালিকাকে নিযুক্ত করিল। বালিকার বয়স হইবে বছর ষোল' কিন্তু এই বয়সের বাঙ্গালীর মেয়ের তুলনায় তাহাকে অনেক ছোট দেখায়। পাহাড়িণীর নাম কাঞ্চী। 'কাঞ্চী' ঠিক নাম বলা যায় না। পাহাড়ীদের মধ্যে অনেকের সন্তানের নামই হয় না, তার বড়কে ডাকে জেঠা বা জেঠী, মেঝোকে ময়লা বা ময়লী তার পর এইরূপে ক্রমে কয়লী ছয়লী প্রভৃতি বলিয়া থাকে; কাঞ্চী এই পর্য্যায়ে কনিষ্ঠা কন্যার নাম, এবং কাঞ্চা কনিষ্ঠ পুত্রের নাম।

দার্জ্জিলিঙ্গে আসিয়া শুভা এক নূতন রাজ্য দেখিল। যাহা দেখিল তাহা সে তার খুব উদ্দাম কল্পনায়ও কখন আয়ত্ত করিতে পারে নাই। পাহাড়ের কথা সে অনেক শুনিয়াছে অনেক পড়িয়াছে, মনে মনে তার একটা ছবিও কল্পনা করিয়া লইয়াছে। জলপাইগুড়ি হইতে দূরে হিমালয়ের ছায়ামাত্র দেখিয়া সে সেই ছবিটাকে আরও পরিষ্কার করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু সে এখন যাহা দেখিল তাহাতে সে বুঝিল এতদিন সে কিছুই বোঝে নাই। হিমালয়ের সে অপূর্ব্ব গৌরব দেখিয়া সে শুধু অপলকনেত্রে চাহিয়া রহিল, চাহিয়া আশ মিটিল না। কি সুন্দর, কি ভীষণ, কি মহান্, কি অপরিমেয় সেই তরঙ্গায়িত অন্তহীন শৈললহরী। দিগন্তের সঙ্গে প্রান্তে প্রান্তে সম্মিলিত সেই তুঙ্গ শৃঙ্গমালা—সে কি শুধু প্রাণহীন প্রস্তর? শুভা যেন শিখরে শিখরে জীবন্ত-প্রাণের আভাস পাইল,

এ যেন এক তপস্যাস্তব্ধ মহাযোগী—কোন এক মহাপ্রাণের সঙ্গে আলাপে তন্ময়, কোন এক বিরাট পুরুষের সাক্ষাতে প্রণত, স্তব্ধ। শুভা পাহাড় দেখিতে পাইল না, গাছ পাতা তার চোখে লাগিল না, পথে পথে সারা পাহাড়-জোড়া চা-বাগানের থাক-কাটা গাছের সারি দেখিতে পাইল না, তাহার চক্ষু জুড়িয়া রহিল কেবল এই বিরাট প্রাণ, যার স্পন্দন সে প্রতি মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতেছিল।

আর একটা জিনিস ঠিক তেমনি ভাবে তাহাকে অভিভূত করিল—সে এই দেশের লোক—ভুটিয়া, লেপচা পাহাড়ী। প্রথম তাহাদের নোঙ্‌রা অধৌত মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার একটু ঘৃণাবোধ হইয়াছিল। কিন্তু যতই সে তাহাদের দেখিতে ও জানিতে লাগিল ততই তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধায় তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। এই জাতিটা একেবারে আকণ্ঠ প্রাণ-শক্তিতে পূর্ণ। ছোট শিশু হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেরই চোখে মুখে যেন চঞ্চল জীবন ফাটিয়া বাহির হইতেছে। পাহাড়ের চড়াইয়ের কঠিন পথে প্রকাণ্ড বোঝা পিঠে করিয়া উঠাইতে উঠাইতে ইহারা হাসি তামাসা করে, গান করে, উল বোনে ছেলে কোলে করিয়া হাসি খেলা করে। ইহাদের কিছুতে ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই।

শুভাকে সব চেয়ে বেশী মুগ্ধ করিল পাহাড়ী নারী;—ইহাদের বলিষ্ঠ শরীর মন, ইহাদের সুগঠিত শরীরের দৃঢ় সৌষ্ঠব, ইহাদের কর্ম্মতৎপরতা, সদা-প্রফুল্লতা, রহস্য প্রিয়তা ও প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ সে যতই লক্ষ্য করিল ততই তাহার ইহাদের উপর শ্রদ্ধা হইল। এখানে নারী, নারী নয়, সকল বিষয়ে সে পুরুষের সম্পূর্ণ সমকক্ষ এবং প্রায় সমকক্ষ ভাবেই পুরুষ তাহাকে দেখিয়া থাকে। আর তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন—তাহাদের স্বাধীনতার প্রায় কোনই বাধা নাই। অথচ ইহারা সত্যবাদী, অলোভী এবং নানা সদ্‌গুণে মণ্ডিত। বাঙ্গালী হিন্দুর আদর্শে ইহাদের মধ্যে খুব কম

মেয়েই সতী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে পারে। ইহাদের বিবাহ সম্বন্ধ অতি সহজে ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া কি মনুষ্যত্ব হিসাবে ইহারা বাঙ্গালী মেয়েদের চেয়ে হীন? ইহাদিগকে দেখিয়া শুনিয়া শুভার মনে হইল যে আমাদের স্পর্দ্ধিত সভ্যতা, আমাদের কাপড়-চোপড় আসবাবের আতিশয্য, আমাদের লোকাচার কুলাচারের আধিপত্য, এ সকলে আমাদের ভিতরকার স্বাভাবিক মানবত্বটাকে খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছে। ইহাদের ভিতর সেই সমাজকৃত অষ্টবন্ধনের অভাবে সেই জীবন্ত মনুষ্যত্বটা একদম তাজা রহিয়াছে। তার মনে হইল অতি সভ্য বাঙ্গালীর ঘরে জন্মিয়া সে যেন প্রকৃত মনুষ্যত্বের আস্বাদে অনেকটা বঞ্চিত হইয়াছে।

ইহাতে তাহার চিন্তাস্রোত নূতন ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে এতদিন কেবল সমাজে নারীর স্থান প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চিন্তিত ছিল। এখন তার দৃষ্টির ক্ষেত্র প্রসারিত হইল—সে দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইল যে এই যে বিরাট সভ্যতার মন্দির এটা মনুষ্যত্বের কঙ্কালের উপর প্রতিষ্ঠিত। সভ্যতার ভিতর যে সুন্দর জিনিস আছে তাহা সে এখনও অস্বীকার করিতে পারিল না, কিন্তু তাহার মনে হইল যে সমস্ত সভ্যতা, সকল সমাজবন্ধনের গোড়ায় একটা প্রকাণ্ড গলদ রহিয়াছে, সেই গলদে ইহার অলঙ্কারে চাপা পড়িয়া খাঁটি মনুষ্যত্বটা মারা যাইবার মত হইয়াছে। শুভা হিংসার চক্ষে এই পাহাড়ীদের দেখিত, আর প্রতি পদে পদে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করিত।

কাঞ্চীর পরিবারের সঙ্গে শুভা খুব ভাব করিয়া ফেলিল। শুভার বাড়ী চান্দমারীর বাঙ্গালী পল্লীর খানিকটা তফাতে অপেক্ষাকৃত নিভৃত স্থানে। তাহার নীচেই একটা ছোটখাটো পাহাড়ী বস্তী, তার একটা ঘরে কাঞ্চীদের বাড়ী। কাঞ্চীর বাপ রেলে কাজ করে, সে প্রায় বাড়ী থাকে না। গৃহ রক্ষা করে তার মা। কাঞ্চীরা চার বোন, দুই ভাই। জেঠী

অর্থাৎ বড় বোন, বাড়ীতেই থাকে, তার বয়স হইবে বছর ২৫।২৬, মায়ের সঙ্গে সে চাষবাস করিয়া কিছু তরকারী জন্মায় আর হাটে গিয়া বিক্রয় করে। বয়সে যুবতী হইলেও জেঠীর যৌবন-সুলভ সৌষ্ঠব কিছু ছিল না। সে মোটাসোটা শক্ত সমর্থ কর্ম্মঠ প্রাণী, স্ত্রীজাতি যে সব গুণে পুরুষের মনোহরণ করে সে গুণ ইহার বড় ছিল না। ইহার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে বনিবনাও না হওয়ায়, স্বামী রাগ করিয়া ফৌজে ঢুকিয়া সুদূর পেশাবরে চলিয়া গিয়াছে, খরচ পত্র কিছু পাঠায় না। জেঠী আর বিবাহ করে নাই। মৈলী অর্থাৎ দ্বিতীয় কন্যা খরসাঙ্গে স্বামীর সঙ্গে বাস করে। শুভা তার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছে, কিন্তু তবু কাঞ্চী বা তার মা খোলসা করিয়া তার কথা বলিতে চাহে না। শুভা শুনিয়াছে মৈলী খুব সুন্দরী এবং সে বড় লোক, তার অনেক টাকাকড়ি এবং শুভার মত তার ঘরবাড়ী। তার বয়স প্রায় শুভারই মতন হইবে। জেঠী ও মৈলীর মধ্যবর্ত্তী জেঠা অর্থাৎ বড় ছেলে দার্জ্জিলিঙ্গ স্কুলে অনেক দূর পড়িয়াছে, সে এখন রেলে কেরাণীগিরী করে। কাঞ্চার পড়াশুনা বিশেষ হইল না, সে একটা হোটেলে Boy এর কাজ করে। মৈলী ও কাঞ্চী প্রায়ই বাবুদের বাড়ি চাকরী করে।

শুভা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিল যে কাঞ্চী অতি সুন্দর বাঙ্গলা বলে —সে কথার মধ্যে কোনও বাঁকা ভাব নাই, আড়াল হইতে শুনিলে সহসা কেউ বাঙ্গালী ছাড়া অপর কোনও জাতির লোকের কথা বলিয়া সন্দেহ করিবে না। জেঠী, ছৈলী ও তার মাও বেশ বাঙ্গলা বলে, কিন্তু কাঞ্চীর মত নয়। তা' ছাড়া কাঞ্চী ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুন্দরী। চাঁদমারীর স্থায়ী বাঙ্গালী পল্লীর কাছে থাকিয়া এবং তাহাদের বাড়ীতে কাজকর্ম্ম করিয়া বাঙ্গালা বলিতে জানা এমন কিছু আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু শুভা প্রথমে কাঞ্চীর মুখের বাঙ্গলা কথা শুনিয়া যেমন অবাক্ হইয়া গিয়াছিল, তেমনি

বেশ স্বস্তি বোধ করিয়াছিল। সে কাঞ্চীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে সে বাঙ্গালী বাড়ীতেই বাবুদের ছেলে-পিলের মধ্যে মানুষ হইয়াছে বলিয়া তার বাঙ্গালা এমন পরিষ্কার। তা'ছাড়া সে তো এতদিন তার মৈলী-দিদির কাছে ছিল, তার বাড়ীতে সব বাঙ্গলা কায়দা।

এই মৈলীদিদির কথা শুভা রোজ শুনিত, শুনিয়া শুনিয়া তার ইহাকে দেখিবার এবং ইহার সম্বন্ধে আরও কথা জানিবার আগ্রহ হইত। কিন্তু কাঞ্চীদের পরিবার এ সম্বন্ধে তাকে বড় বেশী কথা বলে না।

একদিন শুভা দুপুর বেলায় আহারান্তে কাঞ্চীদের বাড়ীতে গেল। জেঠী তখন বাগানে কোদাল মারিতেছে এবং তার মা উঠানে বসিয়া একটা কম্ফর্টার বুনিতেছে। কাঞ্চীর মা শুভাকে সেলাম করিয়া একখানা চেয়ারে বসাইল। কাঞ্চীদের বাড়ী সাধারণ পাহাড়ী-দের বাড়ীর চেয়ে অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ। বাড়ীখানা অপেক্ষাকৃত বড়, তাহার দেওয়ালে লালমাটীর পরিচ্ছন্ন প্রলেপের উপর নানা রকম ফুল পাতা আঁকা। বাড়ীর মেঝে এবং সম্মুখের উঠানটুকু খুব তকতকে পরিষ্কার এবং সামান্য যা কিছু আসবাব আছে তাহা বেশ পরিচ্ছন্ন। কাঁসা পিতলের বাসনপত্রগুলি ঝক্ ঝক্ করিতেছে। দেয়ালে দু'চার খানা ছবি আছে। একখানা টেবিল, দু'খানা চেয়ার এবং খানকয়েক মোড়া আছে, সেগুলি নোংরা নয়। টেবিলের উপর ক্রুশীর বোনা একটা ঢাকনা এবং চেয়ারের উপর খড়ের তৈয়ারী জাপানী গদি (cushion) আছে। দেয়ালে টাঙ্গান ছবিগুলির মধ্যে শুভা দেখিল একখানা ফটোগ্রাফ, সেখানা সে আগ্রহ করিয়া দেখিল।

ফটোখানি দেখিয়া বোধ হইল একটী বাঙ্গালী পরিবারের। ইংরাজী পোষাক পরা এক সুন্দর বাঙ্গালী ভদ্রলোক, শাড়ী পরা তার স্ত্রী ও দুইটি

ফ্রক পরা শিশু এই ফটোতে আছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কার ফটো ?"

কাঞ্চী বলিল, "মৈলী দিদির।"

শুভা অবাক্ হইয়া দেখিল। এখন তা'র মনে হইল যে ঐ সুসজ্জিত বাঙ্গালী-রমণীর সুন্দর মুখের ভিতরে যেন একটু পাহাড়ী ছাপ আছে, যেন চোখ দু'টী একটু পাহাড়ী ঢংএর। সে বিস্মিত হইয়া ফটোখানা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। শুভা জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ কাঞ্চী। তোমার মৈলী দিদি এখানে আসে না ?"

কাঞ্চী বলিল, "তা'র সংসার ফেলে সে আসতে পারে না, আর তা'ছাড়া এসেই বা এখানে থাকবে কোথায় ? একবার ছ'মাস আগে এসেছিল, যখন তা'র বাবু মরে গেল, তা'র পর আবার চলে গেছে।"

শুভা বলিল, "ওঃ মৈলী তবে বিধবা।"

কাঞ্চী জবাব দিল, "না।"

এমন সময় চার পাঁচ বছরের একটি সাহেবের ছেলের মত সুসজ্জিত সুন্দর শিশু আসিয়া উঠানের উপর দাঁড়াইল। কাঞ্চী দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে কোলে লইয়া বলিল, "কিরে খোকা, তুই কোথেকে ? তোর মা কই ?"

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই একটি সুন্দরী পাহাড়ী যুবতী আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল। শুভা দেখিল, যুবতী অসামান্য রূপসী, তার মনে হইল বুঝি বা তার নিজের চেয়েও সুন্দরী। তার পরিধানে খুব দামী সিল্কের শাড়ী, পাহাড়ী কায়দায় ঘাঘরা করিয়া পরা, অঙ্গে একখানা অত্যন্ত হাল ফ্যাসানের মকমলের উপর জরির কাজ করা ব্লাউজ এবং জাপানী, নানা কারুকার্য্যময় সিল্কের ওড়না বুকে জড়ান। মাথায় একখানা দামী

শাল। তার পর দামী একজোড়া লেডিস্ সু এবং রেশমী openwork মোজা। গহনাও অনেক। সুন্দরীর রঙ্ ধব্‌ধবে ফরসা এবং বেশ পরিচ্ছন্ন ও মাজা। তাহার সর্ব্বাঙ্গ খুব ভাল এসেন্সের গন্ধে ভুরভুর করিতেছে।

দুই সুন্দরী পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল। কাঞ্চী তাড়াতাড়ি আগন্তুকে পাহাড়ী ভাষায় শুভার পরিচয় দিয়া শুভাকে বলিল, "এই আমার মৈলী দিদি।"

মায় মেয়েতে, বহিনে বহিনে, যতক্ষণ প্রীতিসম্ভাষণ হইল, ততক্ষণ শুভা কেবল এই সুন্দরীর দিকে চাহিয়া রহিল। মৈলী মাকে বলিল, "বাবু এক মাসের জন্য কলিকাতায় গিয়াছেন, সে এই ফাঁকে একবার তাহাদের দেখিতে আসিয়াছে। বাচ্ছাটাও তার কাঞ্চী মাসীকে দেখিবার জন্য অস্থির, তাই তাকে লইয়া আসিয়াছে।"

শুভার এই মেয়েটাকে দেখিয়াই ভালবাসিতে ইচ্ছা হইল। এমন সুন্দর মানুষকে কি ভাল না বাসিয়া থাকা যায়। তাহাতে আবার এ এমন মধুরভাষিণী এমন সুকণ্ঠ! তাহার কথাগুলি যেন শুভার কাণে অমৃত বর্ষণ করিল। খানিক বাদে শুভা ছেলেটাকে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল "এস সাহেব, what's your name?"

বালক অনায়াসে বুঝিয়া বলিল, "সুবোধচন্দ্র মুখার্জ্জী।"

কেহ কিছু না বলিলেও এখন শুভা স্পষ্ট বুঝিল যে মৈলী একজন বাঙ্গালী বাবুর রক্ষিতা।

মৈলী ও তার ছেলেটীর পোষাক পরিচ্ছদ হাবভাব দেখিয়া সে বুঝিল হে বাবুটি নিশ্চয়ই বেশ অবস্থাপন্ন। সে অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিল এই আশ্চর্য্য পরিবারের কথা!

মৈলীর মা এবং বড় বোন খুব কড়া নীতিশাস্ত্রের হিসাবেও সতী

বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। তারা যে ছোটলোক তাহাও নহে। জাতে তারা ব্রাহ্মণ না হইলেও পারিয়া নহে। তা'ছাড়া যদিও কাঞ্চী, ছৈলী ও কাঞ্চা দাসত্ব করে, তবু জেঠা লেখাপড়া শিখিয়া ভদ্রবৃত্তি করিতেছে। তাহাদের পিতাও নিতান্ত সামান্য কাজ করে না। এমন একটা পরিবার কিন্তু মৈলীর মত কুলত্যাগিনী অসতীকে নির্ব্বিবাদে স্নেহ-সম্ভাষণ করে, আর তাহাকে কোনও অংশে নিন্দনীয় মনে করে না তা' ছাড়া, ইহাও একটা দেখিবার বিষয় যে এই এক পরিবারের মধ্যেই কেরাণী এবং ভৃত্য উভয়েই এক সঙ্গে সমানে বাস করিতেছে। পাহাড়ী-দের মধ্যে জাতি ভেদ আছে বটে—কিন্তু ভদ্র ও ছোট লোকের মধ্যে কোনও অলঙ্ঘ্য প্রভেদ নাই।

সে অল্প সময়ের মধ্যেই এই সব কথা আর এই জাতীয় কথা ভাবিয়া লইল। ততক্ষণ মৈলী মা ও বহিনদের ঠাণ্ডা করিয়া শুভার সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই দু'জনে বেশ হৃদ্যতা হইল। শুভা যখন বিদায় লইল তখন মৈলীকে বৈকালে তার বাড়ীতে যাইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিয়া গেল। সুবোধকেও লইয়া যাইতে বলিল।

মৈলী পনেরোদিন মাত্র পিত্রালয়ে ছিল। ইহার মধ্যে অধিক সময় সে শুভার সঙ্গে কাটাইয়াছিল। শুভাকে লইয়া সে সকল স্থানে বেড়াইতে যাইত, শুভার সঙ্গে সর্ব্বদাই তার বাড়ীতে থাকিত, শেষে এক দিন শুভার কাছেই সে রাত্রে শুইয়াছিল। সে শুভাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল, শুভাও তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল। শুভা দেখিল, মৈলী যেমন একদিকে পাহাড়িনীদের মত সুস্থ সবল কর্ম্মঠ ও আত্মনির্ভরশীল, অপর দিকে সে ইংরাজ রমণীর মত সুশিক্ষিতা, সামাজিক ও বুদ্ধিমতী ও তাহার ব্যবহার বাঙ্গালী রমণীর মত মোলায়েম। তাহার ভিতর আধুনিক

সভ্যতা পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, কিন্তু সে তাহার পাহাড়ীর প্রাণটা হারায় তাই।

মৈলী তাহার সমস্ত ইতিহাস অকপটে শুভার কাছে বলিয়া গেল। তার বাবা যখন গুর্খা ফৌজে কাজ করিত, তখন তার মা এক বাঙ্গালী পরিবারে কাজ করিত। তখন তাদের অন্ন-বস্ত্রের এতটা স্বচ্ছলতা ছিল না। সেই বাঙ্গালী ভদ্রলোকের স্ত্রী মৈলীকে বড় ভাল বাসিতেন, এবং তাঁরা যখন এখান হইতে চলিয়া যান তখন তাঁহারা মৈলীকে ৩০০্ টাকা দিয়া কিনিয়া লইয়া যান। মৈলীকে তাঁহার আপনার মেয়ের মত যত্ন করিতেন এবং বেশ ভাল রকম শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহাদের খর-সাঙ্গের পথে-একটা চা বাগান ছিল, সেখানেই তাঁ'রা বেশীর ভাগ সময় থাকিতেন, মৈলী তাহাদের সঙ্গেই থাকিত। একবার সেই বাবু কলিকাতায় যান, সেখানে গিয়া তিনি হঠাৎ প্লেগ হইয়া মারা যান। খবর পাইয়া গৃহিণীও চলিয়া যান. মৈলী একলা সেই বাগানে রহিল। কিছু দিন পরে বাবুর ছেলে মুখার্জ্জী সাহেব চা বাগানের কাজ বুঝিয়া নিতে আসেন, মেয়েরা কেউ আসে না। সাহেব ছিলেন বিলাত ফেরত, অল্প-বয়স্ক। তিনি মৈলীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং তাহাকে লইয়াই সংসার পাতিয়া চা বাগানে বাস করিতে লাগিলেন। পাঁচ বৎসর তারা পরম সুখে বাস করিল। তাদের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে হইয়াছিল। মেয়েটি হঠাৎ বসন্ত হইয়া মারা যায়। সেই ছোঁয়াচে সাহেবেরও বসন্ত হইয়া তিনি মারা যান। সে আজ প্রায় তিন বছরের কথা। তার পর সাহেবের ওয়ারিশেরা চা বাগান একটা কোম্পানীর কাছে বেচিয়া ফেলে। সেই কোম্পানী হইতে একটি বাবু এই বাগানে ম্যানেজারী করিতে আসিয়াছেন। যখন এই বাবুটি আসেন তখন মৈলী সে বাগানের কুঠীতেই ছিল, কেহ তাহাকে উঠায় নাই। বাবুও তাহাকে উঠাই-

লেন না, সে আগের মতই ঘরণী গৃহিণী হইয়া আছে। বাবুও তা'কে খুব আদর যত্ন করেন। "সবই আমার সেই আছে, দিদি, বরং সাহেব আমাকে অনেক টাকা কড়ি দিয়ে গিয়েছেন—কিন্তু যখন আমার সেই সাহেবের কথা মনে হয়, তখন মনে হয় যেন আমার কিছুই নাই।"

এই মৈলীতে শুভা ভাবিবার অনেক কথা পাইল। যে সব সমস্যা তা'র মনকে এতদিন আন্দোলিত করিয়াছে সে সবগুলি এখন এই নারীকে কেন্দ্র করিয়া তাহার সমস্ত চিত্ত সমস্ত ধ্যানধারণা একেবারে ওলট পালট করিয়া দিল। মাদার ক্রিশ্চিয়ানার ধর্ম্মাধর্ম্মের মানদণ্ডে এই মৈলীর স্থান কোথায়? আর এই যে সমস্ত পাহাড়ী সমাজ যাহারা এই স্বৈর-চারিতাকে একটা অনিন্দ্যনীয় ব্যাপার বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে, ইহারই বা স্থান কোথায়? এই মৈলীর চরিত্রের ভিতর কোথাও কোনও খুঁত নাই। সকল বিষয়ে সে সভ্য সমাজের সাধারণ মহিলাদের মধ্যে উচ্চা-সন পাইবার যোগ্য, অথচ, যেটাকে তাহারা পাপ বলিয়া জ্ঞান করে না সেই পাপ আচরণের জন্য মৈলী ও তাহার সমাজ কি চিরদিন নরকে পচিবে? ঈশ্বরের ন্যায়বিচারে ইহা কখনই হইতে পারে না। শুভার মনে হইল চাঁপার কথাই ঠিক—পাপ পুণ্য মনের কাছে। যেখানে ভালবাসা নাই, সেখানে পুরুষ ও স্ত্রীর সম্বন্ধ মাত্রই পাপ। আর ভালবাসা যদি সত্য হয়, তবে কি কেহ কখনও তাহার প্রেমাস্পদকে ছাড়িয়া অন্যের কাছে শরীর মন সমর্পণ করিতে পারে। অথচ এই মৈলী, ইহার কথা শুনিলে মনে হয় যে এ-ইহার দ্বিতীয় ভর্ত্তাকে খুব ভাল বাসে, প্রথমটাকে যে ভালবাসিত, তাহার তো কোনও সন্দেহ নাই। ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হয় তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। তাহার ইচ্ছা হইল যে মৈলীর জীবনটাকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া সে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিবে। তাই যখন মৈলী যাইবার সময় তাহাকে আদর করিয়া তা'র

চা বাগানে যাইবার নিমন্ত্রণ করিয়া গেল, তখন সে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল।

মৈলী চলিয়া গেলে সপ্তাহ খানেক পর শুভা স্থির করিল আর দার্জ্জিলিঙ্গে থাকিবার তাহার আবশ্যক নাই। সে মনে করিল, পথে মৈলীর চা বাগানে দিন দশ পনেরো থাকিয়া সে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবে। তা'র টাকা পয়সা ফুরাইয়া আসিল, এখন আবার রোজগার না করিলে চলে না।

কাঞ্চীকে লইয়া শুভা মৈলীর চা বাগানে গেল। মৈলী তাহাকে লইবার জন্য ষ্টেশনে আসিয়াছিল। তখন সে পাহাড়িণী বেশে সজ্জিত নয়। খুব হালী বাঙ্গালী মহিলার বেশে আসিয়া যখন সে শুভাকে আলিঙ্গন করিল শুভা তখন প্রথমে তাহাকে চিনিতেই পারিল না। পাহাড়িণী বেশে শুভা ইহাকে সুন্দরী দেখিয়াছিল, বাঙ্গালিনী বেশেও সে পরমাসুন্দরী—কিন্তু দুইটি রূপে তফাৎ ছিল অনেক। পাহাড়িণীর যতটা রঙ্গের বাহার ছিল, বাঙ্গালী বেশে তাহা নাই। খুব ফিকে বেগুনী রঙ্গের সিল্কের শাড়ী ও জামা তার গোলাপী রঙ্গের সঙ্গে মিশিয়া একটা নূতন রকমের মৃদু সৌষ্ঠব সৃষ্টি করিয়াছিল। এ রূপ তাহার শান্ত, পাহাড়িণী রূপের মত তীব্র নয়। পাহাড়িণী বেশে যেন তার সর্ব্বাঙ্গে জীবন উছলিয়া উঠিতেছিল, এ বেশে যেন সে জীবন একটা ভব্যতার স্নিগ্ধ আবরণের অনেকটা চাপা পড়িয়াছে।

[২৭]

চায়ের বাগান শুভার আরও দেখা ছিল। মৈলীর বাগানে সে নূতন কিছু দেখিতে পাইল না। কিন্তু মৈলী যখন তাহাকে লইয়া কারখানার যন্ত্রপাতি সকলের ক্রিয়া তাহাকে বুঝাইতে লাগিল এবং

কারিগরদিগকে হুকুম দিয়া কাজ করাইতে লাগিল, তখন সে সত্য সত্যই অবাক্ হইল। মৈলী শুধু যে বাবুর ঘরণী হইয়া রহিয়াছে, তাহা নহে, সে প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার সহধর্ম্মিণী। সে সমস্ত কলগুলি আবশ্যক হইলে নিজে চালাইতে পারে, এমন শক্তি ও জ্ঞান সে সঞ্চয় করিয়াছে এবং তার কর্ম্মপটুতা তাহার গৃহ ছাড়িয়া ভর্ত্তার ব্যবসায়-ক্ষেত্র পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। এখন বাবু না থাকিলে, সে নিজেই কারখানা চালাইতে পারে, কুলী মজুর খাটাইতে পারে, খাজাঞ্চীর হিসাব দেখিতে পারে, কেরাণী বাবুদের কাজ বুঝিয়া লইতে পারে, এবং সমস্ত চা বাগান ঘুরিয়া সকল কাজের তদ্বির করিতে পারে। ম্যানেজার বাবু থাকিতেও সে এ সব কাজে তাঁহাকে অনেক সাহায্য করে, সে কথা সে বলিল। তার পর হাসিয়া বলিল, "সাহায্য করা কি ভাই আমিই তো এক রকম তা'কে কাজ শিখিয়ে নিয়েছি। বাবু যখন এখানে এলেন, তখন তিনি এ কাজে প্রায় সম্পূর্ণ আনাড়ি। কয়েকমাস একটা চা বাগানে কেরাণীগিরী করেই নূতন কোম্পানি করে' ধাঁ' করে ইনি তার ম্যানেজিং এজেন্সী নিয়ে ব'সলেন, ভাবলেন এ আর কি কাজ, দু'দিনে ঠিক করে নেব। কিন্তু এসে দেখলেন যে ভীষণ ব্যাপার, পদে পদে তিনি ঠক্‌ছেন। আমি তখন তাঁকে সব শিখিয়ে বুঝিয়ে কাজের লায়েক করে দিলাম; তাই না এবারে একটা মোটা রকম লাভ হ'য়েছে।"

শুভা ভাবিতে পারিল না যে সে যদি এই রকম একটি লোকের স্ত্রী হইত তবে সে কি করিত। গৃহস্থালীর সৌষ্ঠব সম্পাদনে সে যতই যত্নবতী হউক, সে বাহিরে গিয়া তার স্বামীকে কাজে এতখানি সহায়তা কখনই করিতে পারিত না। কোনও বাঙ্গালীর মেয়েই বোধ হয় তাহা পারে না এইরূপ তার মনে হইল। তারা কোথায় পাইবে এই পাহাড়ী

নারীর কর্ম্মপটুতা বা শক্তি, যাতে কোনও ভারী কাজকেই সে কাজ বলিয়া গ্রাহ্য করে না, কোথায় পাইবে এই চরিত্রের দৃঢ়তা যাহাতে বাধাবিঘ্ন সমস্ত তুচ্ছ করিয়া তাহাকে কর্ত্তব্যের পথে ঠেলিয়া লইয়া যায়। এই পাহাড়িণীর তুলনায় তার বাঙ্গালীর মেয়েদের সাজান পুতুল বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যতই তাহার নিজের অক্ষমতা ও অপটুতার কথা মনে হইল, ততই মৈলীর উপর তাহার শ্রদ্ধা বাড়িয়া চলিল।

কারখানা দেখিয়া শুভা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। সেখানেও এই নারীর কর্ম্মসৌষ্ঠবের দৃষ্টান্ত সে পদে পদে দেখিতে পাইল। বাড়ীটি আগাগোড়া অতি সুন্দর ইংরাজী রুচিতে সুসজ্জিত, আর সর্ব্বত্র ছিম্‌ছাম্। কোনও খানে এক ফোটা ময়লা বা আবর্জ্জনা নাই, কোনও জিনিস একটু বেগোছ নাই। ড্রয়িংরুম হইতে খোকা বাবুর ঘর ও রান্নাঘর পর্য্যন্ত, ঘর হইতে বাহিরের বাগান পর্য্যন্ত, আগাগোড়া সুন্দর, সুশ্রী, পরিচ্ছন্ন। অথচ দাস দাসীর বাহুল্য নাই। কেবল খোকা বাবুর একটি আয়া এবং একটি চাকর—রান্না কতক এই চাকর করে কতক করে মৈলী নিজে।

এতক্ষণ শুভা ভাবিতেছিল, সে হইলে গৃহস্থালীর সৌষ্ঠব বিধান করিত মাত্র—কিন্তু এখন সে বুঝিল যে এই মেয়েটীর মত গৃহস্থালীর সৌষ্ঠব বিধান তাহার সাধ্যে কুলাইত না। তাহার মন যেমন একদিকে প্রশংসায় পূর্ণ হইল, অপর দিকে তেমনি নিজের প্রতি দারুণ অশ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল।

সেই দিন বৈকালে মৈলীর কাছে টেলিগ্রাম আসিল যে বাবু সেই দিনই আসিবেন। মেলট্রেণে পথে নামিয়া একটা কাজ সারিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বাগানে যাইবেন, আসিতে রাত্রি হইতে পারে।

শুভা স্পষ্টই দেখিতে পাইল মৈলীর চোখ-মুখ টেলিগ্রাম পাইয়া

আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে উচ্ছ্বসিত চিত্তে শুভাকে খবর দিয়া বলিল, "এখন ভাই আমাকে একটু মাপ ক'রতে হবে, আমি তাঁর জিনিস পত্তর ঠিক ঠাক করে গুছিয়ে রাখতে চাই।"

শুভার সন্দেহ রহিল না যে এই নারী বাবুটিকে যথার্থই ভালবাসে!

রাত্রে শুভা শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল। আজকার এই অভিজ্ঞতা লইয়া সে তার সমস্ত জীবন উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল। তার চোখে আজ তার নিজের একটি গুণও ধরা পড়িল না। তার মনে হইল তার মত অপদার্থ স্ত্রীলোক বড় বেশী নাই; মনুষ্যত্ব হিসাবে সে মৈত্রীর পাদপীঠ অধিকার করিবার যোগ্য নয়। অথচ এই তাহার শক্তি-সামর্থ্য লইয়া সে কত বড় একটা অহঙ্কার গড়িয়া তুলিয়াছিল, কত বড় স্পর্দ্ধা লইয়া সে সমাজের সঙ্গে যুদ্ধ লড়িবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, একটা বড় প্রকাণ্ড বড় কাজ করিয়া জগতে অমরত্বলাভ করিবার কল্পনা করিয়াছিল। তার যে ছোট কর্ম্মক্ষেত্র ছিল তার যোগ্য শক্তি তাহার হয় তো ছিল। চেষ্টা করিলে হয় তো তার সমস্ত শক্তির প্রয়োগ করিয়া তার সেই ক্ষুদ্র কার্য্যক্ষেত্রে সফলতা করিতে পারিত। কিন্তু তাও সে করে নাই। আজ মৈত্রীর কাণ্ড দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া তার মনে হইল যে সে সংসারের কাজটাও খুব ভাল করিয়া করিতে পারে নাই। সেই সংসারকে সে তো মৈত্রীর সংসারের মত সুন্দর ও সৌষ্ঠব-সম্পন্ন করিয়া রাখিতে পারে নাই। তাহার স্বামীকে তো সে মৈত্রীর মত করিয়া চালাইয়া কর্ম্মপটু করিয়া তুলিতে পারে নাই। আজ তার মনে হইল যে সে যদি ইচ্ছা ও একাগ্রভাবে চেষ্টা করিত তবে হয় তো সে তার স্বামীকে মানুষ করিতে পারিত, তার সংসার সুখের নিলয় করিতে

পারিত। সে চেষ্টা সে করিয়াছে কি? তাহার স্বামীকে বিপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার কিংবা পরামর্শ দিয়া সুপথে চালিত করিবার কথা কোনও দিন তাহার মনেও আসে নাই। যদি সে চেষ্টা করিত, তবে কে জানে যে তাহার স্বামীও বাস্তবিক একটা মানুষের মত মানুষ হইত না। তাহা হইলে তার জীবন তো আজকার এই প্রকাণ্ড ব্যর্থতার বোঝা না হইয়া কত সার্থক হইতে পারিত?

এই সব নানা কল্পনা করিতে করিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল। অনেক রাত্রিতে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে তখন তার স্বামীর কথা স্বপ্ন দেখিতেছিল। তার সেই ছোট সংসার যেন বড় হইয়াছে, চারিদিকে ছোট ছোট ছেলে পিলে খেলা করিতেছে আর তার বাড়ীখানা যেন ঠিক এই চা বাগানের বাড়ীর মত সাজান গুজান। তার স্বামী যেন তার কাছে আসিয়া স্নিগ্ধভাবে তাহার সঙ্গে প্রেমালাপ করিতেছেন। সে ঘুম ভাঙ্গিয়াও যেন তার স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল, তিনি যেন বিহ্বলকণ্ঠে প্রেম নিবেদন করিতেছেন। শুভা চমকিয়া একেবারে বিছনায় উঠিয়া বসিল, তার বুকের ভিতর ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। এখনো সে পাশের ঘরে তার স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। তার মাথার ভিতর আগুন ছুটিতে লাগিল, সে ছুটিয়া দ্বারের কাছে গেল।

শুভা যে ঘরে ছিল সে ঘর তখন অন্ধকার। পাশের ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। সেটা খাইবার ঘর। টেবিলে বসিয়া ইংরাজী পরিচ্ছদে সজ্জিত বাবুটি খানা খাইতেছিল, সম্মুখে মৈলী স্মিতমুখে বসিয়া তার সঙ্গে কথাবার্তা কহিতেছে। দু'জনেই মুগ্ধ তন্ময়! শুভা দ্বারের কাছে থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার ভ্রূযুগ কুঞ্চিত করিয়া তাহার সমস্ত শক্তি চক্ষের ভিতর সঞ্চিত করিয়া সে চাহিয়া দেখিল—না সে ভুল করে নাই, এ ব্যক্তি

তাহার স্বামী নিবারণ! তার দাড়ী-গোঁফ এখন কামান; তার শরীরের স্থূলতা অনেকটা কমিয়াছে, কিন্তু এ যে সেই তাহাতে আর ভুল নাই।

বোঁ করিয়া শুভার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। সে অতিকষ্টে দরজা ধরিয়া আত্মসম্বরণ করিল। তার পর সে পিছু হাটিয়া অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া এই প্রণয়ীযুগলকে দেখিতে লাগিল, তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিল।

দেখিয়া শুনিয়া তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না যে এরা পরস্পরের প্রতি সত্যসত্যই অনুরক্ত। একথা ভাবিতে তার মনে বড় জ্বালা বোধ হইল। এ জ্বালার কোনও সঙ্গত হেতু সে খুঁজিয়া পাইল না। যে স্বামীকে সে অপদার্থ বোধে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে লইয়া যদি আর কেহ সুখী হয় তবে তাহাতে তাহার রাগ করিবার কি আছে? কিন্তু তার বেশ একটু রাগ হইল। বারবারই সে নিজের অজ্ঞাতসারে মনে মনে বলিতে লাগিল, "এত সোহাগ তোমার ছিল কোথায়? আমাকে যদি এমনি আদর করিতে তবে কি আমি তোমায় ছাড়িয়া আসিতাম?" সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল, সে কি মৈলীর মত যত্নের ও সোহাগের যোগ্য যে তাহাকে নিবারণ এত সোহাগ করিবে। শুভা নিবারণের কি করিয়াছে? মৈলী তাহাকে মানুষ করিয়াছে, তার ভিতরকার কর্ম্মশক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তার মনুষ্যত্ব স্ফুরিত করিয়াছে, আর সে—কিছুই করে নাই। ভাবিতে তাহার কান্না পাইল। আবার রাগ হইল, মনে হইল, সে কি পারিত না? তার ভিতর যে শক্তি ছিল তাহার স্ফুরণ হইতে অবসর সে পাইল কই? তাহার স্বামীই তো তার ভিতরকার সমস্ত মনুষ্যত্ব পিষিয়া মারিয়াছিল।

এমনি নানা ভাবনায় চিন্তায় সে অবশিষ্ট রাত্রি বসিয়া কাঁদিয়া কাটাইল। শেষ রাত্রে সে ঘুমাইল।

[২৮]

যখন শুভার ঘুম ভাঙ্গিল তখন অনেকটা বেলা হইয়াছে। মৈলী দু তিনবার আসিয়া তাহাকে দেখিয়া গিয়াছে, কিন্তু তার ঘুম ভাঙ্গায় নাই। ঘুম ভাঙ্গিয়া শুভার শরীর অত্যন্ত অসুস্থবোধ হইল। তাহার মাথা ঘুরিতেছে, হাত পা নাড়িতে কষ্টবোধ হইতেছে। তাহার শুশ্রূষাকারিণী নলিনী আসিয়া তাহাকে উঠাইল, সে বিছানায় বসিয়াই ঔষধপত্র ও চা খাইয়া আবার শুইয়া পড়িল। মৈলী বার বার আসিয়া তাহার তত্ত্বতল্লাস করিল, কিন্তু সেদিন আর তার নিবারণের সঙ্গে দেখা হইল না। শুভা তাহাতে অনেকটা স্বস্তি বোধ করিল।

সমস্ত দিন সে বসিয়া ভাবিল এখন পলাইবার উপায় কি। গতরাত্রে যে সে এত কাঁদিয়াছিল তাহা ভাবিয়া তাহার এমন আশ্চর্য্য বোধ হইল। এখন আর তার সে সব কথা মনে হইতেছিল না। সে কেবল ভাবিতেছিল কি উপায়ে নিবারণকে দেখা না দিয়া পলায়ন করিতে পারে। অনেক রকম ফন্দী সে আঁটিল, কিন্তু কোনওটাই তার কাছে সুসঙ্গত মনে হইল না। রাত্রে উঠিয়া গোপনে পলায়ন করা অসম্ভব, কেননা, প্রথমতঃ ষ্টেশন এখান হইতে অনেকদূর, তাহার দুর্ব্বল শরীরে এতটা চড়াই রাস্তা উঠিয়া যাওয়া অসম্ভব। তাহা ছাড়া রাত্রে এখান হইতে যাইবার কোনও ট্রেণ নাই, সেই বেলা ৯টায় প্রথম গাড়ী, তা' সেও দার্জ্জিলিঙ্গের দিকে যায়। শুভার ভয় হইল যে সে ষ্টেশনে চলিয়া গেলেও মৈলী তাহার পিছনে ছুটিবে এবং ষ্টেশনে গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে মৈলীর কাছে বলিল, "আমি ভাই কাল যাব।"

মৈলী সেকথা শুনিতেই চাহে না। তাহার শরীরের বর্ত্তমান অবস্থায়

সে তাহাকে যাইতে দিতেই পারে না। যতদিন সে সুস্থ না হয়, ততদিন এইখানেই থাকিতে হইবে।

শুভা বলিল এ যায়গাটা তাহার পোষাইতেছে না, সে দার্জ্জিলিঙ্গেই ভাল ছিল, সেখানেই ফিরিয়া যাইবে।

মৈলী এ বিষয়ে তাহাকে বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিতে বলিল, আর ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করিবার কথা বলিল।

বিপদ দেখিয়া শুভা বলিল, "দেখ ভাই মৈলী, আমি তোমাকে স্পষ্ট করেই বলি, তোমার বাবুর সঙ্গে আমার দেখা করা অসম্ভব। বাবুকে আমি চিনি, তিনি আমার খুব নিকট আত্মীয়। আমি তাঁ'কে এ অবস্থায় দেখলে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হবেন। সেই জন্যেই আমার পক্ষে তাঁর সঙ্গে দেখা না করে গোপনে চলে যাওয়াই সঙ্গত হবে।" এ কথা বলিতে তা'র চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। মৈলী অবাক্ হইয়া গেল। সে এ কথাটায় নিজেকে একটু অপমানিত বোধ করিল। তার শিরার ভিতর পাহাড়ীর রক্ত নাচিয়া উঠিল, চক্ষে তাহার আগুন ছুটিল। সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ ভাবিয়া সে বলিল, "তা' হ'লে তোমার দেখা ক'রতেই হ'বে। আমি একবার দেখতে চাই যে তিনি অপমানিত ও লজ্জিত বোধ করেন কি না। যদি তিনি তোমার কাছে আমার সঙ্গে সম্বন্ধটা প্রকাশ হওয়ায় লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হন, তবে বুঝবো তিনি মানুষ নন। জান দিদি, ওঁকে আমি মানুষ করেছি। উনি যখন এখানে আসেন তখন উনি ছিলেন একটা অকর্ম্মার ধাড়ি। খালি খাওয়া আর শোয়া ছাড়া কোনও কাজই জানতেন না। আমি ওঁকে কাজ শিখিয়েছি; এখন যে উনি টাকায় পয়সায় স্বভাব চরিত্রে

দশের একজন হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন সে আমারি গুণে। তুমি কথাটা তুল্লে তাই বল্লাম, না হ'লে এমন গর্ব্ব করা আমার স্বভাব নয়। এমন হ'য়েও যদি উনি আজ কোনও লোকের কাছে আমার সম্বন্ধ স্বীকার ক'রতে লজ্জা বোধ করেন তবে উনি মানুষ নন।"

শুভা মৈলীর মুখের দিকে চাহিয়া ভয় পাইল। এ কথার জবাব সে দিতে পারিল না। কিন্তু দেখা করাও তো তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। সে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। মৈলীর কথাগুলি কি জানি কেন তার বুকে ছুরীর মত বিঁধিতেছিল। সে একবার চক্ষু মুছিল। পরে ধীরভাবে বলিল, "আমি একথা বলতে চাই না যে তিনি লজ্জিত হবেনই। তবে আমি তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী আমি তাঁকে পরীক্ষায় ফেলতে চাই না। তোমাকে নিয়ে তিনি সুখে সংসার ক'রছেন এ সুখ যদি ভেঙ্গে যাবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা হয় আমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে তা' আমি ইচ্ছা করি না। তুমি কাল আমার যাবার বন্দোবস্ত করে দেও।"

অনেক বাদানুবাদের পর মৈলী রাজী হইল। সে ব্যাপারটা ভাল বুঝিতে পারিল না, কিন্তু শুভার কথায় তার মনের উপর একটা গভীর ছায়া পড়িয়া গেল।

সেইদিন বৈকালে শুভা শুনিল নিবারণ ষ্টেশনে চলিয়া গিয়াছে। এই খবর শুনিয়া সে একটু বাহির হইয়া বাগানে পায়চারী করিতে গেল।

কিছুক্ষণ হাঁটিয়া সে ক্লান্ত হইয়া একটা ঝোড়ার ধারে একটা বেঞ্চে বসিয়া পড়িল ও একান্ত মনে ভাবিতে লাগিল। আকাশ পাতাল চিন্তা তাহার সমস্ত সত্তাকে তোলপাড় করিল! তার সমস্ত অতীত জীবন তার কাছে একটা দুঃস্বপ্নের মত মনে হইল। সে

মরুভূমিতে মরীচিকাভ্রান্ত পথিকের অনেক গল্প পড়িয়াছিল, তাহার মনে হইল সে যেন সমস্ত জীবন তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া এক প্রকাণ্ড মরুভূমির ভিতর দিয়া ক্লান্ত চরণে যাত্রা করিতেছে, এতদিন সে কেবল অপার তপ্ত বালুকাময় মরুভূমি ছাড়া আর কিছুই পায় নাই; কেবল ঐ দূরে এক সরস ছায়াময় ওয়েসিস—যেখানে জল কলকল করিতেছে, বৃক্ষলতা শান্ত শীতল ছায়া দিতেছে, কিন্তু সেটা কেবলি ভ্রান্তি 'এক একটা দুষ্ট মরীচিকা। মরণের পথে এই মরীচিকা তাহাকে টানিয়া আনিয়াছে এখন আর ফিরিবার পথ নাই, সমস্ত জীবন তার একটা তপ্ত নিরাশার আগুনে ছারখার হইয়া যাওয়া ছাড়া অন্য পরিণতি তার নাই।

ভাবিতে ভাবিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল তাহা সে লক্ষ্য করিল না। হঠাৎ পিছনে শব্দ শুনিয়া সে ফিরিয়া চাহিল। একজন অশ্বারোহী ঠিক শুভার পিছনে আসিয়া ঘোড়া টানিয়া থামাইল, শুভা উঠিয়া দাঁড়াইল, তা'র বুকের ভিতর ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তমাত্র দুইজন দুইজনের দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর শুভা মুখ নীচু করিল। নিবারণের মুখ লাল হইয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তে সে একদম্ ফ্যাকাসে হইয়া গেল। সে বলিয়া উঠিল "শুভা।" পরমুহূর্ত্তে আর কোন কথা না বলিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া কারখানায় চলিয়া গেল।

পরের দিন শুভা কলিকাতা যাত্রা করিল। ট্রেণে উঠিয়া সে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। তার সমস্ত হৃদয় মথিত করিয়া অশ্রুধারা তাহার মুখ ভাসাইয়া দিল। কত কথা এলোমেলো ভাবে তার মনে হইল, তা গুছাইয়া বলা অসম্ভব, সব কথা যে স্পষ্ট করিয়া তাহার মনে আকারিত হইয়াছিল তাও নয়। সে প্রথম এক চোট তার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিল, তার পিতামাতা ও স্বামীকে নিন্দা করিল, নগেনকে তিরস্কার করিল,

অতুল, চাঁপা, সুরেশ বাবু প্রভৃতি যে যখন তাহার জীবনের পথে আসিয়াছিল সকলের ঘাড়ে তার দুর্দ্দশার জন্য দায়িত্ব আরোপ করিল।—শেষে তার নিজেকে ধিক্কার দিবার পালা আসিল।

সে নিজেই অপদার্থ তাই তার জীবনকে ধন্য করিতে পারিল না। মৈত্রী যাহা পারিয়াছে সে কি তাহা পারিত না! একটু ধৈর্য্য, একটু সাধনা, একটু আত্মোন্নতির চেষ্টায় যাহা সহজ সাধ্য ছিল, অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, আপনার উপর অপার শ্রদ্ধা লইয়া সে সেপথ ত্যাগ করিয়া অকূল সাগরে ঝাঁপ দিয়াছিল। এই অভিমানেই তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, ইহার জন্য সে অপর কাহাকে দায়ী করিবে? তার বুদ্ধি, বিদ্যা, সাধ্য সামান্য, কিন্তু অহঙ্কার পর্ব্বতপ্রমাণ, তাই তাহার এ সর্ব্বনাশ।

যখন শুভা কলিকাতায় নামিল, তখন তার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে। সারা রাত্রের দুশ্চিন্তার তার দার্জ্জিলিঙ্গের বায়ুতে যাহা কিছু উপকার হইয়াছিল তাহা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। সে অত্যন্ত দুর্ব্বল শরীরে তাহার বাসায় গিয়া পৌঁছিল।

সে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল যে বাড়ীতে তালাবন্ধ। সে খানিকক্ষণ দরওয়ানের জন্য অপেক্ষা করিয়া শেষে চাঁপার হাঁসপাতালে চলিয়া গেল।

[২৯]

জগৎ ডাক্তার শুভাকে দেখিয়া বলিলেন, "এ কি! আপনার শরীর তো মোটে সারে নি, এখনি ফিরে এলেন যে?"

শুভা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "শরীর সারবার হ'লে তো সারবে। আমার দিন ফুরিয়েছে ডাক্তার বাবু।"

শুশ্রূষাকারিণী ডাক্তারকে জানাইল যে দার্জ্জিলিঙ্গে শুভার শরীর বেশ

ভাল হইয়াছিল, কিন্তু ফিরিবার পথে একটা চা বাগানে গিয়া শরীর আবার একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে!

ডাক্তার বলিলেন, "যা হ'ক এ আপনার দু' চার দিন বিশ্রাম করলেই এ ঝোঁকটা কেটে যাবে।"

শুভা ক্লান্তভাবে একটু হাসিয়া বলিল, "হাঁ বোধ হয় একেবারে চুকে যাবে। যাক্, ব্যাপার কি বলুন দেখি। বাড়ী বন্ধ কেন? চাঁপা কোথায় গেল?"

"সে অনেক কথা। আজ দিন দশেক হ'ল তাঁর স্বামী রেঙ্গুন থেকে এসে তাঁকে নিয়ে গেছেন।"

"স্বামী! সেই ভুবন—"

"হাঁ ভুবন বাবুই বটে! তিনি এখন রেঙ্গুনে কন্ট্রাক্টরী করে মস্ত বড় লোক হয়েছেন। এতদিন পর দেশে ফিরে এসে তিনি স্ত্রীকে নিয়ে যাচ্ছেন। এতদিন তাঁরা চলেই যেতেন, কেবল আপনি আসেন নি ব'লে চাঁপা দিদি যান নি, আপনাকে কাজকর্ম্ম বুঝিয়ে দিয়ে তবে যাবেন। আহিরীটোলায় আছেন তাঁরা, আমি এখুনি তাঁকে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

শুভা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তার মাথা ভয়ানক ঘুরিতে লাগিল। চাঁপা! বেশ্যার মেয়ে, সেও পরম সৌভাগ্যে স্বামীর ঘর করিতে চলিল, আর সে? গণিকা বলিয়া সে সমাজে ঘৃণিতা, স্বামীর ত্যক্তা, আর যে আশা আশ্রয় সে ঘর ছাড়িয়াছিল, তাহা তার পক্ষে একান্ত দুর্ল্লভ! কেন কি পাপ সে করিয়াছে? শুভার দুর্ব্বল শরীরে সে আর ভাবিতে পারিল না, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

জগৎ ডাক্তার তখনি তাহার শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাকে উপরে লইয়া শোয়াইয়া দিলেন এবং জ্ঞান সঞ্চারের পর ঔষধ

ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া তিনি সুরেশ বাবু ও চাঁপার কাছে সংবাদ পাঠাইলেন।

সুরেশবাবুর খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন; চাঁপা আসিতে পারিল না জগৎ ডাক্তারের চেষ্টা ও সুরেশবাবু ও নার্সদিগের শুশ্রূষায় সুস্থ হইলেও জগৎ ডাক্তার তাহাকে দুই দিন ছাড়িয়া দিলেন না। তৃতীয় দিনে শুভা নিজের বাড়ীতে গেল, সঙ্গে একজন শুশ্রূষাকারিণী গেল। ডাক্তারবাবু বলিয়া দিলেন মাসখানেক খুব সাবধানে থাকিতে হইবে। কোনও বড় পার্ট লইয়া রাত্রি জাগরণ একেবারে নিষিদ্ধ হইল।

এখন শুভার বিশ্বজোড়া চিন্তার মধ্যে আর একটা চিন্তা আসিয়া জুটিল, সে টাকার চিন্তা। তাহার জমাপুঁজি যাহা ছিল কতক তাহাদের স্কুলে, কতক চাঁপার হাঁসপাতালে আর অবশিষ্ট তাহার চিকিৎসায় খরচ হইয়া গিয়াছে। এখন রোজগার না করিলে চলে না, অথচ শরীর যেমন হইয়াছে তাহাতে রোজগারের পথ প্রায় বন্ধ। তাহার চলিবে কি করিয়া ভাবিতে তাহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। একবার মাদার ক্রিশ্চিয়ানার কাছে যাইবার কথা মনে হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে বড় লজ্জা হইল। আগে গেলে সে ত্যাগী রূপে যাইতে পারিত; তাহার যথাসর্ব্বস্ব ধর্ম্মের নামে দান করিয়া সে ব্রতী হইতে পারিত এখন সেখানে সে অন্নের কাঙ্গাল হইয়া যাইবে কোন লজ্জায়? তা ছাড়া ধর্ম্মের উপর তার গভীর আস্থা কোনও কালেই হয় নাই, এখন তাহার ধর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা আরও নরম হইয়া পড়িয়াছিল। তাই সে কথা সে একেবারে মন হইতে সরাইয়া দিল। কিন্তু ভাবিয়া সে কূলকিনারা পাইল না।

জগৎ ডাক্তারকে ডাকাইয়া সে পরামর্শ করিল। শেষে স্থির হইল সে বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া হাঁসপাতালের একটা ঘরে থাকিবে এবং সেখানে শুশ্রূষাকারিণী রূপে নিযুক্ত থাকিবে।

সুরেশবাবুও তার কথা ভাবিতেছিলেন। তিনি একদিন আসিয়া শুভাকে বলিলেন, "দেখ আমি থিয়েটারটাকে Reorganise ক'রবো স্থির করিয়াছি। এটাকে একজনের সম্পত্তি করে রাখলে এক্টর এক্ট্রেসদের এর প্রতি কোনও টান থাকে না আর এর স্থায়িত্বও থাকে না। আমি এটাকে সমবায়ের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ক'রতে চাই। এখনই সবাইকে এর ভিতর নিতে চাই না, কয়েক জন প্রধান প্রধান অভিনেতাকে মালিকীর ভিতর নিয়ে অবশিষ্ট লোকদের একটা লাভের অংশ দিতে চাই। আমি মনে করছি তোমাকে সত্যেনকে, আর যোগেশকে অংশীদার করে নেব, চাঁপা থাকলে তাকেও নিতাম। তা ছাড়া মোট লাভের শত করা দশটাকা আমি সব এক্টর একট্রেসদের করে ভাগ দিতে চাই। এ ভাল হ'বে না কি ?"

শুভার বুঝিতে বাকী রহিল না কি উদ্দেশ্যে সুরেশবাবু এ প্রস্তাব করিতেছেন। শুভা এখন অভিনয় যতটুকু করিতে পারিবে তাহাতে তাহার পারিশ্রমিক খুব বেশী হইবে না। অথচ তাহাকে হাতে তুলিয়া কিছু দিলেও সে লইবে না নিশ্চয়। সেজন্য তাঁহার এ স্বার্থত্যাগের সংকল্প।

শুভার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, সে বলিল, "এতে যে আপনার ভয়ানক ক্ষতি হ'বে সুরেশবাবু।"

সুরেশবাবু বলিলেন, "ক্ষতি বলতে পারি না। বরং এতদিন যে এমন করিনি সেইটাই আমার অন্যায় হয়েছে। এই তুমি নামবার পর থেকে আমার বিশ হাজার টাকা লাভ হ'য়েছে। তুমি আসবার আগে সে জায়গায় পাঁচ হাজার টাকাও হ'ত কিনা সন্দেহ। সুতরাং এই যে অতিরিক্ত পনেরো হাজার টাকা, এটা হ'ল তোমার রোজগার। ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ আমার এতে কোনও অধিকারই নেই। আমি প্রকৃত প্রস্তাবে, এই

তোমাদের সবাইকে খাটিয়ে অন্যায় ভাবেতে লাভ ক'রেছি—এটা exploitation-আমি কেন এ ক'রতে যাব ? আমার এমন কি টাকার দরকার, যার জন্য এ অধর্ম্ম চিরকাল ক'রবো। এটা আমার principle এর বিরুদ্ধে ; এতদিন লোভে পড়ে লাভের খাতিরে principle ত্যাগ করে এসেছি, এখন সেটা অত্যন্ত অন্যায় বোধ হচ্ছে।"

শুভার বুক ভরিয়া উঠিয়াছিল। একথার সে কোনও উত্তর দিতে পারিল না। সমস্ত বিশ্বটার উপর সে চটিয়া গিয়াছিল। সে মনে করিতেছিল, পৃথিবীর সব লোক আপন আপন ধান্ধায় মাতিয়া রহিয়াছে, তাহাকে ভাল বাসিবার, তাহার কথা ভাবিবার কাহারও অবসর নাই, যাদের কাছে সে ভালবাসা চাহিয়াছে বা প্রত্যাশা করিয়াছে তারা তাকে অনাদরে অশ্রদ্ধায় পীড়িত করিয়াছে। এই তপ্ত নিরাশার মরুভুমির মধ্যে সুরেশবাবুর নিঃস্বার্থ, পবিত্র প্রেম ও সেবা দেখিয়া তার প্রাণ ভরিয়া উঠিল, সে অশ্রু রোধ করিতে পারিল না। সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সুরেশবাবু, আপনার ধর্ম্ম আপনি ক'রবেন, তা'তে আমি বাধা দেব না। আপনার দান আমি গ্রহণ করবো, আমার বড় দুঃখ এই যে এর বিনিময়ে আমার আপনাকে দেবার কৃতজ্ঞতা ছাড়া কিছুই নাই।"

সুরেশ বাবুরও চক্ষু ভরিয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিতে মুছিতে বিদায় হইলেন।

শুভা ভাবিতে লাগিল, "ভগবানের এ কি লীলা ? আমাকে নিয়ে অদৃষ্টের এ কি খেলা ? দুঃখ সুখের এমন ঢেউ খেলিয়ে দিয়ে আমার জীবন তিনি এ কি অপরূপ নাট্য রচনা ক'রছেন ?" সে তন্ময় হইয়া তার সমস্ত জীবনটাকে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। এখন তার জীবনটাকে একটা অখণ্ড অভিশাপ বলিয়া মনে হইল না। এবং দেখিতে পাইল যে তার অদৃষ্টে যে, সুখের ভাগ পড়িয়াছে পৃথিবীর বারো

আর লোকের অদৃষ্টের তুলনা তাহা বড় সামান্য নহে। জীবনে সে যাহা চাহিয়াছে—ঠিক তাহা পায় নাই, যত বড় আশা করিয়াছে তাহা তার সফল হয় নাই, কিন্তু তার আশা আকাঙ্ক্ষার কথা ছাড়িয়া দিলে সে যাহা পাইয়াছে তাহা তো বড় সামান্য নহে।

সুরেশ বাবু তাহার জন্য একখানা বিলাতী পত্রিকা আনিয়াছিলেন। কথায় কথায় সেটার কথা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন, পত্রিকাখানি টেবিলের উপর পড়িয়াছিল। পত্রিকাখানি বিলাতী সাহিত্যজগতে বেশ নামজাদা, তাহার সমালোচনা লোক আদরের সহিত পড়িয়া থাকে। শুভা দেখিল, একটা জায়গার এক টুকরা কাগজ দিয়া ঠিকানা করা আছে। অলস কৌতূহলে সে সেই জায়গা খুলিয়া দেখিল। সেই পাতায় খানিকটা জায়গা লাল পেনসিল দিয়া মোটা করিয়া দাগ দেওয়া আছে। সেই স্থানটা পড়িয়া শুভার রক্ত নাচিয়া উঠিল। লেখক একজন পেন্‌সন প্রাপ্ত সিভিলিয়ান, বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ। তিনি অধুনাতন বঙ্গীয় সাহিত্যের একটা মোটামুটী বিবরণ লিখিতে গিয়া শুভার বই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"বর্ত্তমান যুগের নূতন ভাব ও চিন্তার ধাক্কা বাঙ্গলা সাহিত্যের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে শ্রীমতী শুভসঙ্গিনীর রচিত ভদ্রা তার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। আর্ট হিসাবে নাটকখানি বার্ণার্ড শা'র উৎকৃষ্ট নাটকগুলির পার্শ্বে স্থান পাইতে পারে। বরং চরিত্র বিশ্লেষণ ও ঘটনার সামঞ্জস্য বিধান বিষয়ে একখানা অনেক বিষয়ে শা'র নাটকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন উচ্চ অঙ্গের নাটক আমি দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তা ছাড়া এ নাটক খানির বিশেষত্ব এই যে ইহাতে জীবন ও সমাজতত্ত্বের অনেকগুলি গভীর ও মৌলিক প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা হইয়াছে, জীবন ও চরিত্রের একটা উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক কথায় এই বই-

খানিকে বর্ত্তমান যুগের একখানা শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে।”

শুভা বার বার করিয়া এই অংশ পড়িল। সমস্ত প্রবন্ধটা পড়িল, বার বার পড়িয়া তৃপ্তি হইল না। এত বড় লোকের কাছে এমন উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়া তাহার হৃদয় গর্ব্বে ভরিয়া উঠিল। তাহার কল্পনা নূতন ধারায় প্রবাহিত হইল, সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা আবার নূতন করিয়া তাহার হৃদয়কে উৎসাহিত করিল। সে তৎক্ষণাৎ মনে মনে একটা নূতন নাটক লিখিবার সংকল্প ফাঁদিয়া বসিল, এবং কাগজ কলম লইয়া লিখিতে বসিয়া গেল।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় চাঁপা আসিল। বারান্দায় বসিয়া শুভা চাঁপাকে গাড়ী হইতে নামিতে দেখিল। অভিমান তার বুক ঠেলিয়া উঠিল। সে এতদিন পরে প্রাণের বন্ধুকে ছুটিয়া গিয়া অভিবাদন করিল না। চাঁপাও লজ্জিত ভাবে শুভার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

চাঁপার চেহারা এ কয়দিনে অনেকটা ফিরিয়া গিয়াছে। সে দৃপ্ত চঞ্চল মূর্ত্তির উপর একটা সৌম্য স্নিগ্ধ আবরণ পড়িয়াছে, নববধূর লজ্জা ও আনন্দ যেন তাহার সমস্ত শরীর মন একটা মনোজ্ঞ শোভায় মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। এ পরিবর্ত্তন শুভা লক্ষ্য করিল; দেখিয়া সে সুখী হইল না।

চাঁপা স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, “শুভা ভাই, আমি তোকে কি বলে মুখ দেখাব ভেবে পাচ্ছি না। তোর এত বড় অসুখ শুনেও আমি দেখতে আসতে পেলুম না। ওঁর যেন কি এক রকম, কিছুতেই আমাকে ছাড়বেন না। বোধ হয় ওঁর সন্দেহ হয় যে ওঁর কাছছাড়া হ’লে আমি তোদের সঙ্গে মিশে খারাপ হ’য়ে যাব।” বলিয়া সে হাসিল, যেন কথাটা নিতান্ত তামাসা। কিন্তু কথাটা সত্য। ভুবনবাবু চাঁপাকে ধর্ম্মপত্নী

বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি তাঁর স্ত্রীকে বেশ্যাদের সঙ্গে আর মিশিতে দিতে পারেন না। তাই তিনি চাঁপাকে এ সব দলের সঙ্গে একেবারে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিতে আদেশ দিয়াছিলেন। চাঁপাও সে আদেশ পালন করিয়াছিল। আজ অনেক বলিয়া কহিয়া কেবল এক ঘণ্টার কড়ারে শুভার সঙ্গে জন্মের শোধ দেখা করিতে সে আসিয়াছে।

কথাটায় শুভার বুকের ভিতর বড় খোঁচা লাগিল। সে তবে চাঁপার সাহচর্য্যেরও অযোগ্য। এই ভুবনকে একটা নরাধম পাপিষ্ঠ বলিয়া বেশ্যা হইয়াও চাঁপার মা বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। আর সেই ভুবন আজ না জানি কোন অসদুপায়ে দু'পয়সা জমাইয়া সমাজে এমন একটা প্রতিষ্ঠা জমাইয়া বসিয়াছে, যার জোরে সে শুভাকে অপমান করিবার স্পর্দ্ধা রাখে। রাগে শুভার মুখ লাল হইয়া উঠিল, কপালের শিরা ফুলিয়া উঠিল। সে শুধু বলিল, "তবে এলে কেন?"

চাঁপা তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "ভাই, হয়তো আজ জন্মের মত তোর কাছে বিদায় হ'তে এয়েছি, আজ তুই রাগ করে থাকিস না লক্ষ্মীটী, তোর হাসিমুখ না দেখে গেলে আমার স্বর্গেও যে সুখ হবে না শুভা।"

চাঁপা কাঁদিয়া ফেলিল। শুভাও কাঁদিল। অশ্রুজলের ভিতর দিয়া দু'জনের প্রাণে প্রাণে জোড়া লাগিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে শুভা বলিল, "চাঁপা ভাই, অবশেষে তুইও আমায় ছেড়ে চল্লি! আমার আর কে রইল?"

চাঁপা চোখ মুছিয়া বলিল, "কেন আর ও কথা বলে' দাগা দিস্ বোন? তোকে ছেড়ে যেতে আমারও যে বুকের পাঁজর ভেঙ্গে যাচ্ছে! কিন্তু কি

করবো বোন? আশীর্ব্বাদ কর যেন আমি জন্মজন্ম পতিসুখে সুখী হই। আমার এ সৌভাগ্য যে স্বপ্নের অতীত।"

শুভার মনে হইল, চাঁপা বড় স্বার্থপর। শুভার দিকটা সে মোটেই দেখিতেছে না। সে কেবল ভাবিতেছে নিজের সুখ সৌভাগ্যের কথা। এমন লোকের কাছে নিজের দুঃখের কথা বলিতে আছে?

সে বলিল, "তা' তোর হঠাৎ এ সৌভাগ্য হ'বার মানে?"

"সব লীলাময়ের খেলা। একদিন দুপুর বেলা হঠাৎ দেখি উনি এসে এখানে হাজির। আমার বাড়ীতে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে জগৎ ডাক্তারের কাছে শুনে এখানে আমার কাছে এলেন। আমার তখন কি অবস্থা বুঝতেই পারিস। ও যে আমার কি, তা' তুই জানিস্ না। মা যখন ওকে তাড়িয়ে দিলে তখন আমার কাছে পৃথিবীটা একেবারে অন্ধকার হ'য়ে গিয়েছিল। এক বচ্ছর ওর আশায় আশায় কি না ক'রেছি আমি। যখন শুনলাম উনি দেশত্যাগী হ'য়ে রেঙ্গুন গেছেন তখনও আমার রাগ হ'ল না, কেবল বুক ফেটে কান্না আসতে লাগলো! এত দিন,—আজ পাঁচ বচ্ছর—এতদিন পর তা'কে দেখতে পেয়ে আমার বুক যেন ভেঙ্গে পড়তে চাইলো। উনি এসে বল্লেন, চাঁপা আমায় চিনতে পার?' আমি বল্লাম, 'আমার না চিনবার কোনও হেতু হয় নি, তোমারই নতুন মানুষ জুটেছে তাই আমায় ভুলে যেতে পার।' এই কথায় বলব কি বোন, সে আমার পায় লুটিয়ে পড়ে বল্লে, 'চাঁপা আমায় মাপ ক'রতে পারবে কি?' আমি তখনি তাকে তুলে নিলাম, পায়ের ধুলা নিয়ে বসিয়ে সব জিজ্ঞেস পত্তর ক'রলাম।

শুনলাম উনি রেঙ্গুন গিয়ে সেই বিধবার টাকা দিয়ে একটা ছোটখাট ব্যবসা আরম্ভ ক'রলেন। তার পর ক্রমে কণ্ট্রাক্টরি আরম্ভ করে ধাঁধাঁ করে বড় লোক হ'য়ে উঠেছেন। এদিকে সে বেহায়া মাগীর হলো রাগ,

সে বলে এ সব টাকা তার। তাই নিয়ে ওঁর সঙ্গে কিছু মনান্তর হ'ল। সে মাগী তখন একটা সাহেবকে ধরলে। সে সাহেব তখন ওঁর পেছনে লাগলো, অনেক নাস্তানাবুদ করবার চেষ্টা করলে। তা' ভগবানের ইচ্ছায়, অনেক মামলা মোকদ্দমা বাধিয়েও ওঁর কিছু ক'রতে পারলে না। তখন সে মাগী রাগ করে সেই সাহেবের সঙ্গে সরে পড়লো। উনি তার কাছ থেকে যতটাকা নিয়েছিলেন তা' মায় সুদ ফিরিয়ে দিয়ে নিজের কাজ করতে লাগলেন।

কিছুদিন যেতে ওঁর মনটা বড় খাঁ খাঁ ক'রতে লাগল। উনি বল্লেন যে সেই মাগীটার রকম সকম দেখে গোড়া থেকেই আমার জন্য মন কেমন করতো। তবে সে মাগীকেও ছাড়তে পারেন না, আমার কাছেও লজ্জায় আসতে পারেন না। এমনিভাবে কিছুদিন যাবার পর উনি ঠিক করলেন আমার খোঁজ নেবেন। খোঁজখবর নিয়ে উনি ছুটে এলেন আমাকে নিতে।

সে যদি দেখতিস্ ভাই ওঁর কান্নাকাটি। আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার ক'রেছিলেন বলে কত যে দুঃখ ওঁর মনে হ'য়েছে তা' বলবার নয়! আর মানুষটীও একদম্ বদলে গেছে। সেখানে সে দশের একজন। আমার জন্ম জন্ম তপস্যার ফলে ভাই এত সৌভাগ্য হ'য়েছে আমার।"

শুভা দেখিল চাঁপা নূতন করিয়া স্বামীর প্রেমে একেবারে মশগুল্ হইয়া গিয়াছে। কি জানি কেন তার মনে বড় হিংসা হইল। সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে রেঙ্গুনে চাঁপার সুখসৌভাগ্যের চিত্রের পার্শ্বে সেই খরসাঙ্গের চা বাগানের একখানা ছবি তাহার মনের মধ্যে গড়িয়া উঠিল। সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "যাও ভাই স্বামী পুত্রবতী হ'য়ে জন্ম জন্ম সুখী হও। তিনি যেন তোমার সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন।"

চাঁপা হাসিমুখে বলিল, "তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক ভাই। এখন তুই তো রইলি এখানে, তোর হাতে আমার কাজ রইলো। স্কুল হাঁস-পাতাল সব তোরই জিনিস তুই দেখিস ভাই।"

শুভা শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, "আমি আর ক'দিন ভাই, আমার দিন ফুরিয়েছে!"

"বালাই! অমন কথা মুখে আনতে আছে। তোর ম'লে চলছে কই। আমরা ছোট খাট মানুষ, ছোট খাট সংসার আমাদের, আমরা ম'লে বেশী মানুষের ক্ষতি হবে না। তুই তো তা' ন'স, তোর যে মস্তবড় কাজ র'য়েছে, সমস্ত দেশ তোর কাছে সেবা দাবী ক'রছে, তুই গেলে চ'লবে কেমন করে? তোর কাজ না সেরে তুই যাবি কোথায়?"

শুভার কাছে কথাগুলি যেন উপহাসের মত বোধ হইল। এমনি কথা সে একদিন ভাবিত বটে! এমনি আস্থা তা'র নিজের উপর তার একদিন ছিল। আজ চাঁপার মুখে তার অতীতের সেই মনের কথার প্রতিধ্বনি শুনিয়া তাহার বড় লজ্জা হইল। সে বলিল, "আর লজ্জা দিস নে ভাই! আমার অহঙ্কার চুকে গেছে, তুই-ই তো তার অর্দ্ধেক ভেঙ্গে দিয়েছিস। আমি এখন জানি খুব সাধারণ একটি লোক, কেবল মুখে বড় বড় কথা ব'লে তোদের মত লোককে ঠকিয়ে বেড়িয়েছি, নিজেকেও ঠকিয়েছি। এখন আর সে অহঙ্কারের এক ফোঁটাও আমার নাই।"

চাঁপা গভীর দৃষ্টিতে শুভার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মানিনী লো, তোর সাধনা এমনি বটে। এমনি করেই তুই সেই জগৎপতিকে তোর পায়ের তলায় লুটিয়ে দিবি। দেখ শুভা আমি কোনও দিন কারো খোসামুদী করি না, তুই আমার কথা খোসামুদী ব'লে মনে করিস না। তোর যদি এক দণ্ডের তরেও মনে হয়ে থাকে যে তুই সাধারণ লোক,

তবে জানিস তোর ভ্রম হ'য়েছে। তোর ভিতর যে কি আছে তা' তুই জানিস না, তুই জানবি কি? তুই তো আর নিজের কর্ত্তা ন'স্। যে তোকে ঘর থেকে টেনে বের করে দুনিয়ার হাটের মাঝখানে দাঁড় করিয়েছে, সেই জানে তোকে দিয়ে তা'র কত বড় প্রয়োজন। তুই ভাবিস নে। তাঁর হাতে সব ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাক, যখন তোর দিন আসবে তখন তোর ডাক পড়বে।"

[৩০]

শুভার নূতন নাটক মহাসমারোহে অভিনীত হইল। দশ হাজার কপি ছাপা হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া গেল। নাট্যজগতে ইহা অপূর্ব্ব বস্তু বলিয়া সকলে ইহাকে সমাদর করিল।

নাটকখানি একটি রূপক। কতকটা Maeterlincl এর নাটকের ধরণের। সভ্যতার পরিণতি ইহার প্রতিপাদ্য। জীবনের সঙ্গে সভ্যতার চিরন্তন সংগ্রাম ও সুদূর ভবিষ্যতে তাহার চরম সমন্বয় ইহাতে কল্পিত হইয়াছে। মানবের জীবত্ব, তাহার প্রাণ—নগ্ন মুক্ত সরল সহজ; তাহার সভ্যতা-আবরণ বহুল, বন্ধনশোভিত, জটিল ও রহস্যময়। সমস্ত মানবের ইতিহাস ভরিয়া সভ্যতা প্রাণকে আপনার আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে; ধর্ম্ম দিয়া, নীতি দিয়া, বেশভূষা দিয়া, আইন কানুন দিয়া সভ্যতা উদ্দাম মানব-হৃদয়কে বাঁধিতে, পোষ মানাইতে চেষ্টা করিতেছে। অথচ এই অষ্টবন্ধনের ভিতর দিয়াও মানবের জীব-প্রকৃতি মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করিয়া আপনার স্বাধীনতা বাহির করিতেছে। এ বিরোধের মূল এই, যে সভ্যতা জীবনের স্বরূপ সম্যক উপলব্ধি না করিয়া তাহার সংস্কারের চেষ্টা করিতেছে। অসংস্কৃত জীবনে যে সকল নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছে সেগুলি একেবারে অস্বীকার করিয়া সভ্যতা কখনই জয়ী

হইতে পারিবে না। যখন সভ্যতা প্রভুত্ব ত্যাগ করিয়া জীবনের সহিত সখ্য সংস্থাপন করিবে যখন জীবন ও সভ্যতার লক্ষ্য ও প্রতিপাদ্য এক হইবে তখনই উভয়ই সার্থক হইবে। এই মূল তত্ত্ব একটি পরম মনোহর রূপকের ভিতর দিয়া শুভা প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

কিন্তু রূপক হইলেও নাটকটী নাটক হিসাবে সুন্দর হইয়াছিল। নাটকের নায়ক একটি পুরুষ। প্রথম দৃশ্যে সে বর্ব্বরদেশে বর্ব্বররূপে কল্পিত হইয়াছে—সেখানে তা'র এক উলঙ্গিনী প্রণয়িনী আছে, তার সঙ্গে তার প্রেমলীলার কল্পনায় শুভা তার সকল সৌন্দর্য্যবোধ ঢালিয়া দিয়াছিল। পরে অষ্টসখী পরিবৃতা, সভ্যতার মূর্ত্তি স্বরূপিণী এক নারী এই পুরুষকে মুগ্ধ করিয়া তাহাকে সভ্য দেশে লইয়া গেল। এখানেও তাহাদের প্রেমলীলার চিত্র পরমসুন্দর, পরম মনোজ্ঞ। তার পর ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যে এই পুরুষের জীবনের ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছিল। দুই প্রেমিকার টানে দুই স্বতন্ত্র আবেষ্টনের মধ্যে এই পুরুষ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুই ভাবে জীবন অতিবাহিত করিতেছে, প্রত্যেক প্রণয়িনী অপরকে বিধ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে। সমস্ত নাটক এই প্রণয়িনী যুগলের আপন প্রণয়ী লইয়া সংগ্রামের সুন্দর কল্পনামধুর চিত্র। বর্ব্বরী সভ্যার দাসীরূপে তাহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, তিলে তিলে সভ্যার আদর্শ সে আয়ত্ত করিতে লাগিল। সভ্যাও দাসীকে যতই পদানত করিয়া রাখুক, তবু তাহার কাছে মাঝে মাঝে পরাভব স্বীকার করিতে লাগিল। পুরুষ পর পর উভয়কেই আপনার হৃদয়ে স্থান দিতে লাগিল। পরিশেষে বর্ব্বরী ও সভ্যা পরস্পরকে সখীরূপে আলিঙ্গন করিয়া পুরুষের পায়ে প্রণত হইল। পুরুষ উভয়কে নিবিড় আলিঙ্গনে বক্ষে টানিয়া লইল।

এই কাহিনীর ভিতর শুভা একদিকে যেমন রূপকটা ফুটাইয়া

তুলিয়াছে অপরদিকে তেমনি ইহাকে কাব্যসম্পদে মণ্ডিত করিয়াছে। ঘটনা-বৈচিত্র্যে, চরিত্র বিশ্লেষণে, বাক্যবিন্যাসের পারিপাট্যে নাটকখানি যেমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, তেমনি ইহা সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়াছে। এই নাটক শুভা আপনার হৃদয়ের রক্ত দিয়া লিখিয়াছিল। তাহার কল্প-লোকের বর্ব্বরীর ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছিল সে মৈত্রীর অপূর্ব্ব চরিত্র আর সভ্যার ভিতর নিজের হৃদয়ের সকল সম্পদ সকল দৈন্য ঢালিয়া দিয়াছিল, তাই এ নাটক এত সুন্দর এত সরস হইয়াছিল।

শুভা যতখানি আশা করিয়াছিল' এ নাটক তার শতগুণ সমাদর লাভ করিল। মুহূর্ত্তের জন্য শুভা তার সমস্ত জীবনের নিরাশার দুঃখ ভুলিয়া সার্থকতার আনন্দে তন্ময় হইয়া গেল। দেশময় হৈ হৈ পড়িয়া গেল। চারিদিকে হইতে শুভার কাছে নানা রকম পত্র আসিতে লাগিল। কয়েকটি ইংরেজী পুস্তক প্রকাশক তাহার গ্রন্থের অনুবাদ করিবার অনুমতি চাহিল। অল্পদিনের মধ্যেই বইখানা নানা ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়া গেল। ভারতে ও ভারতের বাহিরে শুভার খ্যাতির অন্ত রহিল না। অনেক নামজাদা লোক, তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া কৃতার্থ হইলেন, দেশ দেশান্তর হইতে লোকে আসিয়া তাহাকে চোখের দেখা দেখিয়া গেল।

এই যশঃপ্রাচুর্য্যে শুভার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার ভয় হইল। সে একান্তমনে ভাবিতে চেষ্টা করিল, তাহার এ সৌভাগ্য এ-সফলতা সকলি সেই লীলাময়ের কাজ, ইহাতে সে যদি গর্ব্ব বোধ করে তবে সে আবার সেই দর্পহারীর হাতে লাঞ্ছিত হইবে। তাই আনন্দে, উৎসাহে যখন বুক ফুলিয়া উঠিত, তখনি তাহার প্রাণ কাঁপিত—বুঝি বা সর্ব্বনাশকারী গর্ব্ব আবার তাহার হৃদয় অধিকার করে—সে কেবলই গাহিত,

আমায় মাথা নত করে দাও হে তোমার,
চরণ-ধূলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার,
লুটাও চক্ষের জলে ॥

এক একটী সমালোচনা পাঠ করিতে, কম্পিত হস্তে এক একখানি অপ্রত্যাশিত প্রশংসাপত্র খুলিত আর সে এই গান গাহিত। দিন রাত প্রচণ্ড সাধনায় সে আপনার গর্ব্বকে দমাইয়া রাখিত।

কিন্তু এই বই লিখিয়া তা'র চিন্তার আর একটা ধারা সে কিছুতেই দমাইয়া রাখিতে পারিল না। বই লিখিতে লিখিতে তার মনে একটা মস্ত কল্পনা জাগিয়া উঠিয়াছিল—যদি এ কাহিনী সত্য হইত, যদি তাহার স্বামী আসিয়া মৈলী ও তাহাকে এক সঙ্গে সত্য সত্যই বুকে টানিয়া লইতেন! এই কল্পনা করিতে করিতে তার সেই অনাদৃত পরিত্যক্ত স্বামীর জন্য একটা তীব্র কামনা তাহাকে অধিকার করিত। সে তাহার কল্পনাকে অশ্বমেধের ঘোড়ার মত ছাড়িয়া দিত, কত রকম ভাবে সে ভবিষ্যৎ ভাঙ্গিত, গড়িত, কত অসম্ভব উপায়ে যে তা'র স্বামীর বর্ত্তমান সৌভাগ্যের সঙ্গে তার নিজের সৌভাগ্যের সমন্বয় হইতে পারে তাই ভাবিত। চাঁপার অদৃষ্ট দেখিয়া তা'র মনে আশা হইত, সে আশা সে কিছুতেই চাপিতে পারিত না। সে এখন ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইত যে তার এই সব মত্ত কল্পনার সঙ্গে নগেনের কথা একবারও তার মনে হইত না।

কিন্তু নগেন তাহাকে মনে না করাইয়া ছাড়িল না। একদিন সে নগেনের একখানা পত্র পাইল। নগেন লিখিয়াছে—

"শুভা, জানি এখন আমার তোমাকে এ ভাবে সম্ভাষণ করা তোমার ভাল লাগিবে কি না! তুমি এখন প্রকাণ্ড বড় লোক!

এত বড় যে তোমাকে যে কখনো সামান্য ছোট্টটি, একমুঠো ফুলের মত একটি নারীরূপে দেখিয়াছি সে কথা ভাবিতেও আশ্চর্য্য বোধ হয়। আমার মত একজন সমান্য মানুষের পক্ষে তোমাকে একান্ত পরিচিতের মত সম্ভাষণ করা খুবই স্পর্দ্ধার কথা। কিন্তু একদিন তুমি আমাকে ভালবাসিয়াছিলে, সেই জন্য ভরসা হয় এ ধৃষ্টতা তুমি ক্ষমা করিবে।

"ঈশ্বর জানেন, আমি তোমাকে কত ভালবাসিয়াছিলাম। তোমার সঙ্গে ক'দিনেরই বা পরিচয়? তাতে জীবনের ভিতর এত বড় একটা দাগ কাটিয়া গেল কিরূপে তাই ভাবিতে আশ্চর্য্য বোধ হয়। আর সে ভালবাসার কথা ভাবিতে এখন আমার লজ্জাও বোধ হয়। তুমি এত মহীয়সী যে তোমাকে ভালবাসিবার মত করিয়া ছোট করিয়া ভাবিতে পারি না। কোনও দিন যে ভাবিয়া ছিলাম, কোনও দিন যে তোমাকে কেবলমাত্র একটী রূপসী প্রেমিকা রূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলাম, সে কথা মনে হইতেও মন কুণ্ঠিত হইয়া উঠে। তোমারও হয় তো এখন আমার কথা ভাবিতে—যে তোমাকে একজন সামান্য প্রেমিকা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল তাহার কথা মনে উঠিতে—রাগ হয়। আমার সে অপরাধের জন্য আমি ক্ষমা ভিক্ষা করি।

"আজ আমি তোমার ভালবাসা ভিক্ষা করিবার স্পর্দ্ধা রাখি না সে যোগ্যতা এ পৃথিবীতে কারও আছে কি না জানি না, কিন্তু আমার নাই তাহা আমি জানি। তুমি এখন এত বড় হইয়াছ যে সে সব ভাব এখন তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তোমার প্রেম পাইয়া যে আমি দু'টি দিনের জন্য ধন্য হইয়াছিলাম সে কথা আমার চিরজীবনের প্রিয় স্মৃতি হইয়া থাকিবে। অতি দীন হীন

ব্যক্তি যদি দু'দিন চুরি করিয়া রাজার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া থাকে তবে তার যেমন মনে হয় আমারও তেমনি মনে হয়। আনন্দও হয় আবার সে স্মৃতি সম্ভোগ করিতেও ভয় হয়, মনে হয় যেন কোনও অপরাধ করিয়াছি। কিন্তু এখন তোমাকে আমি আর সে ভাবে ভালবাসিতে পারি না। আমি তোমার প্রতিভার একজন অন্ধ ভক্ত। সূর্য্যকে আমাদের ঋষিরা যেমন দূর হইতে পূজা করিতেন, আমিও তোমাকে দূর হইতে উপাসনা করিবার অধিকারী মাত্র।

"আমাদের ভালবাসা জন্মিয়াছিল একটা অভিশাপ লইয়া। আমি তাহার জন্ম অত্যন্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত। এতদিনও আমি তোমাকে তেমনি ভাবে ভালবসিয়াছিলাম বলিয়াই এতদিন সে অভিশাপ আমি তোমা হইতে যতদূর সম্ভব তফাৎ রাখিয়াছি, কিন্তু আজ, তোমার গৌরবে মনের সে ক্লেদ পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে বলিয়াই তোমার কাছে আবার অগ্রসর হইতে সাহসী হইতেছি। আমি আজ আর প্রেমিক নই, তোমার প্রতিভার অন্ধ উপাসক। সেই ভাবে তুমি আমাকে গ্রহণ করিয়া, আমাকে কৃতার্থ করিবে নাকি? তোমার অমর গ্রন্থ কোটি কোটি নরনারী পাঠ করিয়া আজ তোমার প্রতিভার নিত্য পূজা করিতেছে! আমি সেই পূজারীর দলের একজন। তোমাকে একথা জানাইতে এবং তুমি আমার অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়াছ জানিতে আমি ব্যাকুল। এ ভাবে তোমাকে সম্ভাষণ করিতে আমি কুণ্ঠিত নই এবং এই নূতন সম্পর্কে তোমার সঙ্গে চিরদিন সম্বন্ধে থাকিতে পারিলে ধন্য হইব। যদি তুমি এই ভাবে আমাকে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত না হও তবে অনুমতি হইলে আমি আপনি যাইয়া একদিন আমার পূজা নিবেদন করিয়া আসিতে চাই।"

শুভা চিঠিখানা পড়িয়া একটা গভীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছাড়িল। চিঠিখানা তাহার ভাল লাগিল না। নগেনের প্রেম তার এতদিনের সযত্ন-রক্ষিত গুপ্তধন। উপভোগ করিবার নহে, কিন্তু সঙ্গোপনে হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে রাখিয়া নিয়ত ধ্যান করিবার বস্তু। এতদিন সে মনে মনে এই কথা জানিয়া পরম আনন্দলাভ করিয়াছে যে যদিও সে প্রেম তাহার পাইবার নহে, তবু নগেন চিরদিনই তাহাকে ভালবাসিবে। আজ নগেনের নিজমুখে, সে তাহাকে আর ভালবাসে না, এই কথা শুনিয়া কাজেই সুখী হইতে পারিল না। বরং তাহার কান্না পাইল, তার মনে হইল যেন সে পৃথিবীর সব চেয়ে বড় সম্পদ হারাইল।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সমালোচকের কাছে প্রশংসা পাইয়া সে যত না তৃপ্ত হইত, নগেনের কাছে তাহার প্রতিভার জয়ধ্বনি শুনিয়া শুভার তার চেয়ে বেশী তৃপ্ত হইবার কথা, কিন্তু সেই তৃপ্তিটাই একেবারে তিক্ত হইয়া গেল, যখন সে মনে করিল যে তার প্রতিভার পূজায় নগেনের প্রেমের উৎস রোধ করিয়াছে। নগেন তাহাকে ভাবিয়াছে কি ? এমন একটা বড়, এমন একটা মহৎ কিছু, যা'কে ভাল বাসিতে যাওয়া একটা স্পর্দ্ধার কথা। কিন্তু সেই মহীয়সী প্রতিভার তলায় যে সেই পুরাতন শুভার ক্ষুদ্র প্রেমাকাঙ্ক্ষী নারী-হৃদয়ে লুকান আছে তা' কি সে জানে না ? আর যে যাই ভাবুক, নগেন তা'কে একটা ভুল বুঝিল কি করিয়া ?

নগেন তাহাকে আর ভালবাসে না, এই কথা ভাবিতে তার ব্যথিত হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই প্রত্যাখ্যান তাহার হৃদয়ে নগেনের প্রতি প্রেমের শতমুখ প্রস্রবণ মুক্ত করিয়া দিল।

অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া সে স্থির করিল এই ভাল। নগেন তাহাকে ভালবাসিলে তো হইবে না। তাহাতে চপলার সর্ব্বনাশ

হইবে, আরও কত কি অনিষ্ট হইবে তাহা কে জানে। তা ছাড়া তাহাদের প্রেম সমাজের চক্ষে, ও সামাজিক ধর্ম্মের চক্ষে মন্দ, ভগবানের চক্ষেও হয় তো সে সত্য সত্যই পাপ। কাজেই এ প্রেম যদি নগেন ভুলিয়া থাকে সে কথা মন্দ নয়! বরং ইহাতে তাহার পক্ষে কলুষিত না হইয়া নগেনের সাহায্যলাভ সম্ভব হইবে। সে অন্তরে অন্তরে তাহাকে ভালবাসিবে, কিন্তু নগেনের তাহা না জানিলে তো কোনও ক্ষতি নাই। তাই বন্ধুভাবে তাহার পূজা গ্রহণ করিতে শুভার লোভ হইল। সে নগেনকে লিখিল :—

"আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আপনি আপনার স্নেহের গুণে আমার সামান্য গুণকে অতি বড় করিয়া দেখিয়াছেন। কিন্তু আপনার মত গুণগ্রাহীর কাছে প্রশংসা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

"আপনি আমার এখানে পদধূলি দিয়া আমাকে কৃতার্থ করিতে চাহিয়াছেন। আপনার মত লোকের পক্ষে ইহা অসীম অনুগ্রহের কথা। অনুমতির কথা তুলিয়া আমাকে বৃথা লজ্জা দিবার কোনও দরকার ছিল না। আপনার যখন ইচ্ছা আসিবেন।"

পত্র পাইয়া নগেন আসিল। সে শুভাকে নমস্কার করিয়া সঙ্কুচিত ভাবে আসন গ্রহণ করিল। প্রথমটা কথা কহিতে দু'জনেরই একটু বাধ বাধ ঠেকিল। শুভা তো নগেনের মুখের দিকেই চাহিতে ভরসা করিল না। তাহার মনে হইল যেন সে নগেনের চখের দিকে চাহিলেই তা'র মনের গোপন কথা, তার অন্তরের দীন নারীহৃদয় একেবারে প্রকাশ হইয়া তাহাদের এই নূতন বন্ধুত্বের সম্পর্ক একদম চুরমার করিয়া দিবে।

সে অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে, ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার স্ত্রী ভাল আছেন?"

নগেন সংক্ষেপে উত্তর করিল "হাঁ।" কিন্তু শুভার মুখে তার স্ত্রীর কথা যেন কেমন খাপছাড়া বোধ হইল। ঠিক যেন এমনটি সে প্রত্যাশা করে নাই। তা'দের দু'জনের সম্বন্ধের ভিতর চপলার আবির্ভাব যেন একটা গুরুতর অনধিকার প্রবেশের মত মনে হইল।

শুভা বলিল, "সত্যেনবাবু ভাল আছেন?"

নগেন বলিল, "হাঁ।"

শুভা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কোনও ছেলে পিলে হ'য়েছে কি?"

এই সবই যেন নগেনের অত্যন্ত অস্বাভাবিক বোধ হইল। ঠিক এ সব কথা আলাপ করিতে সে আসে নাই এমনি তাহার মনে হইল। কিন্তু নিজে কোনও কথা পাড়িবার তাহার সাহসই হইল না। সে সংক্ষেপে বলিল, "হাঁ একটি ছেলে হ'য়েছে, আর একটি কিছু বোধ হয় শীঘ্রই হ'বে।"

শুভা একটু হাসিল। নগেনও হাসিল। শুভা বলিল, "আপনার স্ত্রী কি বই-টই খুব পড়েন?" নগেন বলিল, "রাম বল, ওধারে তাঁর মোটেই ঝোঁক নাই।"

শুভা। তা আপনি এমন রসগ্রাহী, আপনার স্ত্রীকে কেন তয়ের করেন না?

নগেন। ও জিনিস কি ত'য়ের হয়, ভিতরে না থাকলে চেষ্টা কেবল ভস্মে ঘি ঢালা হয়।

এমনি সব তুচ্ছ আলোচনায় আধঘণ্টা কাল কাটাইয়া নগেন খাবার ও চা খাইয়া বিদায় হইল।

দু'জনেরই মনে এই আধঘণ্টার আলাপে অনেকটা তোলপাড় হইয়া গেল। নগেন মনটা খুব হাল্কা করিয়া লইয়া বাড়ী গেল। শুভারও

মনে হইল যেন সে কি একটা মস্ত সম্পদ্ আজ পাইয়াছে। অথচ দু'জনেরই মনে হইল যে যাহা তাহারা বলিতে চাহিতেছিল তাহার কিছুই বলা হয় নাই। শুভা বেশ একটু আত্মপ্রসাদের সহিত অনুভব করিল, যে খুব আত্মসংযম করিয়াছে, অথচ, সেই জন্যই যেন মনের মধ্যে একটা দারুণ অতৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিল। নগেনের মনে একবার সন্দেহ হইল সে আসিয়া ভাল করে নাই। সে নিজের মনকে ভুলাইতে ছিল যে সে আর শুভাকে ভাল বাসিবার স্পর্দ্ধা রাখে না, এখন তা'র আছে কেবল একটা বিশাল শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রীতির ভাব। যতক্ষণ সে শুভা হইতে দূরে ছিল তখন তার মনের ভাব অনেকটা এই রকমই ছিল, কেন না ততক্ষণ শুভা ছিল কেবল মাত্র বিশ্ববিখ্যাত "দ্বয়ী" নাটকের প্রতিভাশালিনী রচয়িত্রী। কিন্তু রক্তমাংসের শুভা, শোভাময়ী ঢল ঢল লাবণ্যে ভরা ওই ফুলের ডালির মত শুভার সামনে বসিয়া তার রক্তের ভিতর যে নৃত্যের তাল বাজিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে নগেনেরও কাছে তার শ্রদ্ধার সঙ্গে ঠিক সঙ্গৎ হইতেছিল না। তবে সে কি শুভাকে এখনো ভালবাসে, সে কি এত বড় একটা পাগল! সে মনকে বুঝাইল, তাহা নহে। সে স্থির করিল যে শুভাকে সে বন্ধু ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পারে না। সে বন্ধুভাবেই চিরদিন থাকিবে। ইহাতে যে যাহাই বলুক না কেন তাহার অন্তরে কোনও দোষ স্পর্শিবে না।

[৩১]

নগেন নিজের মনের কাছে নিজের কাজটাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার নির্দ্দোষিতাকে একটা অগ্নি-পরীক্ষার ভিতর ফেলিবার সংকল্প করিল। এটা যে পরীক্ষা, তাহা সে মনেই করে নাই। তাহার পবিত্র সরলতায় আস্ফালন করিয়াই সে সেদিন গিয়া চপলার কাছে

সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। সে শুভার কাছে কি চিঠি লিখিয়াছিল, শুভা কি উত্তর দিয়াছিল, শুভার বাড়ী ঘর দুয়ার কি রকম, সে এখন দেখিতে কেমন হইয়াছে, কি মধুর পবিত্র ভাবে শুভা তাহাকে সম্ভাষণ করিল, কি সব কথাবার্ত্তা তাহাদের হইল সব কথা অকপটে সে চপলার কাছে বলিয়া গেল। কথার ভিতর অনেকটা উত্তেজনা ছিল। শুভার বর্ণনায় সে অনেকটা কবিত্ব করিয়া ফেলিয়াছিল, আর আগাগোড়াই তার একটা নিষ্পাপ প্রীতির অনাবশ্যক আড়ম্বর ছিল।

চপলা—এখন আর সে সরলা বালিকা নয়, সে এখন দাগা পাইয়া খুব গম্ভীর এবং চাপা হইয়াছে—আগাগোড়া মুখখানা শান্ত অবিকৃতও রাখিয়া শুনিয়া গেল। এক আধটা কথা বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়াও গেল, মাঝে মাঝে এক আধটুকু দুষ্ট হাসিও হাসিল। মোটের উপর মনের ভাবটা সে ষোল আনাই গোপন করিয়া গেল। নগেন মনে ভারি তৃপ্তিলাভ করিল। চপলা যে কোন অন্যায় সন্দেহ করে নাই এবং সরল ভাবে তাহার কথা বিশ্বাস করিয়াছে তাহাতে সে সুখী হইল এবং বেশ একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করিল। চপলার সন্তুষ্টিতে তার নিজের পাপ শূন্যতায় বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইয়া গেল।

সমস্ত কথা হইয়া গেলে চপলা জিজ্ঞাসা করিল, "তার ছেলে না মেয়ে হ'য়েছে?"

নগেন অবাক্ হইয়া গেল। সে কি কথা? শুভার আবার ছেলে মেয়ে কি? চপলা কি পাগল?

চপলা বলিল, "কিছুদিন আগে শুনেছিলুম না কি তা'র ছেলে হ'বে।"

"কার কাছে শুনেছিলে?"

"এই কে যেন ব'লেছিল, আমার মনে নেই।"

"কই আমি তো শুনিনি কিছু ?"

দু'জনে দু'জনের দিকে চাহিল। চাহিয়া দু'জনেই মুখ ফিরাইল। এই কথাটায় চপলা বুঝিল যে এতদিন বরাবরই নগেন শুভার খবরাখবর লইয়াছে এবং শুভার ছেলে হইলে সে জানিতে পারিত নগেনের এইরূপ বিশ্বাস। নগেনও বুঝিল যে তাহার অজ্ঞাতসারে চপলা চর লাগাইয়া শুভার এবং নগেনের খবরাখবর লইয়াছে। দু'জনেই এজন্য পরস্পরকে অপরাধী করিয়া মনে মনে অভিমান করিল, কিন্তু আর এ সম্বন্ধে কোনও কথা হইল না।

নগেন চলিয়া গেলে চপলা কাঁদিয়া ভাসাইল। তার মনে হইল তার প্রথম বধূজীবনের আনন্দ-স্বর্গের কথা। তার পর কেমন করিয়া শুভা আসিয়া তার নন্দন-কানন তিল তিল করিয়া উজাড় করিয়া দিল তাহাই সে ভাবিল। আজ তার স্বামী যে নিঃশেষে শুভার, তাহার নহে, এই কথা ভাবিয়া সে কাঁদিল। চপলা একেবারে সম্পূর্ণ ভাবে স্বামীগত-প্রাণা। স্বামী ছাড়া জীবনে সে কোনও সুখ কোনও সার্থকতার কল্পনা করিতে পারে না। তাই এই কথা ভাবিতে তাহার মনে হইল, যেন তার সমস্ত হৃদয় একেবারে মরুভূমি হইয়া গিয়াছে, তাহার বাঁচিয়া থাকিবার আর সাধ রহিল না। এতদিন সে স্বামীকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছে, তাঁহার মন যে তাহার উপর হইতে সম্পূর্ণরূপে সরিয়া গিয়াছে তাহা সে বুঝিয়াছিল। নগেনের সত্য সত্যই চপলার সঙ্গ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সেটা যে অন্ততঃ কতকটা চপলার দোষ সে কথা চপলা নিজের কাছে স্বীকার করিল না। সে চট করিয়া স্থির করিয়া বসিল, যে আগাগোড়াই ইহার ভিতর শুভার হাত আছে। তাহার স্বামী যে বলিলেন, এতদিন পরে তিনি মন শুদ্ধ করিয়া শুভার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন, সে

কথা সে সর্ব্বান্তঃকরণে অবিশ্বাস করিল। এই যে ক্রমে ক্রমে তিনি চপলা হইতে দূরে সরিয়া যাইতে ছিলেন, চপলা স্থির করিল যে শুভার সঙ্গে গোপন সম্বন্ধই আগাগোড়া ইহার হেতু। এতদিন যাহা সন্দেহ ছিল নগেনের আজকার স্বীকারোক্তিতে তাহা নিশ্চয়তায় পরিণত হইল। শুভার ছেলে হওয়ার সংবাদে তিনি যে বিস্মিত হইলেন এটা লোক-দেখান বিস্ময় মাত্র, কেবল নিজের দোষ ঢাকিবার চেষ্টা, তাহাও মনে করিতে চপলার কোনও কষ্ট হইল না।

সমস্ত অবস্থা যখন সে তা'র মনের মত করিয়া বুঝিয়া লইল, তখন সে নিজেকে জিজ্ঞাসা করিল, তবে বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? যতই সে এ প্রশ্ন করিল, ততই সে নিশ্চয়তার সহিত বুঝিল যে তাহার মরিয়া যাওয়াই মঙ্গল। কিন্তু খোকার কি হইবে? একবার মনে হইল খোকা জেঠা মহাশয় ও জেঠাইমার আদরের দুলাল তা'র কোনও কষ্ট হইবে না। কিন্তু মায়ের প্রাণ, খোকাকে পরের হাতে রাখিয়া যাইতে কিছুতেই সম্মত হইল না। সে আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল।

অনেক দিন ভাবিয়া ভাবিয়া সে একটা খুব সাহসের কাজ করিবে স্থির করিল।

এদিকে নগেন ঘন ঘন শুভার বাড়ী যাইতে লাগিল। প্রায় দিনই সন্ধ্যাবেলায় সে শুভার কাছে যাইয়া কিছুক্ষণ গল্পসল্প করিয়া আসিত। তাহাদের কথাবার্ত্তা এমন কিছু গুরুতর হইত না। প্রথম সাক্ষাতের আড়ষ্টতা তাহাদের কাটিয়া গিয়াছিল. এখন তাহারা বেশ সহজ ভাবে হাসিয়া খেলিয়া কথাবার্ত্তা কহিত। সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব পরমার্থতত্ত্ব, লোকহিত প্রভৃতি বিষয়ে তাহারা আলোচনা করিত। শুভা নানা হিতকর অনুষ্ঠানের কল্পনা করিত, তার পর দু'জনে মিলিয়া তা'র আলোচনা করিত। একদিন শুভা নগেনকে চাঁপার হাঁসপাতাল ও

শিক্ষালয় দেখাইয়া আনিল, নগেন তাহা দেখিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠিল, জগৎ ডাক্তারের হাতে একদিন পাঁচ হাজার টাকার একখানা চেক দিয়া আসিল, আর এই অনুষ্ঠানের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির জন্য চাঁদা সংগ্রহের চেষ্টায় লাগিয়া গেল। এমনি করিয়া পরম আনন্দে তাহারা পরস্পরের সাহচর্য্যে সময়টুকু কাটাইত, কিন্তু এই আনন্দের যে গোপন উৎস তাহাদের দু'জনের মনের ভিতর কলকল করিতেছিল, তা'র আশপাশ দিয়া ঘুরিলেও কখনও তাহারা তার সামনা সামনি হয় নাই। যে ভাবকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের সমুদয় আনন্দ উদ্ভূত হইত তার দিক হইতে তাহারা জোর করিয়া চোখ ফিরাইয়া রাখিত। মনকে বুঝাইত, যেন সে বস্তুটা নাই। শুভাও নগেনের সঙ্গে সঙ্গে এই আত্মবঞ্চনায় মাতিয়া গেল।

এই মাখামাখি, বাড়াবাড়ি, চপলার চোখ এড়াইল না। স্বামী যখন শুভার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিতেন তখন কেহ না বলিলেও সে এখন বুঝিতে পারিত। নগেন মাঝে মাঝে বলিয়াও ফেলিত। চপলার কাছে না বলিলে তার মনটা কিছুতেই নিজের নির্দ্দোষিতা নিজের কাছে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিত না। চপলা দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া স্থির করিল, "মরিতে তার হইবেই, তবে একবার শেষ চেষ্টা সে করিবে।"

বুদ্ধি স্থির করিয়া সে একদিন জোগাড় করিয়া এলবার্ট থিয়েটারে গেল। সে যাহা সংকল্প করিয়াছিল তাহা ভাবিতে তার বুকটা ভয়ানক কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু সে দৃঢ়সংকল্পের সহিত কাজ করিতে অগ্রসর হইল। থিয়েটারে গিয়াই সে থিয়েটারের দাসীর হাতে একটি টাকা ও একখানা পত্র দিয়া বলিল, "তুমি এই চিঠিখানা একবার সুরবালাকে দিয়ে এসো।"

দাসী তাহার পত্র শুভাকে দিল।

তখন অভিনয় আরম্ভ হইতে কিছু বিলম্ব ছিল। শুভা তাড়াতাড়ি তা'র প্রসাধন শেষ করিয়া একখানা মোটা চাদর গায় মুড়িয়া মেয়েদের বসিবার জায়গায় উপস্থিত হইল। চপলাকে ঝি ডাকিয়া দিল। একটু নিভৃত স্থানে গিয়া চপলা নিজের ছেলেকে শুভার পায়ের কাছে রাখিয়া শুভার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আমাকে দয়া কর, আমার ছেলেটার মুখের দিকে চাও, আমাদের দু'জনকে প্রাণে মেরো না।"

শুভা তাড়াতাড়ি তাহাকে উঠাইয়া ছেলেটীকে কোলে করিয়া চুম্বন করিল, বলিল "কেন বোন, কি হ'য়েছে! পায় ধরছো কেন? ছি!"

চপলা বলিল, "তোমার প্রাণে দয়া আছে জানি, নইলে তুমি বাড়ী খানা আমার নামে লিখে দিতে না। তোমার বাড়ী তুমি নেও ভাই, আমার স্বামী আমাকে ফিরে দেও, নইলে আমি বাঁচবো না। আমার ছেলে বাঁচবে না। তোমারো তো ছেলে আছে, তা'র কথা মনে করে আমার ছেলের দিকে চাও।"

শুভা একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। অন্ধকারে নিঃশঙ্ক-চিত্তে পথ চলিতে চলিতে একটা বিদ্যুতের চমকে পায়ের কাছে কাল-সাপ দেখিলে লোকে যেমন চমকিত হয়, তেমনি চমকিয়া সে আবিষ্কার করিল যে নগেনের সহিত তার নির্দ্দোষ সাহচর্য্য সেটা মোটেই নির্দ্দোষ নয়। সে আবিষ্কার করিল, তাহাদেরই ভুল হইয়াছে, এই যুবতী তা'র অন্ধ সংস্কার লইয়াই তাহাদের সম্বন্ধটা ঠিক ভাবে নির্ণয় করিয়াছে। বাস্তবিক তা'রা প্রেমলীলায় মত্ত আছে, আর সে প্রেমলীলার পরিণতি ভীষণ! এই চপলা ও তাহার শিশুপুত্র তাহাদের এ প্রেমযজ্ঞের আহুতি! ছি! ছি! এ কি সর্ব্বনাশ সে আবার করিতে বসিয়াছে?

সে বালকের মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "না বোন আমার ছেলে নাই, কিন্তু এই আমার ছেলে। আশীর্ব্বাদ করি বাছার যেন পায় কাঁটাটিও না

কোটে। তুমি জন্ম জন্ম স্বামী সুখে সুখী হও। কাল থেকে তোমার স্বামী আমার চুলের ডগাটিও দেখতে পাবেন না। তুমি নিশ্চিন্ত হও।" বলিয়া সে শিশুকে মায়ের কোলে দিয়া খুব তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল।

শুভা খুব খানিকটা কাঁদিল। তার যেন মনে হইল তার সব গেল। চপলা শুভাকে তাহার দিকে ও তাহার ছেলের দিকে চাহিতে বলিয়াছিল, কিন্তু শুভার মনে হইল, হতভাগিনী শুভার দিকে কে চাহিবে। যখন দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িল তখনও শুভা খুব পেছনের একটা উইংয়ের আড়ালে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে। ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি গ্রীণরূমে গিয়া মুখ ধুইয়া তা'র প্রসাধন সম্পূর্ণ করিয়া ষ্টেজে প্রবেশ করিল।

[৩২]

কলিকাতা সহরময় হৈ হৈ পড়িয়া গেল। শুভা আবার বেমালুম নিরুদ্দেশ হইয়াছে। নানা জল্পনা কল্পনা, নানা আজগুবী গুজব রটিয়া গেল। পুলিশ সন্ধান পাইয়া কিছু দিন খোঁজ তল্লাস করিল, হুলিয়া দিল, তার পর সব চুপ চাপ হইয়া গেল। শুভা যাইবার আগে জগৎ-ডাক্তারের নামে একখানা দশ হাজার টাকার চেক পাঠাইয়া দিয়া গিয়াছিল, আর তাহার পুস্তক প্রকাশকদের কাছে লিখিয়া দিয়াছিল যে তাহার প্রাপ্য সমস্ত টাকা যেন জগৎ ডাক্তারকে দেওয়া হয়। সুরেশ বাবুকে সে একখানা চিঠি লিখিয়া গিয়াছিল, তাহাতে সে বার বার ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তাঁহাকে তাহার সমুদয় আসবাব ও অলঙ্কার লইতে বলিয়া দিয়াছিল। কিছুদিন পর্য্যন্ত ব্যাঙ্ক চেকের টাকা দেওয়া বন্ধ রাখিয়াছিল, পুলিশও তাহার বাড়ীতে তালাবন্ধ করিয়াছিল। তার

পর ব্যাঙ্কের ম্যানেজার জগৎ ডাক্তারকে ডাকাইয়া টাকা দিয়া দিল এবং পুলিসের লোক সুরেশ বাবুকে ডাকিয়া আনিয়া সমুদয় জিনিস-পত্র বুঝাইয়া দিল। রহস্য কেহ বুঝিতে পারিল না।

সংবাদ শুনিয়া নগেন একেবারে বসিয়া পড়িল। সেদিন সে সকাল সকাল আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া আপনার ঘরের ভিতর গোঁজ হইয়া বসিয়া রহিল, আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতে লাগিল। কিছুই ভাল লাগিল না। তার পর সে শুভার অপূর্ব্ব নাটক "স্বপ্নী" খানা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে তার চক্ষু অযথা অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পর চপলা আসিয়া তার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল।

এতক্ষণ চপলা স্বামীর কাছে আসে নাই। শুভা নিরুদ্দেশ হইয়াছে এই সংবাদই শুনিয়াই ত'র প্রাণটা ছাৎ করিয়া উঠিয়াছিল সব কথা শুনিয়া তাহার সন্দেহ রহিল না যে শুভা আত্মহত্যা করিয়াছে। তার সমস্তটা মন ধিক্কারে ভরিয়া উঠিল। সে নিজের উপর রাগ করিয়া চুল ছিঁড়িতে লাগিল। স্বামী যখন আফিস হইতে আসিলেন তখন তফাৎ হইতে তাঁর মুখ দেখিয়া তার বুক ফাটিয়া গেল, সে হাত কামড়াইতে লাগিল—হায় হায় কেন এমন দুর্ব্বুদ্ধি তা'র হইয়াছিল! স্বামীর কাছে আসিতে তার সাহস হইল না। শেষে অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া সে সন্ধ্যার সময় স্বামীর ঘরে গিয়া তাহার পায়ের তলায় বসিয়া পড়িল।

মাটীর দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে সে বলিল "কি ভাবছো? শুভার কথা?"

নগেন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল। চপলা একবার তার মুখের দিকে চাহিয়া আবার মুখ নীচু করিয়া শান্তভাবে বলিল, "আমি জানি শুভার কি হ'য়েছে।"

নগেন সোজা হইয়া বসিল, সমস্ত হৃদয় মন চক্ষুকর্ণে সংহত করিয়া সে স্ত্রীর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল।

চপলার চক্ষু ভরিয়া উঠিল, কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে বলিল, "তুমি আমায় মেরে ফেল, নয় চাবুক মেরে বাড়ী থেকে বের করে দেও। ওগো আমিই যে তাকে মেরে ফেলেছি। কেন আমার এ দুর্ম্মতি হ'য়েছিল।"

নগেন তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল, পায়ের তলায় দুষ্ট সর্প দেখিলে যেমন লোকে সরিয়া দাঁড়ায় সে তেমনি করিয়া দাঁড়াইল, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সে বলিল, "কি বল্লে? ভাল ক'রে বল, আমায় বুঝিয়ে বল। ওরে সর্ব্বনাশী তুই কি করেছিস্ বল্।"

চপলা ঠিক তেমনি বসিয়া রহিল, ধীরে ধীরে সে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। কথা শুনিতে শুনিতে নগেনের মুখের কঠিনতা কাটিয়া গেল। শেষে চপলা বলিল, "আমার মত পাপিষ্ঠার বেঁচে থাকতে নেই, আমি নিজে বাঁচবো ব'লে তা'কে মেরে ফেলেছি, তোমার মনে কি বিষম দাগা দিয়েছি! তুমি আমায় মেরে ফেল।" বলিয়া স্বামীর পায়ের কাছে ভূমিতে লুটিয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

চপলার দীর্ঘ আত্মনিবেদন শুনিতে শুনিতে নগেনের মনে যেমন একদিকে শুভার জন্য দারুণ শোক প্রাণে উদ্বেলিত হইল, তেমনি আর একদিকে তার নিজের উপর ধিক্কার জাগিয়া উঠিল। সে নিজেকেই শুভার অপমৃত্যুর জন্য দায়ী করিল। আর তা ছাড়া তা'র এই কয়দিনের আত্মবঞ্চনার আবরণ একেবারে খসিয়া পড়িল—সে মনে মনে আপনাকে চাবুক মারিতে লাগিল। আত্মসুখে অন্ধ হইয়া সে চপলাকে এত দুঃখ দিয়াছে ভাবিয়া তাহার দুঃখ হইল। সে পাপ হইতে আপনাকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই বলিয়া নিজের উপর তাহার রাগ হইল। সমস্ত হৃদয়

জুড়িয়া একটা আকুল ক্রন্দন তাহার প্রাণের ভিতর বাজিয়া উঠিল। সে চপলাকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিল, "চপলা, তোমার কোনও দোষ নাই, দোষ আমার। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।" চপলা স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া কেবলি কাঁদিতে লাগিল। নগেনও কাঁদিল। বুকে বুক রাখিয়া দু'জনে অনেকক্ষণ কাঁদিয়া যখন শান্ত হইল, তখন তাদের দু'জনেরই হৃদয়ে অবশিষ্ট রহিল কেবল শুভার জন্য গভীর শান্ত বিষাদ ;—আর এক ফোঁটা সন্দেহ বা অবিশ্বাসের মলা রহিল না।

শুভার স্বার্থত্যাগ এতদিনে সার্থক হইল।

[৩৩]

শুভা চলিয়া যাওয়ার কয়েকদিন পরে নিবারণ মৈলীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মৈলী, তুমি তোমার এ বন্ধুটীকে পেয়েছিলে কোথায় ?"

মৈলী শুভার সহিত তাহার পরিচয়ের ইতিহাস জানাইল। নিবারণ গম্ভীর হইয়া রহিল।

মৈলী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এঁকে দেখেছ নাকি ?"

নিবারণ চট্ করিয়া উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে বলিল "হুঁ"। মৈলীর কাছে কথাটা স্বীকার করিতে নিবারণ একটু কুণ্ঠিত বোধ করিতেছিল।

মৈলী তীক্ষ্নদৃষ্টি নিবারণের মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া রহিল। তার পর বলিল, "উনি বল্‌ছিলেন উনি তোমায় চেনেন! তুমি চেন নাকি ?"

নিবারণ আবার একটু ভাবিয়া বলিল, "চিনি বলে বোধ হ'ল। তা নাও হ'তে পারে।"

"উনি তোমার কে হন ?"

"কেহই না।"

মৈলী সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "আশ্চর্য্য, অথচ উনি বল্লেন, তুমি ওঁর খুব নিকট আত্মীয়।"

নিবারণ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "খুব নিকট আত্মীয় হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বাস্তবিক ও আমার কেউ নয়।"

মৈলীর মনের অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিল। সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "বুঝতে পারলাম না। সম্পর্ক হওয়া উচিত ছিল অথচ নাই এ কথার মানে কি?"

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নিবারণ বলিল, "আমার অতীত জীবনের সে সব কথা শুনে তোমার লাভ কি মৈলী?"

মৈলী তখন গম্ভীর হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ দু'জনে আর কোনও কথা বলিল না। আর একদিন মৈলী বলিল, "তুমি আমার সঙ্গে সম্বন্ধের জন্য কি লজ্জা বোধ কর?"

এই সোজা প্রশ্নটার সোজা জবাব নিবারণ দিতে পারিল না, সে বলিল, "একথা কেন মৈলী?"

"আচ্ছা বলই না।"

"কি বলবো, আমি যদি লজ্জা বোধ করি তবে তো আমার নরকেও স্থান হবে না। আমি যে মানুষ হ'য়েছি সে তো একরকম তোমারি

"একথা বুক ফুলিয়ে দশজনের কাছে ব'লতে পার সে সাহস তোমার আছে?"

"না থাকলে আমি মানুষ নই।"

"আচ্ছা, একটা কথা ব'লবো, রাখবে?"

"কি কথা?"

"তুমি একবার আমাকে তোমার দেশে নিয়ে চল।"

নিবারণ গম্ভীর হইয়া কিছুক্ষণ ভাবিল। সে ভাবিল মৈলীর তার আবেষ্টন সম্বন্ধে এমন অনাবশ্যক কৌতূহল কিসের জন্য? সে স্থির করিল যে শুভার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ বিষয়ে মৈলীর একটা নিদারুণ সন্দেহ হইতে একটা অবিশ্বাসের ভাব আসিয়াছে, তাই এই কৌতূহল। ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল তার সব কথা খুলিয়া বলাই ভাল।

নিবারণ অনেকক্ষণ পর বলিল, "দেশে ফিরবার আমার উপায় নাই মৈলী।"

"কেন? তুমি কোনও ফেরারী আসামী না কি?"

নি। না তা' নই, আমার দেশে বড় কলঙ্ক হ'য়েছে। আমার স্ত্রী আমার গৃহত্যাগ করে গেছে তাই আমার সেখানে মুখ দেখাবার উপায় নাই।

মৈলী বলিল, "বাঃ! তোমার স্ত্রী তোমার ঘর ছেড়ে গেছে তার জন্য লজ্জা নিন্দা তা'র, তোমার তা'তে কি?"

নিবারণ ভাবিল, এ অসামাজিক বন্যা হরিণীকে সমাজের বাঁধন কেমন করিয়া বুঝাইবে। ভাবিতে ভাবিতে তার মনে হইল, কথাটা মিথ্যা নহে, স্ত্রী গৃহত্যাগ করিয়াছে বলিয়া স্বামীর লজ্জা বা কলঙ্ক সমাজের একটা উদ্ভট সংস্কার মাত্র, ইহার বাস্তবিক হেতু কিছুই নাই। অপরাধ স্ত্রীর। স্বামী সে জন্য লজ্জিত হইবে কেন? কথায় কথায় মনে হইল, তার বেলায় অপরাধটা কি কেবলই স্ত্রীর? শুভা মানুষ এমন কিছু মন্দ ছিল না। সেই তো তার উপর অত্যাচার করিয়া তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। নিতান্ত অন্যায় ভাবে বিনা অপরাধে সে যে পদাঘাত করিয়াছিল, তা'র জন্য পরে সে অনুশোচনা করিয়াছে; সেই পদাঘাতটা আজ তার বুকের ভিতর

বাজিতে লাগিল। ক্রমে তা'র সমস্ত বিবাহিত-জীবনের ইতিহাসটা সে তার মনে মনে আবৃত্তি করিয়া গেল, সে ইতিহাস তা'র কাছে যতই খারাপ বোধ হইতে লাগিল, শুভার অপরাধটা তার চক্ষে ততই লঘু বোধ হইল।

মৈলীর কথায় নিবারণের মনে আকাশ পাতাল চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইল। সে চিন্তার অন্তর্ধারা তাহার মনের তলায় বহিতে লাগিল, মুখে সে মৈলীর সঙ্গে কথা বলিয়া গেল।

সে মৈলীর প্রশ্নের উত্তরে বলিল, "কেনযে স্বামীর লজ্জা বা কলঙ্ক হয় তা' আমি তোমাকে বুঝাতে পারবো না, কেন না আমি নিজেই তা' বুঝি না; কিন্তু আমাদের সমাজের এমনি সংস্কার যে, স্ত্রী গৃহত্যাগ ক'রলে স্বামীর একটা কলঙ্ক। তার কারণ বোধ হয় এই যে, স্বামী-স্ত্রী আমাদের সমাজে পরস্পরের এতটা সম্পূর্ণ আপন হ'য়ে যায় যে একজনের দোষ আর একজন ঠিক পরের দোষ বলে' ভাবতে পারে না।"

মৈলীর মনে হইল এটা বাজে ওজুহাত। আসল কথা তাহাকে দেশে লইয়া যাইতে নিবারণের সাহস নাই। সে এ কথা আর তুলিল না; কিন্তু নিবারণের কথাটা ধরিয়া সে বলিল, "আচ্ছা সে কেমন মেশামিশি হয়? স্বামী-স্ত্রীতে দু'জনে একেবারে একজন বলে' মনে হয়, না? আচ্ছা, তোমার আমার সম্বন্ধে তেমনি মনে হয় কি?"

নিবারণও তাই ভাবিতেছিল, "হয় কি?" সে বলিল, "হয়।" কিন্তু তা'র মনটা ঠিক এ কথায় সায় দিল না। মৈলীকে সে ভালবাসে সত্য, কিন্তু সে ভালবাসায় এই সম্পূর্ণ একাত্মভাব ঠিক যেন নাই, একটা কিসের যেন বাধা, কি একটা অন্তরায় যেন তাহাদের মধ্যে আছে।

পরে নিবারণ বলিল, "তুমি মনে ক'রছ মৈত্রী, যে লোকের কাছে তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ স্বীকার ক'রতে কুণ্ঠিত হচ্ছি বলেই আমি তোমাকে দেশে নিতে চাচ্ছি না। তা' সত্যি নয়। দেশে বাস্তবিক পক্ষে ব'লতে গেলে আমার আপনার লোক কেউ নেই। আজ প্রায় আট বৎসর আমি দেশ ছাড়া। তবু তুমি যদি ইচ্ছে কর তোমাকে আমি আমার দেশে নিয়ে যা'ব। আর, সামনের বছর যখন ক'লকাতায় যাব, তখন তোমাকে ক'লকাতায় নিয়ে যাবই।"

এ কথায় মৈত্রী খুব খুসী হইয়া গেল না। কি যেন একটা তা'র মনের ভিতর কেবলই খোঁটা মারিতেছিল যার জন্য সে নিবারণের কোন কথায়ই এখন সুখী হইতে পারিতেছিল না। এতদিন যে বর্ত্তমানের স্নেহ সম্বন্ধই তাহার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া সে তৃপ্ত ছিল, এখন যেন তাহাতে তাহার মন ভরিতেছিল না। অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য এই বর্ত্তমান তার কাছে একান্ত শূন্য বোধ হইল। তার প্রেমাস্পদের সবটুকু না পাইয়া সে যেন কিছুই পায় নাই বলিয়া মনে হইল। সে হঠাৎ অনুভব করিতে লাগিল যে, তাদের এই সম্বন্ধ দু'দিনকার সম্বন্ধ, এর মধ্যে স্থায়িত্বের কোনও উপাদান নাই। এটা যেন তার কাছে একটা ফাঁপা জিনিস বলিয়া মনে হইল, ইহার ভিতর একটা সার পদার্থ যাহা থাকিলে তাহার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইত, সেইটা যেন নাই!

শুভার মুহূর্ত্তের আবির্ভাবের ফলে এই প্রেমিকযুগলের মনে এইরূপে একটা নূতন ভাব ও চিন্তার ধারা প্রবাহিত হইল। দু'জনেই একটা অতৃপ্ত ও অশান্তি অনুভব করিল। নিবারণের ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলই শুভার কথা মনে হইতে লাগিল। এবার

এক মুহূর্ত্ত মাত্র সে শুভাকে দেখিয়াছিল, কিন্তু তাহার মনে যেন সেই এক মুহূর্ত্তের দেখা মূর্ত্তি তার চিরপরিচিত শুভার মূর্ত্তিকে একেবারে ছাইয়া ফেলিল। তাহার মন তাহার অজ্ঞাতসারে এই মূর্ত্তির প্রতি আকৃষ্ট হইল, এবং এই মূর্ত্তিই অন্তরালে থাকিয়া তাহার মনশ্চক্ষে শুভার অতীতের সব অপরাধ যেন ক্রমে ক্রমে মুছিয়া ফেলিতে লাগিল। হঠাৎ যখন নিবারণ আবিষ্কার করিল যে, সে এতদিনে তার নিগৃহীত পলায়িত-পত্নীকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে পরনারীর মত দুর্লভ হইয়াই যেন তাহার মনকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে, তখন সে লজ্জিত হইয়া উঠিল। শুভাকে ভালবাসিয়া সে মৈলীর প্রতি অবিশ্বাসী হইতেছে এই ভাবিয়া সে ভীত হইল। সে মনকে ফিরাইয়া নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাহার বর্ত্তমান আবেষ্টনের মধ্যে বাঁধিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল। এই চেষ্টায়ই সে আরও বিশেষভাবে টের পাইল যে, তাহার ও মৈলীর সম্বন্ধের মধ্যে এমন কোনও নিত্য সামগ্রী নাই যাহাকে আশ্রয় করিয়া বিদ্রোহী-হৃদয়কে চাপিয়া রাখা যায়। তবু সে প্রচণ্ড ভাবে বাঁধিয়া রাখিতে যত্ন করিল।

কয়েক মাস পরে শীতকালে নিবারণ মৈলীকে লইয়া কলিকাতায় গেল। মৈলী খুব অল্প-বয়সে একবার তার পালয়িত্রীর সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়াছিল, তখন সে বড় বেশী কিছু দেখে নাই, যাহা দেখিয়াছিল তাহা তার বড় মনেও ছিল না। নিবারণ এবার একমাস ভরিয়া তাঁহাকে লইয়া কলিকাতার যাহা কিছু দেখিবার আছে দেখাইল। শীতের সময় কলিকাতা আমোদ-প্রমোদে ভরপুর হইয়া থাকে, তার কোনও আমোদ-প্রমোদই মৈলীর বাদ গেল না। দিনের পর দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া সে সর্ব্বদা থিয়েটার বায়স্কোপ প্রভৃতি

দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে এই সব আনন্দের নেশায় একেবারে মশগুল হইয়া রহিল। এলবার্ট থিয়েটারে তখন "দ্বয়ীর" মরসুম চলিয়াছে—নিবারণ সেখানে যাইতেও ভুলিল না। তাহাদের কলিকাতা বাসের শেষ দিন তাহারা "দ্বয়ী" দেখিতে গেল। পরের দিন দার্জ্জিলিঙ্গ মেলে তাহারা ফিরিয়া গেল।

ট্রেণে নিবারণ মৈত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "'দ্বয়ী' নাটকটা কেমন লাগলো।"

"চমৎকার—কি বা সীনের বাহার, কি সব সাজ-সজ্জা আর কি বা অভিনয়—ভারি সুন্দর!"

"শোভনার পার্ট যে অভিনয় করলে, তা'কে দেখেছ?"

"দেখেছি, সে কি সুন্দর! আর গায় কি!"

"ওকে চেন?"

"কই না, মনে তো পড়ে না।"

"ওই তোমার সেই বন্ধু শুভা।"

"তাই নাকি?" বলিয়া সে তাহার বিস্মিত-দৃষ্টি নিবারণের মুখের উপর রাখিল। "শুভা তবে থিয়েটারের একট্রেস।"

"হাঁ, কিন্তু শুধু একট্রেস নয়, নাটকখানা লিখেওছে সেই। বইখানার নাকি ভয়ানক সুখ্যাতি হ'য়েছে।"

"বটে? তুমি আমায় ক'লকাতায় থাকতে বল্লে না। আমি তার সঙ্গে দেখা করতাম।"

গম্ভীর ভাবে নিবারণ বলিল, "তুমি তা'র সঙ্গে দেখা কর এটা আমার ইচ্ছা ছিল না, তাই বলি নি। জান শুভা কে?"

"না তুমি তো বলনি।"

"ওই আমার স্ত্রী।"

একটা বজ্রপাতে মৈলী এতটা স্তব্ধ হইত কি না সন্দেহ। শুভাকে কেন্দ্র করিয়া নানা রকম সন্দেহ সে করিয়াছে কিন্তু এই সন্দেহের কথাটা কখনো তাহার মনে হয় নাই। সে কিছুক্ষণ কেবল তার অনায়ত উজ্জ্বল চক্ষু দু'টি যথাসম্ভব বিস্ফারিত করিয়া নিবারণের দিকে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ তাহারা কোনও কথা কহিল না।

ইহার পর মৈলী অনেকদিন নিবারণকে শুভার সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে, নিবারণও যথাসম্ভব সংক্ষেপে এবং যতদূর সম্ভব সহজ ভাবে তাহার সকল কথার উত্তর দিয়াছে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি মৈলীর আসল খবরটা জানিতে বেশী বিলম্ব হইল না। কয়েক মাস যাইতে না যাইতেই সে বুঝিল যে, এই পলায়িতা অপরাধিনী-পত্নীর উপর নিবারণের মন বিমুখ নয়। সে তখন শুভার সমস্ত কথাবার্ত্তা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া সাব্যস্ত করিল যে, শুভাও স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া সুখী নয়। ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিল, সে ইহার প্রতিকার করিবে। সে স্বামী স্ত্রীর পুনর্ম্মিলন ঘটাইয়া দিবে। তাহা হইলে তাহার কি হইবে? সে কথা একবার সে ভাবিল, কিন্তু সে চিন্তায় তাহার সংকল্প টলিল না। দ্বয়ী নাটক শুভা যে ভাবে সমাপ্ত করিয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া তাহার আশা হইল, শুভা তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিবে না। কিন্তু যদি তা না হয়, শুভা যদি তাহাকে ভগিনীরূপে গ্রহণ করিতে না পারে তবে তাহার দাঁড়াইবার স্থান নাই সে কথা সে ভাবিল। নিবারণের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ তো বালির প্রাসাদ, তাহাতে তাহার কোন স্থায়ী আশ্রয় কোথাও নাই তাহা সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল; তাহাতে দুঃখিত হইল, কিন্তু সংকল্পচ্যুত হইল না।

অনেক দিন পীড়াপীড়ি করিয়া সে পরের বৎসর শীতকালে আবার নিবারণের সঙ্গে কলিকাতায় গেল। সেখানে গিয়া প্রথমেই সে শুভার সন্ধান করিল। শুনিতে পাইল শুভা নিরুদ্দেশ হইয়াছে। মৈলী বড় নিরাশ হইল।

'এদিকে নিবারণ উকীলের বাড়ী হাঁটাহাঁটি আরম্ভ করিল। মৈলীর সঙ্গে তার সম্বন্ধটা পাকাপাকি করিয়া তাহার হৃদয়কে বাঁধিবার একটা স্থায়ী বন্ধন সৃজন করিবার জন্য সে অস্থির হইয়া গেল। উকীলদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সে বুঝিল, এ কার্য্য সহজ নহে। হিন্দুশাস্ত্র মতে সে পুনরায় বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু মৈলীকে হিন্দু মতে বিবাহ অসম্ভব। সিভিল ম্যারেজ এক্ট মতে সে স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে বিবাহ করিতে পারে না, অথচ তাহার হিন্দুশাস্ত্র মতে বিবাহিত-পত্নীকে সে ডাইভোর্স করিতে পারে না। পাহাড়ী ব্যবহার অনুসারে মৈলীর সঙ্গে তার বৈধবিবাহ হইতে পারে, কিন্তু সে যখন পাহাড়ী নয় তখন তার বেলায় সে ব্যবহার খাটিবে কি না সন্দেহ। ঠিক পাকাপাকি ভাবে বিবাহ করার দুইটি মাত্র উপায় উকীল বাহির করিতে পারিলেন। নিবারণ যদি খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করে তবে সে ইণ্ডিয়ান ডাইভোর্স এক্টের নূতন বিধান অনুসারে তাহার কুলত্যাগিনী স্ত্রীকে ডাইভোর্স করিতে পারে। তাহার পর সে খৃষ্টীয় বিধান অনুসারে মৈলীকে বিবাহ করিতে পারে। আর এক উপায়, তাহাদের উভয়ের মুসলমান হইয়া বিবাহ করা।

নিবারণ শুনিয়া বুঝিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। সে কোনও কিছু না করিয়া কলিকাতা হইতে ফিরিয়া গেল। অনিশ্চিত অবস্থায় তাহার অনেক দিন কাটিয়া গেল।

একদিন নিবারণ এই কথাই বসিয়া ভাবিতেছে, এমন সময় একটা লোক আসিয়া তাহাকে ডিব্রুগড় কোর্টের দুইখানা সমন দিয়া

গেল। সমন তাহার এবং মৈলীর নামে। সমন এবং আরজী পড়িয়া সে জানিল যে শুভা খৃষ্টান হইয়াছে এবং খৃষ্টান হইয়া সে স্বামীর বিরুদ্ধে বিবাহ সম্বন্ধ ছেদনের জন্য নালিশ করিয়াছে। ওজুহাত মৈলীর সঙ্গে অবৈধ প্রণয় এবং পত্নীত্যাগ।

নোটিশ পাইয়া সে প্রথম ভ্রূকুঞ্চিত করিল। পরে সে রীতিমত সহী করিয়া তাহার নিজের ও মৈলীর নামের সমন রাখিয়া দিল।

নিবারণ একটা মুক্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল। শুভাই যে তাহাকে ডাইভোর্স করিবার আয়োজন করিতেছে বুঝিয়া যেন সে একটু স্বস্তি বোধ করিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বেশ তীব্র জ্বালাও বোধ করিল। এতদিনেই সে সত্য সত্য শুভাকে হারাইল, ভাবিয়া তাহার প্রাণে ব্যথা লাগিল।

নিবারণ হাজির হইল না। তাহার অসাক্ষাতে শুভার আবেদনে ডাইভোর্সের ডিক্রী হইয়া গেল, নিবারণ ও শুভার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইল।

মৈলী এসব কথা কিছুই জানিত না। ডিক্রীর কিছুদিন পরে সে শুভার একখানা চিঠি পাইল। শুভা লিখিয়াছে,

"ভাই মৈলী,

তুমি বোধ হয় এতদিনে শুনিয়াছ আমি কে। আমি তোমার সুখের সংসার দেখিয়া অবধিই ভাবিতেছিলাম যে ইহাকে ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে আমি ধন্য হইব! সে পথে অন্তরায় ছিলাম আমি। তাই আমি আমার বিবাহ ভঙ্গ করিয়া আমার স্বামীকে মুক্তি দিয়াছি। আমার স্বামী ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার ছিলেন কিন্তু তিনি বাস্তবিক তোমারই। তোমার হাতে আজ তাঁহাকে সকল বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলাম। আমার আশা আছে তুমি তাঁহাকে বিবাহ করিয়া জন্ম-জন্মান্তরে পতি

সুখে সুখী হইবে। জগদীশ্বর তোমাদের ধর্ম্মমিলন মঙ্গলময় করুন। ইতি। তোমার বন্ধু শুভা।"

আশ্চর্য্যের বিষয় মৈলী চিঠি পড়িয়া কাঁদিল। এই শুষ্ক অক্ষর গুলির ভিতর শুভা যে কতখানি বেদনা ঢালিয়া দিয়াছিল মৈলীর নারীহৃদয়ে তাহা অনুভব করিল। তাহার সুখের জন্য শুভা যে কতটা ত্যাগ স্বীকার করিল তাহাও বুঝিতে তার বাকী রহিল না, তাই সে কাঁদিল। কিছুদিন পরে নিবারণ তিন আইন অনুসারে মৈলীকে বিবাহ করিল।

[৩৪]

শুভা আজ সকল বন্ধন মুক্ত। তাহার অতীত জীবনের সকল সম্বন্ধ চুকিয়া গিয়াছে—আজ সে এ জগতে নিঃশেষ ভাবে একা।

যেদিন সে তাহার বাড়ী হইতে নিরুদ্দেশ হয়, তখন সে বরাবর মাদার ক্রিশ্চিয়ানার কাছে গিয়াছিল। মাদার তাহাকে দীক্ষা দিয়া তাহাকে সন্ন্যাস ব্রতের শিক্ষানবীশ করিয়া দিলেন, সে সমস্ত সংসার ভুলিয়া একান্ত মনে জপ ধ্যান প্রার্থনা ও বাইবেল পাঠে আপনাকে নিবেদন করিয়া দিল। সব চিন্তা সব বেদনা সে জোর করিয়া মন হইতে সরাইয়া ভগবৎপদে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া দিল। সে একান্ত ভাবে সাধনা করিয়া মাদার ক্রিশ্চিয়ানার মত ভক্তি ও বিশ্বাস লাভ করিবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু মন ইহাতে ভরিল না। যে বাইবেলের অনেক কথা এখন সে ভ্রান্ত বলিয়া জানিত, তাঁহাকে ঈশ্বরের বাণী বলিয়া বিশ্বাস করিতে সে পারিল না। তা ছাড়া রোমান-ক্যাথলিক উপাসনা পদ্ধতির সঙ্গে সে বাইবেলের উপদেশের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিল না। সে অনেক

পাঠ করিল, অনেক উপদেশ গ্রহণ করিল, অনেক আলোচনা করিল কিন্তু এই অনুষ্ঠানবহুল ধর্ম্মকে সে নিজের ধর্ম্মবিশ্বাসের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে পারিল না।

সে বিরক্ত হইয়া তিন মাস পর কনভেণ্ট ত্যাগ করিয়া ফ্রী মিশন হাউসে গিয়া ভর্ত্তি হইল। প্রথম প্রথম এখানে আসিয়া সে অনেকটা তৃপ্তি লাভ করিল। তাহার মনে হইল এতদিনে সে সত্য ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের সন্ধান পাইয়াছে। সে একাগ্র নিষ্ঠার সহিত সাধন ও উপাসনা করিতে লাগিল, নানা প্রকারের ধর্ম্মসাহিত্য পাঠ করিতে লাগিল। কনভেণ্টে থাকিতে যে সকল গ্রন্থ তাহার পক্ষে অলভ্য ছিল ফ্রী মিশনের মুক্তবায়ুতে সে সেই Higher criticism এর গ্রন্থ এবং সঙ্গে সঙ্গে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে তার তৃপ্তি কাটিয়া গিয়া তাহার মনে একটা গুরুতর অসন্তোষ জাগিয়া উঠিল। দর্শন শাস্ত্র পড়িয়া সে দেখিল যে, যে সকল সমস্যার সমাধান সে এত দিন বাইবেলে খুঁজিয়াছে, স্বাধীন-চিন্তায় তাহার সমাধানের একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রণালী আছে। দর্শন Higher Criticism পড়িয়া তাহার মনে হইল যে বাইবেল সত্য সত্যই অভ্রান্ত নহে। দার্শনিকদেরও যেমন ভুল ভ্রান্তি আছে বাইবেলের শিক্ষার মধ্যেও তেমন ভুল না থাকিবার কোনও হেতু সে খুঁজিয়া পাইল না। অনেক স্থানেই সে বাইবেলের উপদেশে তৃপ্তি পাইত কিন্তু এমন স্থানও বাইবেলে আছে, যাহা তাহার মনে মোটেই লাগিত না এবং যুক্তিতে টিকিত না। যীশুখ্রীষ্ট যে একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ এবং ঈশ্বরের প্রেরিত দুত এ বিষয়ে তাহার কোনও দিন সন্দেহ নাই, কিন্তু ঈশ্বরের ত্রিত্ব ও যীশুখ্রীষ্টের মেশায়াত্ব সে কিছুতেই নিজের যুক্তির সঙ্গে মিলাইতে পারিত না। এমন কি এই বিষয়ে স্পীনোজা, হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকের যুক্তিও তার কাছে গোঁজামিল বলিয়া বোধ হইত।

কিন্তু শুভা অনেকটা শান্তি লাভ করিল। তাহার সাংসারিক জীবনের যে একটা ব্যস্ত অশান্ততা ছিল, যে একটা অপূর্ণতার অসন্তোষ তাহার সমস্ত জীবন ব্যাপ্ত করিয়াছিল, তাহা একেবারে দূর হইয়া গেল। সে সংসার ছাড়িয়া আসিয়া এক অপূর্ব্ব বৈরাগ্যের ভাবে পূর্ণ হইয়াছিল। বাইবেলের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা কমিলেও Imitation of Christ এর প্রতি তাহার ভক্তি ও নির্ভর অক্ষুণ্ণ ছিল। দিবা রাত্রি সে এই মধ্য-যুগের খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব মহিমাপূর্ণ চিন্তা ও ভাবে তাহার হৃদয়কে ভরিয়া রাখিত। তাহার সেই পরিপূর্ণ আত্মবিলোপন এবং জগদীশ্বরের চরণে নিঃশেষে আত্মনিবেদন তাহার অহঙ্কারকে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ করিয়া, দিয়াছিল। দুঃখ আর তাহার দুঃখ বলিয়া মনে হইত না, বেদনা তাহার কাছে জগদীশ্বরের দয়ার দান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে কেম্পিসের ভাষায় নিরন্তর প্রার্থনা করিত "প্রভু বেদনাভরা যে ক্রুশ তুমি আমায় দিয়াছ তাহাই বহন করিবার শক্তি আমাকে দাও।" তাই তাহার নিজের কথা আর তার ভাবিতে ইচ্ছা করিত না।

আর এই এক নূতন ঐশ্বর্য্যময় বিশাল চিন্তার জগতে আসিয়া পড়িয়া তার নিজের কথা ভাবিবার তাহার অবসর রহিল না। সে অপার তত্ত্ব-সাগরের মধ্যে পড়িয়া, একেবারে হাবুডুবু খাইতে লাগিল। এক সত্যের সন্ধান করিতে করিতে আর এক প্রশ্ন তাহার মনে উঠিত, তাহার সমাধান করিতে যাইয়া আবার নানা নূতন পন্থার সন্ধান পাইত। দিন রাত পড়িয়া পড়িয়া সে আর অন্য কথা ভাবিবার অবসর পাইত না। সে একটা নেশার ঘোরের ভিতর দিয়া সত্যের সন্ধানে চলিতে লাগিল, তাহাতে সে সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃত হইল।

মিশনের অধ্যক্ষদিগের অধীনে তাহার শিক্ষাকার্য্য চলিতে লাগিল। সে কোন্ কাজ করিতে ইচ্ছা করে জিজ্ঞাসা করায় সে ভাবিয়া চিন্তিয়া

উত্তর করিল সে নার্স হইতে চায়। তখন তাহাকে নব প্রতিষ্ঠিত নার্স দিগের শিক্ষালয়ে রীতিমত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইল। জগৎ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সে এ বিদ্যা অনেকটা শিখিয়াছিল, এখন এ বিদ্যায় সে বিশেষ পারদর্শী হইল। তাহার কর্ম্মস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল আসামে।

আসামের পার্ব্বত্য প্রদেশে একটা নিভৃত উপত্যকার উপর একটি বৃহৎ স্বাস্থ্যাগার (sanatorium) আছে। নানা দেশ হইতে যক্ষ্মাদি কঠিন রোগে আক্রান্ত রোগী আসিয়া এই স্বাস্থ্যাগারে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করায়। বিশেষতঃ যক্ষ্মা রোগে এই প্রতিষ্ঠানের একটা বিশেষ খ্যাতি ছিল, এখানে আসিযা যক্ষ্মারোগী মরিত খুব কম।

শুভার গৃহত্যাগের বারো বৎসর পরে একটি বৃদ্ধ আসিয়া এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

বৃদ্ধ দীর্ঘকাল যক্ষ্মা-রোগে ভুগিয়া একেবারে অস্থিচর্ম্মসার হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আবার দীর্ঘ যাত্রার শ্রমে সে একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

যক্ষ্মাচিকিৎসাগারের অধ্যক্ষ এই বৃদ্ধকে আসিবামাত্রই একটি স্বতন্ত্র ঘরে লইয়া শয্যায় শোয়াইয়া দিয়া ঔষধ-পথ্যাদি দিয়া সুস্থ করিবার আয়োজন করিলেন। একটী সুশ্রুষাকারিণী তৎক্ষণাৎ তাহাকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল

বৃদ্ধ কতকটা সুস্থ হইয়াই বলিলেন, "শুভা কোথায়?"

চিকিৎসক বুঝিতে পারিলেন না। বৃদ্ধ বুঝাইয়া বলিলেন, "এই চিকিৎসাগারের Matronকে আমি দেখিতে চাই।"

"ও! সিষ্টার গ্রেস, তিনি শীঘ্রই আসিবেন' এখন তিনি স্কুলে গিয়াছেন। সেখান হইতে বরাবর তিনি এখানে আসিবেন।"

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্কুল! এখানে কি স্কুল আছে নাকি?"

"আপনি জানেন না? এত বড় অনুষ্ঠান এ দেশে নাই। এ একটা প্রকাণ্ড শিল্প-বিদ্যালয়, সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। দশ বছর আগে মিষ্টার গ্রেস দশটি ছেলে নিয়ে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন, আজ সেখানে সাতশ' ছেলে নানা রকমের শিল্প-শিক্ষা করে। এই স্কুলকে কেন্দ্র করে চারিদিকে একটা প্রকাণ্ড শিল্পিবস্তী বসে গেছে এবং তাদের জিনিসপত্র বিক্রীর জন্য কলিকাতায় একটা বেশ বড় রকমের দোকান আছে। সবই মিষ্টার গ্রেসের কল্পনা—তাঁর অনুষ্ঠান।"

বৃদ্ধের দুই চক্ষু গড়াইয়া জল পড়িল। তিনি ডাক্তারকে তন্ন তন্ন করিয়া স্কুল ও হাঁসপাতালের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, এবং যতই শুনিলেন ততই তাঁহার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

কথাবার্ত্তা শুনিতে শুনিতে খানিকটা সময় কাটিয়া গেল। ততক্ষণে শুভা আসিয়া উপস্থিত হইল। নূতন একটি রোগী আসিয়াছে শুনিয়া শুভা প্রথমেই তাহাকে দেখিতে আসিল। ঘরে প্রবেশ করিবার আগে দুয়ারে টাঙ্গান কার্ড খানিতে রোগীর বিবরণ পড়িল; নাম পড়িয়া সে চমকিত হইল, তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া রোগীকে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

রোগী কিছুক্ষণ অশ্রুপূর্ণ চক্ষু দু'টী শুভার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া রাখিল। এ বারো বৎসরে শুভার বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। কেবল দুই চারি গাছা চুল পাকিয়াছে এবং তাহার মুখ যেন একটা সম্পূর্ণ নূতন শান্ত-স্নিগ্ধ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া রোগী বলিলেন, "তোমার জীবন সার্থক হ'য়েছে শুভা!"

"সুরেশ বাবু! আপনার এই অবস্থা?" বলিয়া শুভা আসিয়া সুরেশ বাবুর বিছানার উপর বসিয়া তাঁহার হাত দু'খানা ধরিল। তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। সুরেশ বাবু বলিলেন, "অবস্থা এমন মন্দ কি

শুভা ? বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি হ'ল, এখন পাততাড়ি গুটোবার সময় হ'য়েছে। তাই তোমার কাছে ছুটে এলাম। জীবনে তোমাকে কাছে পেলাম না, তাই ব'লে তোমার কোলে কি ম'রতেও পাব না ?”

“ও কথা ব'লবেন না সুরেশ বাবু, এখনো আপনার মরবার কিছু হয় নি। প্রভু যদি দয়া করেন তবে আপনাকে সুস্থ ক'রে ফিরিয়ে দিতে পারবো ! প্রভুর দয়ায় আমার এখানে রোগী মরে খুব কম।”

“তাই ব'লেই তো জগৎ ডাক্তার এখানে আমাকে পাঠাবার জন্য এক বছর থেকে ঝুলোঝুলি কর'ছে। কিন্তু বাঁচবার লোভে এখানে আমি আসিনি, মরবার লোভে এসেছি। যে দিন জগৎ এসে আমায় গোপনে বলে' গেল, যে এখানকার সর্ব্বময়ী তুমি, সেই দিনই আমি স্থির করলাম যে, এখন আমার এখানেই আসতে হ'বে, বাঁচতে নয় শুভা, মরতে এসেছি আমি।”

শুভা হাসিয়া বলিল, “আচ্ছা সে দেখা যাবে এখন কার কথা ঠিক হয়। মরা বাঁচা তো আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, যা'র হুকুমে মরণ-বাঁচন তার হুকুম না পেলে আমি তো ছাড়ছিনে।”

এই স্নিগ্ধ হাসিতে শুভা সকল রোগীকে বাঁচাইয়া রাখিত। যখন দুঃখে তাহার বুক ফাটিয়া যাইত, তখনও সে বুক চাপিয়া হাসিমুখে রোগীকে সম্ভাষণ করিতে পারিত—আর সে হাসি রোগীকে তৃপ্তি দিত উৎসাহিত করিত। সুরেশ বাবুও এ হাসির সম্মোহিনী-শক্তি এড়াইতে পারিলেন না।

সুরেশ বাবু বলিলেন; “আচ্ছা সেই ভাল, এ প্রশ্নের উত্তর সেই তারই হাতেই থাক। আমি তোমায় শুধু দেখতে এসেছি। তোমায় দেখে যে কি আনন্দ হ'চ্ছে তা' কি বলবো শুভা ! তুমি সেই যে নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেলে, তার পর আর যে তোমায় কোনও দিন দেখবো তা' ভাবিনি

আজ যেন আমি আমার হারানিধি ফিরে পেয়েছি। আর তার চেয়েও বেশী সুখী হ'য়েছি, যে তোমার জীবন এত দিনে সত্য সত্য সার্থক হ'য়েছে। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি শুভা, তুমি সুখী হয়েছ তো?"

"ভগবান আমায় আনন্দ দিয়েছেন—এ আনন্দের অবধি নাই সুরেশ —আমার মনে এক ফোঁটাও দুঃখ নাই, অতৃপ্তি নাই?"

"কিছুই কি তোমার হয় নি ব'লে মনে হয় না, জীবনের কোনও অতৃপ্ত ইচ্ছা? কোনও আকাঙ্ক্ষা? কিছুই কি নাই।"

"না সুরেশ বাবু! যতদিন আকাঙ্ক্ষা ক'রেছি ততদিনই দুঃখ পেয়েছি। আজ আমি জানি যে আমার আকাঙ্ক্ষা করবার কোনও দরকার নাই। আমার কি চাই, আমাকে দিয়ে কি দরকার আছে তা' আমার চেয়ে পরমেশ্বরই বেশী জানেন। তাঁর কাজ তিনি আমাকে দিয়ে করিয়ে নেবেন, আমি আমার ইচ্ছা মতন তো তাকে ভাঙ্গতে গড়তে পারবো না। তাই সব কামনা তাঁর হাতে সঁপে দিয়ে, আমি নিশ্চিন্ত হ'য়েছি। এখন দেখতে পাচ্ছি, দিন রাত তিনি কর্ত্তব্য এনে আমার হাতের গোড়ায় ধ'রছেন, তাঁ'র আদেশ মাথায় তুলে নিয়ে সেই কর্ত্তব্য করে যাচ্ছি। আর কিছুই আমার চাই না।"

সুরেশ বাবু একটু অপ্রসন্ন হইলেন। বলিলেন "আমি একটা আশা করেছিলাম শুভা, যে মরবার মুখে আজ আমি তোমার মুখে শুনতে পাব যে তুমি আমার কথা একটিবারও ভেবেছ ... শুনাইল, ধর্ম্মালোচনা একটুও বেদনাবোধ আছে।" ... জন্য প্রস্তুত হইবার সহায়তা

"ভাবিনি কি সুরেশ বাবু? আ... লিলেন, "শুভা আমার মনে হ'চ্ছে এই যে অনুষ্ঠান আজ দেখছেন, ...া না, তাই শেষ একটা কথা বলে নি। ক'রতে পারছি এতো আ...নের কথা, যখন আমি তোমায় আমার কাছেই তো আমি শিক্ষা ...তুমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলে, বলেছিলে,

আমার নিজের এর মধ্যে কতটুকু কৃতিত্ব? বিশেষতঃ স্কুলে! যখনি আমি সেখানে যাই তখনি মনে করি এটা আপনার অনুষ্ঠান। আপনার প্রতি আমার মন কৃতজ্ঞতায় ভরে' উঠে। একদিনের তরেও আমি আপনার কথা ভুলতে পারিনি তো।"

কথাবার্ত্তার রকম-সকম দেখিয়া ডাক্তার উঠিয়া গেলেন। শুভা সুরেশ বাবুর সঙ্গে একা রহিল।

সুরেশ বাবু বলিলেন, "এ কথা শুনে আমার যে কি শান্তি বোধ হ'চ্ছে তা' কি ব'লবো। কিছুদিন হ'ল তোমার মত আমারও মনে একটা অসার্থকতার হাহাকার উঠেছিল। আমি এই অসুখ হওয়ার পর থেকেই কেবল মনে ভেবেছি যে আমি কেবল স্বপ্ন দেখেই গেলাম, কিছু কাজ আমার করা হ'ল না। আজ তোমার হাতে আমার স্বপ্নের সফলতা দেখে মনে হ'চ্ছে যে আমার জীবন একেবারে অসার্থক হয় নি।"

শুভা দেখিল, এরকম কথাবার্ত্তায় রোগীর মন শান্ত হওয়ার চেয়ে তার ব্যাকুলতা বৃদ্ধি হইবার বেশী সম্ভাবনা। তাই সে কথা ফিরাইয়া কলিকাতার খবর জিজ্ঞাসা করিল। জগৎ ডাক্তারের হাঁসপাতাল ও স্কুল বেশ চলিতেছে এ সংবাদ তাহার কাছে নূতন নয়, তার পুরাতন জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়াও গোপনে সে এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়াছিল। তাই আর কেউ না জানিলেও জগৎ ডাক্তার তাহার উৎসাহিত করিত। সেও জগৎ ডাক্তারের খবর জানিত।

পারিলেন না। শা উঠিল। সুরেশ বাবু বলিলেন, "চাঁপাকে

সুরেশ বাবু বলিলেন; "আচ্ছা নে। তার দু'টো' ছেলে হ'য়েছে, তাই হাতেই থাক। আমি তোমায় শুধু দৈ। সে যে কি রকম ঘরণী-গৃহিণী যে কি আনন্দ হ'চ্ছে তা' কি বলবো শুভা তো ভেবেছিলাম, যে ঘরের হ'য়ে গেলে, তার পর আর যে তোমায় কোন্নাবে। কিছু না; সে ঠিক

আগেরই মত সদাই হাসিখুসি। তেমনি দিন রাত বক্ বক্ ক'রেছে, তবে কথার ঝাঁঝ অনেক কমেছে। আর সে যেন আগাগোড়া একটা আনন্দরসে ভরপুর হ'য়ে গেছে। তার কীর্ত্তন, মালা জপ, দান-ধ্যান এখনো আছে, আবার এদিকে স্বামী-সেবায় একেবারে প্রাণ দিচ্ছে। আশ্চর্য্য মেয়ে মানুষ এই চাঁপা। যখন যেখানে আছে, তাতেই খুসী, তাতেই কৃতার্থ!"

শুভা একটু ভাবিয়া বলিল, "চাঁপাই গৃহস্থ-ধর্ম্মের আসল স্বাদ বুঝেছে।"

শুভা অনেকক্ষণ পর সুরেশ বাবুর নিকট বিদায় লইয়া অন্য রোগী দেখিতে গেল। আজ তার বাসায় ফিরতে অনেক দেরি হইল। ইহার পর প্রতিদিন সে সকল কাজ সারিয়া অবসর কালে সুরেশ বাবুর কাছে আসিয়া বসিয়া থাকিত।

সাত দিনের মধ্যে সুরেশ বাবুর আশ্চর্য্য উন্নতি হইল। দশ দিন পরে তিনি ঠেলাগাড়ী চড়িয়া শুভার সঙ্গে স্কুল পরিদর্শন করিয়া আসি-লেন। তার পর তাঁহার মনে হইল, বুঝিবা তিনি সত্য সত্যই আরোগ্য লাভ করিবেন। কিন্তু পনেরো দিন পরে হঠাৎ রোগের অবস্থা ভীষণ হইয়া উঠিল। শুভা বুঝিল, আর রক্ষা নাই।

সে তখন দিন রাত্রি সুরেশ বাবুর কাছে বসিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল, বাইবেল ও Imitation of Christ পড়িয়া শুনাইল, ধর্ম্মালোচনা করিতে লাগিল, সুরেশ বাবুকে পরকালের জন্য প্রস্তুত হইবার সহায়তা করিল। শেষে একদিন সুরেশ বাবু বলিলেন, "শুভা আমার মনে হ'চ্ছে আর বেশীক্ষণ কথা ব'লতে পারবো না, তাই শেষ একটা কথা বলে নি। মনে আছে তোমার সেই একদিনের কথা, যখন আমি তোমায় আমার ভালবাসা জানিয়েছিলাম। তুমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলে, বলেছিলে,

পুরুষ মানুষ ভালবাসে না, কেবল চায় অধিকার। আমি সেই থেকে বরাবর তোমাকে ভাল বেসেছি। আজ তোমার কাছ থেকে কেবল একটিবার শুনে যেতে চাই যে তুমি বিশ্বাস কর যে আমার ভালবাসা সত্য ও নিঃস্বার্থ। বিশ্বাস কর কি শুভা?"

শুভা কাঁদিয়া বলিল, "বিশ্বাস করি সুরেশ বাবু! আপনি যে অপাত্রে ভালবাসা দিয়ে এতদিন দুঃখ পেয়েছেন তার জন্য আমার যে নিজের উপর কি ঘৃণা হ'চ্ছে তা' বলতে পারি না।"

"থাক, এখন অনেকটা শান্তিতে মরতে পারবো। আর একটা আমার আবদার আছে শুভা, ইচ্ছা হয় তো রক্ষা করো। তুমি—আমি যখন মরে যাব তার পর আমার মুখে একটি চুম্বন দেবে কি?"

শুভা সুরেশ বাবুর বিছানার উপরই বসিয়া কাঁদিতেছিল। সে হঠাৎ চক্ষু মুছিয়া সুরেশ বাবুর মুখের উপর পড়িয়া তাঁহাকে বার বার চুম্বন করিল।

ডাক্তার ভয়ে চমকিত হইয়া উঠিল। যক্ষ্মারোগীর মুখে চুম্বন! সর্ব্বনাশ!

সুরেশ বাবু কৃতার্থদৃষ্টিতে শুভার মুখের দিকে চাহিয়া কম্পিত হস্ত তুলিয়া বলিলেন, "আর আমার মরতে দুঃখ নাই, শুভা!" বলিয়া তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। শুভা দেখিল তিনি শান্তভাবে নিদ্রা গেলেন।

সেইদিন রাত্রে সুরেশ বাবু শেষ যাত্রা করিলেন।

শুভা ভূমিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

সমাপ্ত